মানবতাবাদ

মানবতাবাদ

বসুধা চক্রবর্ত্তী

দীপায়ন
২০, কেশব সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

—প্রথম প্রকাশ—
ফাল্গুন, ১৩৬৭

সূচী

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥

—মুণ্ডোকোপনিষৎ

ভূমিকা

এই বই লেখা হয়েচে মানবসভ্যতার ইতিহাসের পটভূমি অবলম্বন ক'রে। তা' করতে গিয়ে যে সংখ্যাতীত বইয়ের সাহায্য নিতে হয়েচে তা' বিশেষ ক'রে না বললেও চলে। তবে সে সাহায্য যে শুধু এ' বই রচনার বিশেষ উপলক্ষেই নেওয়া হয়েচে তা' নয়। বছরের পর বছর ধ'রে রচয়িতার মানসভূমি সে সাহায্যে পুষ্ট ও প্রস্তুত হয়েছিল। সে সব বইয়ের নামের একটা মোটামুটি তালিকা ইচ্ছা করলে দেওয়া যায়; আবার না দিলেও চলে এ' কারণে যে জ্ঞানসন্ধিৎসু পাঠকের নিকট তেমনিতরো তালিকা অজানা নয়। তা' ছাড়া সে সব বই সবই ইংরেজী। বাংলা বইয়ে একটা দীর্ঘ ইংরেজী গ্রন্থপঞ্জী জুড়ে দেওয়ার সংগতি প্রশ্নাতীত নয়। মনীষীমানসের সর্বজনপরিচিত স্বাক্ষর এ' বইয়ের পাতায় পাতায়। পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক কোনোরূপ অসাধারণ গবেষণার ভাণ এতে নেই। একই কারণে মহাজনউক্তি উধৃত ক'রে বই কোটেশন-কণ্টকিত করার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করতে পারিনি। যে মতামত উধৃত করেচি তাদের প্রামাণ্যতাও সুধীজনবিদিত। শুধু যদি ও যেখানে প্রশ্ন ওঠে তবে ও সেক্ষেত্রে উত্তর দেওয়া প্রয়োজন হবে। আমার এ' উক্তি অবশ্য বইয়ের পটভূমি সম্পর্কেই প্রযোজ্য; আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে মোকাবিলা করার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের; যদি পাঠক এ' বইয়ে কোনো সিদ্ধান্ত খুঁজে পান তো তার ভালোমন্দ, ঠিকবেঠিকের জবাবদিহিও শুধু আমার।

তবু বলা দরকার, এ' বই রচনাকালে আমি এ' কয়টি বই বিশেষ ক'রে সাথে রেখেচি।

১। করলিস ল্যামণ্ট: "হিউম্যানিজম্ এ্যাজ এ ফিলসফী।"

২। এইচ, জে, ব্ল্যাকহাম: "দি হিউম্যান ট্রাডিশন।"

৩। স্টিফেন জাইগ: "ইরেসমাস: দি রাইট টু হেরেসী।"

৪। এম, এন, রায়: "রীজন, রোমান্টিসিজম এ্যাণ্ড রিভলিউশন।"

৫। " " : "মেটিরিয়ালিজম।"

আপাতত আমার আর বিশেষ বলবার নেই। যে জাগতিক চিন্তাধারার বিবর্তন মানুষে এসে একাধারে স্থিতি ও গতি লাভ করেচে তার খবর নেবার, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করার দায় আমারই মতো মানুষের, সাধারণ মানুষের। আমি সে খবর কতটা এনে দিতে পারলুম সে বিচারও তাঁদের। অবশ্য সংক্ষেপেই দেবার প্রয়াস পেয়েচি, বেশী বাগবিস্তার পরিহার করতে চেয়েচি। এতে সন্তুষ্ট বোধ না করলে অন্ততঃ আরও খবর নিতে তাঁরা প্রণোদিত হবেন, এ' আশাতেই আমি এ' রচনা তাঁদের উদ্দেশে নিবেদন করলুম। বিশ্বজীবন যে পরিস্থিতিতে এসে ঠেকেচে বিশ্বমানবের মনকে তার মোকাবিলা করতে হচ্চে: তারই সাড়া জাগচে ব্যক্তিমানুষের মনে—আমারই মতো সাধারণ মানুষের মনে। রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে চিন্তাধারা স্তব্ধ হ'য়ে ছিলো যে এশিয়া ভূখণ্ডে সেখানকার মানুষকেও সে চিন্তাক্রমে অংশগ্রহণ করতে হচ্চে: তারই অনুসরণে প্রত্যেককে নিজস্ব সিদ্ধান্তে আসা দরকার, সে সিদ্ধান্ত অপরেরও গোচরে আনা প্রয়োজন। সে প্রয়োজনেই আমি আমারও বক্তব্য সাধারণ্যে প্রকাশ করতে সাহসী হ'লুম। আমার চিন্তাধারা তাঁদের চিন্তাধারার সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করবেন এই আমার নিবেদন। এ' নিবেদন তাঁদের যুক্তি-অনুসারী মনের নিকট। অন্ধ বিশ্বাস বা সংস্কারে তাকে প্রতিহত করলে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে: তার দায় আমি গ্রহণ করতে পারিনে। যুক্তি দিয়ে যদি তার বিচার হয়, তার দায় আমি গ্রহণ করতে বাধ্য। যা সত্য নয় ব'লে প্রমাণিত হয়েচে তাকে বর্জন ক'রে সত্যকে বরণ করবার মতো মনোবল যেন আমরা অর্জন করতে পারি, এই শুধু আমার দাবী। সত্যকে স্বীকার করবার সাহস যদি পাই তবে সত্যই আমাদেরে আশ্রয় দেবে। মুক্তবুদ্ধি পাঠকপাঠিকা আমার সব বক্তব্য গ্রহণ করতে পারুন বা না পারুন, সত্যের অভিসারে এগিয়ে যাবেন—এই আমার একমাত্র কামনা।

বসন্ত পঞ্চমী

কলিকাতা,

১৩৬৭

বিনীত

গ্রন্থকার

এই যে সূর্যকরোজ্জল ধরণী, চন্দ্রকরোজ্জল রজনী, নক্ষত্রখচিত এই যে আকাশ, গ্রহউপগ্রহের এই যে অবিরত পরিক্রমা, ঝড় ঝঞ্ঝা বৃষ্টি ভূমিকম্প—এ' সবই মিলে বিশ্বজীবনের পটভূমি গ'ড়ে তুলেচে, বিশ্বের অধিবাসী সকল প্রাণীর জীবন মথিত, আলোড়িত—ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তরিত করেচে। কালের পথ বেয়ে সে আলোড়নের শেষ নেই।

এই প্রাণীসমাজের ক্রমবিবর্তনে—সৃষ্টি ও ধ্বংসে, বর্জন ও গ্রহণে প্রাণের অপরূপ লীলা প্রকাশিত হয়েচে। কতো প্রাণী লুপ্ত হ'য়ে গেলো, কতো প্রাণীর রূপান্তর ঘটলো: প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে মানুষ, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে তার মধ্যেও কতো পরিবর্তন হ'লো। সে বিচিত্র কাহিনীর যতটুকু আজকের মানুষ জানতে পেরেচে, তার মধ্যেও বিস্ময়ের উপাদানের সীমা নেই।

সেই মানুষের কাহিনী লিখিত ও অলিখিত ইতিহাসে অন্তহীন মহাকাব্যের রূপ ধরেচে। ভাঙা ও গড়া, প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে অতিক্রম, সৃষ্টি ও ধ্বংস,—তারই থেকে উদ্বৃত্ত শক্তি দ্বারা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সঞ্জীবন ধারা প্রবহমান রাখার সাধনাতে মানুষের জীবনধর্মের স্বতস্ফূর্ত উদ্ঘাটন হয়েচে। মানুষ সেখানে মেনেচে আপন'তে আপনি বিস্ময়: সে যে কী ভাবে, নিজেকে বিকশিত ও প্রকাশিত করেচে তা যেন নিজেও সবটা জানতে পারেনি। কিন্তু এ' বিকাশ ও প্রকাশ তার কোনো দিনও সহজ হয়নি। সন্দেহ, সংশয়, সমস্যা প্রতি পদে তাকে পীড়িত করেচে: সে সব অতিক্রম করার দুঃসাধ্য প্রচেষ্টাতেও পাওয়া গেছে তার প্রাণশক্তির পরিচয়। চলার পথে তার পায়ের তলায় রাস্তা জেগেচে। ব্যক্তি-মানস যে শত চেষ্টা ক'রেও সম্পূর্ণরূপে মানব-জাতির এ চিরযাত্রার পরিচয় পেতে পারবে সে সম্ভাবনা নেই।

কারণ, সেই ব্যক্তিরও আত্মপরিচয় ক্রমেই অগ্রসর হ'য়ে চলেচে: আকারে ও প্রকারে তারও বৈচিত্র্যের কোনো অবধি নেই। জীবনের পথে সে কবে কোথায় কাকে ফেলে এলো, কবে কোথায় কার সঙ্গে তার চকিতে দেখা হ'লো, আজ যা জীবনের

সর্বোত্তম সম্পদ ব'লে বোধ হচ্চে কাল তা কোথায় মিলিয়ে গেলো—কোন্ ভাবের প্লাবন তাকেও স্পর্শ ক'রে গেলো, ইতিহাসের কোন বিরাট ঘটনা তারও দেহে মনে কাঁপন ধরিয়ে দিয়ে গেলো—স্নেহ-ভালবাসার অবদান, ভালবাসার অপেক্ষা ও অবসান, সুখদুঃখ বিপদ সম্পদের অনুভব ও অনুরাগ গ'ড়ে তুললো তারও জীবনকে,—ব্যর্থতা সার্থকতাকে অতিক্রম ক'রে চিরন্তন গতির পদচিহ্ন রেখে গেলো। নিজের জীবনকে যে সম্পূর্ণরূপে বুঝবে তার সে সাধ্যও নেই। সে অদূরাতীতে কী দেখেচে, কী ভেবেচে তা'ও ভালো ক'রে ধারণা করতে পারে না। তাই সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে দেখা আর হ'য়ে ওঠেনা, নিত্যকার দাবী কোনো মতে মিটিয়েই সে জীবনের দায় শোধ ক'রে চলে।

কিন্তু এই যে প্রকৃতি, এই যে বিশ্ব, এই যে মানবজীবন, এই যে জীবন আমার,—এর উৎস কোথায়, কীসে এর স্থিতি? এ কি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়—স্বয়ংবিবর্তিত নয়? এর উপর বাইরের কিছু চাপিয়ে দেবার, এর মধ্যে কল্পনার কোনো কিছুর অপেক্ষা রাখার আছে কি প্রয়োজন? এতেই তো আমার মনপ্রাণ ভ'রে গেলো, বিস্ময়ে আপ্লুত হ'লো। আমি যে একটা ভালো বই প'ড়ে বা ভালো গান শুনে আনন্দ পেলুম, একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হ'লুম, শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখে অভিভূত হ'লুম, একটা ভালো ছবি বা অভিনয় দেখে ভালো লাগলো, কোনো মহাপ্রাণের সান্নিধ্যে এসে অনুপ্রাণিত হ'লুম, কারু সহৃদয় সাহচর্যে তৃপ্ত পেলুম—এতেই তো আমার জীবনবোধ তৃপ্ত হ'লো, আমি জীবনকে লাভ করলুম। এতেই তো আমার জীবনমরণের পরিপূর্ণতা।

তবে?—মানুষ করেচে এ' প্রশ্ন; মানুষই দিয়েচে এর উত্তর।

প্রস্তাবনা

নাগিনীরা যখন দিকে দিকে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলে, শান্তির ললিত-বাণী তখন ব্যর্থ পরিহাসের মতোই শোনাবে—কবিগুরুর এ' আশঙ্কা অমূলক ছিলনা। আজ কিন্তু এ' কথাও সত্য যে শান্তির ললিত-বাণীকে কেউ পরিহাস ক'রে উড়িয়ে দিতে পারচেনা, সে বাণী আজ একেবারে ব্যর্থ নয়। অন্তত মুখে মুখে সবাই তার সঙ্গে সুর মেলাতে বাধ্য হয়, বলতে হয় বারবার বল্‌তে যে, শান্তি যে বিপন্ন হ'লো এর দায়িত্ব মোটেও তার নয়, সে দায়িত্ব অপর পক্ষের। এতেই প্রমাণিত হচ্চে যে শান্তি ও সৌভ্রাত্রের বাণীকে আজ আর কেউ অবহেলা করতে পারচেনা। হিংসায় উন্মত্ত যখন পৃথ্বী, প্রতিদ্বন্দ্বী সামাজিক-রাজনৈতিক-মতবাদের সংঘাত যখন আণবিক সমরায়োজনে নিয়োজিত, তখনও কিন্তু তাকে আত্মরক্ষার আবরণেই তা' করতে হচ্চে: অপরকে যুদ্ধোদ্যম থেকে বিরত করবার জন্যই নিজে শক্তিমান হ'তে হ'বে, এই ওজর নিতে হচ্চে। এতেই প্রমাণিত হচ্চে যে হিংসার উন্মত্ত প্রতিযোগিতাও চল্‌চে অহিংসা ও শান্তির দোহাই দিয়ে। মানুষের কাছে এ' দোহাই তাকে দিতে হচ্চে নিশ্চয়ই এ' জন্তে যে মানবতায় মানুষের নিষ্ঠা ও বিশ্বাস রয়েচে। ব্যক্তিগত বা জাতিগতভাবে যদিও মানুষ হিংসার প্রতিযোগিতায় জড়িত হয়ে পড়েচে, তবু পরিণামে ও সমবেতভাবে সে মানবতায় বিশ্বাসী—এ' স্বীকৃতি তার প্রাপ্য।

একেই আমরা বলি মানবিকতাবাদ: বলা বাহুল্য, মানবিকতাবাদ ও মানবতাবাদ এক জিনিষ নয়। মানবিকতাবাদ করুণার উপর প্রতিষ্ঠিত: মানবিকতা মহান ও মঙ্গলময়: কিন্তু তার মধ্যে রয়েচে পরোপকারের প্রেরণা ও প্রবৃত্তি: মানুষ হিসেবে মানুষের পূর্ণ স্বীকৃতি তাতে নেই। মানবতাবাদের গোড়ার কথা—সবার উপর-মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই। সত্যই নেই; অতি-প্রাকৃতিক, অতিমানবীয় কেউ নেই, কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় এক সময়ে এ'কে মানবীয়তাবাদ নামে অভিহিত ক'রেছিলেন: সঠিকভাবে বলতে গেলে তাই এর সংজ্ঞা হওয়া উচিত। কেউ কেউবা একে বলেন মানবতন্ত্রবাদ। তবে এর সহজ চলতি নাম "মানবতাবাদ" রক্ষা করলেও

ক্ষতি নেই। পাশ্চাত্য চিন্তায় এর প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল বোধ হয় প্রোটাগোরাসের দ্বারা : গ্রীসদেশীয় চিন্তাবীর তিনি : তিনিই বলেছিলেন, "যা' কিছু আছে দুনিয়ায় সে সবেরই মূল্য নির্ধারণ হবে মানুষের প্রয়োজনে ও পরিপ্রেক্ষিতে।" প্রাচ্যদর্শনে আমরা তার প্রথম পরিচয় পাই সাংখ্যে ও বৈশেষিকে : কিন্তু তার আগেই উপনিষদে মৌলিক প্রশ্নবিচারে এ' তথ্য উত্থাপিত হয়েছিল। এমন কি, বেদেও নাস্তিক ও অবিশ্বাসীদের কথা উল্লিখিত হয়েচে। তাতে এই বুঝায় যে বৈদিকধর্মের মূলসূত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী তখনও ছিল : প্রাকৃতিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে বৈদিক ধর্ম গড়ে উঠেছিল, এই সব প্রতিবাদকারী ছিলেন তার বিরোধী।

তা'হলে' আমরা দেখচি, মানবতাবাদ মানবিকতাবাদ থেকে আলাদা বস্তু তো বটেই : মানবতাবাদ বলতে শুধু শান্তি ও সৌভ্রাত্রের কথাও বুঝায় না। এই জগতের কেন্দ্রস্থলে রয়েচে মানুষ : জগতের যত ওঠাপড়া ভাঙ্গাগড়া সবই মানুষের দ্বারা হয়েচে। এই জগৎ অবিরত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে রূপ নিচ্চে ও নেবে, মানুষই তার মূলে রয়েচে। মানুষ তার নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা : পলে পলে সে নিজেকে ভেঙ্গে নতুন ক'রে সৃষ্টি ক'রে চলেচে। তাই সজ্ঞানে সংকল্প নিয়ে সে তার জীবন গঠন করে চল্‌তে পারে : যুদ্ধ, অমঙ্গল, অশান্তি কোনো কিছুরই নিকট তার মাথা নোয়াবার কারণ নেই। এই সিদ্ধান্ত কিন্তু এখনও কার্যকরী রূপ লাভ করেনি। মানুষের রাষ্ট্রিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায় এখনও নির্ধারিত হয়নি। এ' কথা সত্য বটে যে যত কিছু রাষ্ট্রিক-সামাজিক সংস্থা গড়ে উঠেচে মানুষই সে সব গড়েচে—কিন্তু মানুষের আত্মনিয়ামক সত্তা তাতে কতটা অক্ষুন্ন রয়েচে তাই হচ্ছে প্রশ্ন। মানুষ নিজেই নিজের নিয়ামক এ' সত্য ধরা দিয়েছিল বটে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তার আদিযুগে : কিন্তু সে ধরা দিয়েছিল তার চিন্তারাজ্যে। বহু ঘাত প্রতিঘাত, পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে বাস্তব অনুভূতির ক্ষেত্রে সে এ' সত্যের দেখা পেলো বর্তমান যুগে। দেখা পেলো একান্ত প্রয়োজনে : দেখা পেলো এ' কারণে যে এখন তাকে আত্মরক্ষা করতে হবে তারই সম্মতিতে প্রতিষ্ঠিত সেই রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে যা' তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েচে,—রাজনৈতিক ভাবধারার সংঘাতে সর্বধ্বংসী সমরের আয়োজনে ব্যাপৃত রয়েচে।

সেই পুরাযুগে যখন মানুষ বিস্মিত নয়নে এ' বিশ্বের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন

করেছিলো, "কোথেকে এসেচি? কোথায়ই বা যাচ্চি? এ' সৃষ্টি রহস্যের মূলসূত্র কী?" চকিতে সে দেখতে পেলে প্রকৃতি তার স্বনিয়মে চলেচে, কিছুতে তার চলার ব্যত্যয় নেই। সূর্যচন্দ্রের পরিক্রমা, রৌদ্রবৃষ্টির সমারোহ, ঝড়-ঝঞ্ঝার আবির্ভাব সে প্রত্যক্ষ করলে। আপ্‌না থেকেই সে তখন প্রকৃতিতে দেবত্ব আরোপ করলো: সূর্য, চন্দ্র, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তুর ভিতরে সংখ্যাতীত দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটলো। দেশে দেশে তার অন্তহীন নিদর্শন রয়েচে। মনে রাখতে হবে এই দেবত্বও মনুষ্যনিরপেক্ষ নয়: আপন মনের মাধুরী মিশায়ে মানুষ এ সব দেবদেবী রচনা করলে: সৌন্দর্য, মাধুর্য, শক্তি, কল্যাণ প্রভৃতি মানবীয় ধারণা কল্পনার প্রতীক রূপেই দেবদেবী গড়ে উঠ্‌লো। দেবতাকে সৃষ্টি করলে মানুষ—ক'রে বিশ্বে ছড়িয়ে দিলে: আকাশে বাতাসে তখন দেবতা মানুষেরই জীবনের ধ্রুবতারারূপে বিরাজ করতে লাগ্‌লো।

তখনও এতে প্রশ্ন যে ওঠেনি তা' নয়: পৃথিবীর উৎপত্তি ও গতি-প্রকৃতিতে দেবতাত্মার অধিষ্ঠান সম্বন্ধে সংশয় তখনও দেখা দিয়েছিল। এমনকি ঋগ্বেদে বল্‌চে:

"এই সৃষ্টির উৎপত্তি কোথা থেকে, কোথা থেকে এ' এলো কে তা' সত্যি করে জানে, কেইবা এখানে সেকথা ঘোষণা ক'রে বল্‌তে পারে?

দেবদেবী তো এসেছে এ' জগতের উৎপত্তির পর। তা' হলে এ' জগৎ প্রথম কোথা থেকে উদ্ভূত হ'লো তা' কে জানে?

এই সৃষ্টির প্রথম উৎপত্তি যাঁতে, তিনি কি একে সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন অথবা দেন্‌নি, সর্বোচ্চ আকাশে যাঁর অধিষ্ঠান—সেখান থেকে তিনি এ জগৎ পরিচালনা ক'রে থাকেন—তিনিই প্রকৃতপক্ষে সেকথা জানেন অথবা তিনি হয়তো জানেনই না।"

এই সংশয়েরই সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটে উপনিষদের কোনো কোনো সূত্রে—বিশেষত শ্মশানবেদ উপনিষদের দ্বিতীয় সূত্রে যার মর্মকথা এই যে "অবতার ব'লে কিছু নেই, ঈশ্বর নেই, স্বর্গ-নরক কিছু নেই: ধর্মের প্রাচীন ঐতিহ্যকে অবলম্বন ক'রে যে সাহিত্য গড়ে উঠেচে সে সবজান্তা নির্বোধের বুলি ছাড়া কিছু নয়। সব কিছুর উদ্রে প্রকৃতিতে, সব কিছুর সংহারক মহাকাল: তারা পাপপুণ্যের কোনো হিসাব রাখে না, মানুষ যে সুখ এবং দুঃখ পায় তার সঙ্গে তার পাপপুণ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। গালভরা বুলীতে ভুলে মানুষ

তথাকথিত ভগবানের মন্দির ও পুরোহিত আঁকড়ে পড়ে থাকে; আসলে স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু এবং একটা কুকুরের মধ্যেও কোনো প্রভেদ নেই।"

এ' যে বড়ো সাংঘাতিক কথা। কিন্তু প্রধান বড়োপনিষদেরও স্থানে স্থানে এমন আভাষ রয়েচে যে জড় পদার্থ থেকেই এই জগতের উদ্ভব হয়েচে: জগতের আদিকারণ সম্পর্কে প্রাকৃতিক বা অতিপ্রাকৃতিক কিছু কল্পনা ক'রা নিরর্থক। ছান্দোগ্যোপনিষদে বল্‌চে:

"—এই জগতের উৎপত্তি কীসে? আকাশে। কারণ, যা' কিছুর অস্তিত্ব আছে সে সকলেরই উদ্ভব আকাশে এবং আকাশেই তারা ফের পরম গতিলাভ কর্‌বে। আকাশেই তাদের বিশ্রাম ও পরিণতি।

যাকে আকাশ বা ইথার বলা হয় তাতেই সব আকার ও নামের প্রকাশ।

বলা হয়েচে, ব্রহ্মাই জগতের আদিকারণ: কিন্তু ইথারেই যদি সব কিছুর উৎপত্তি ও পরিণতি হয় তবে ব্রহ্মারও স্থিতি ইথারে: তাঁর আর স্বতন্ত্র সত্তা কোথায়?—"

কথোপনিষদে বলা হয়েচে, আদিতে জড় অবস্থা ছিল: তার থেকেই জগতের উৎপত্তি হলো।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েচে: অগ্নি থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি।

এই যে আত্মবিবর্তনশীল জগৎ—এর মধ্যে নেই কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অধিষ্ঠান। মানুষেরও জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যু এই বিবর্তনে: অতিপ্রাকৃতিক কোনো শক্তি তাকে নিয়ন্ত্রণ কর্‌চেনা। বস্তুবাদী দর্শনে তাই মানুষ স্বরাট, নিজের ভাগ্য-নিয়ন্তা।

আবার সেখান থেকে এক পা নেমে এসে বেদান্ত উপনিষদেই মানুষকে এমন এক জায়গায় দাঁড়াতে দেখা যায় যেখানে ব্রহ্মা সৃষ্টির সঙ্গে এক হয়ে আছেন:— সর্বব্যাপী, সর্বাত্মক তিনি। ইংরেজীতে এ'কে বলে প্যানথিজম: বস্তুবাদের পরই তার স্থান।

ছান্দোগ্যোপনিষদে বল্‌চে: "যা' কিছু অস্তিত্ব অর্জন করেচে, যা' কিছু এখানে বিদ্যমান রয়েচে সে সব কিছু যে গায়ত্রী ছন্দে বিধৃত, এ' প্রকৃত সত্য। গায়ত্রীই যে বচন, এ' প্রকৃত সত্য। যা' কিছু এখানে অস্তিত্ব লাভ ক'রে রয়েচে, বচনই যে একাধারে তার গাথা গান গায় এবং তাকে ত্রাণ করে—গায় এবং ত্রাণ করে, তাইতে হয় গায়ত্রী—এ' প্রকৃত সত্য।

গায়ত্রী যা' এই পৃথিবীও তাই, এ' প্রকৃত সত্য; কারণ, যা' কিছু

অস্তিত্ব অর্জন করেচে তা' এখানেই প্রতিষ্ঠিত : এখানটাকে তা' ছাড়িয়ে যায়না।

এই পৃথিবী যাতে গঠিত এই মানুষের মধ্যে দেহও যে তাই, এ' প্রকৃত সত্য ; কারণ যে শ্বাসপ্রশ্বাসে প্রাণের অধিষ্ঠান তা'ও এতেই প্রতিষ্ঠিত : শ্বাসপ্রশ্বাস এ'কে ছাড়িয়ে যায়না।

মানুষের মধ্যে দেহ যা' মানুষের অন্তরে হৃদয়ও তাই, এ প্রকৃত সত্য ; কারণ, যে শ্বাসপ্রশ্বাসে প্রাণের অধিষ্ঠান তা' এর উপরই প্রতিষ্ঠিত : শ্বাসপ্রশ্বাস এ'কে ছাড়িয়ে যায়না।

একেই বলে গায়ত্রী। এর সম্বন্ধেই ঋগ্বেদের এক ছড়ায় বল্‌চে :

> মহত্ত্ব তার এত বিরাট,
> তবু পুরুষ তার চেয়েও বড়ো ;
> সব জীব মিলে হয় তার চতুর্থাংশ ;
> আর তিন চতুর্থাংশ আকাশস্থ সেই অমর পুরুষ।

যাকে ব্রহ্ম বলে তা' যে ব্যক্তির বহিরস্থ আকাশ বা বিস্তৃতি ভিন্ন আর কিছু নয়, এ' প্রকৃত সত্য। ব্যক্তির বহিরস্থ বিস্তৃতি আর ব্যক্তির অন্তরের বিস্তৃতি যে একই জিনিষ, এ' প্রকৃত সত্য। তাই পূর্ণ, তাই নিষ্ক্রিয়। এ'কথা যে জেনেচে সে-ই পূর্ণ হয়েচে, তার আর ক্রিয়ার প্রয়োজন নেই।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদেরও এক স্থানে এ' রকম কথা রয়েচে। ব্রহ্ম আর ব্যক্তি মিলেই ব্রহ্মাণ্ড :—এ' আকাশ এ' বিস্তৃতি : এ'যে জেনেছিল তাকেই বলা হয়েচে পূর্ণ।

কিন্তু তার আগে মানুষ যখন বিশ্বপ্রকৃতিতে দেবত্ব আরোপ করেছিল, তখনও কোনো সংস্কারবশে তা' করেনি : নিজেকে জানতে, দুনিয়াকে চিন্‌তে এই বিশ্বরহস্যের নাগাল পেতে গিয়েই সে তা' করেছিল। তার সেই অনুসন্ধিৎসাতেই বিজ্ঞানের উদ্ভব, এ' কথা বল্‌লে মিথ্যা বলা হবেনা। আবার, যখন মানুষ তাতে আর সন্তুষ্ট রইলোনা, যুক্তি দিয়ে জগতের আদিকারণ ও গতিপ্রকৃতি বুঝ্‌তে চাইলে, বিজ্ঞানকে তখন সে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলো। অচিরে কিন্তু তার সমাজসংস্থা গড়ে উঠ্‌লো : লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জীবনসংগ্রামের ক্রমবর্ধমান কঠোরতায় তা'তে জটিলতা দেখা দিল : মানুষের পক্ষে আর একক আত্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্ভব রইলোনা। সমাজের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিসম্বন্ধ সেই থেকে বিবিধ পরীক্ষানিরীক্ষার অধীন হয়ে আছে,

অন্তহীন অসঙ্গতি অসামঞ্জস্য তাতে দেখা দিয়েচে। মানুষ যেন কিছুতে আর ঠাঁই পাচ্চেনা. আশ্রয় পাচ্চেনা—শোষণ ও শাসন, পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাব তাকে পীড়িত ক'রে তুলেচে। তাই সে হারিয়ে ফেলেচে আত্মবিশ্বাস; সে বুঝেচে জীবন তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, সমাজকেন্দ্রিক: সমাজের সঙ্গে সে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা রয়েচে। রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ—ইতিহাসের স্তরে স্তরে কতভাবেই না তার স্থান-নির্দেশ হ'লো। যখন যে স্তরে তার অবস্থান তখন সে তা'তে স্থিতিলাভ করচে: কিন্তু কিছুকাল পর তা'তেও ফাটল দেখা দিয়েচে: বিপ্লবের ভেতর দিয়ে নতুন সংস্থা গড়ে উঠেচে। মার্ক্সবাদে একে থীসীস, এ্যান্টিথীসীস ও সীন্থেসীসে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েচে: শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্রমে যখন মানুষ সাম্যবাদে এসে পৌছুলো তখন কিন্তু সর্বহারাদের আধিপত্যের নামে রাষ্ট্রের সার্বিক প্রভাব স্বীকার করে নিলে। সাম্যবাদী হয়েও আত্মনিয়ন্ত্রাতা সে আর রইলো না: অথচ সমাজে ও রাষ্ট্রে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ও সে পেলোনা। সে একাকীই রয়ে গেলো: জীবনের উত্থানপতন, সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে নিজের মোকাবিলা নিজেকেই তাকে করতে হলো। মানুষ তাই ভাবে ভাগ্য তার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়: সে তার নিজের ভাগ্যের অধীন। এক্কেকবার যখন তার পরিবেশে বিপ্লব ঘটে তখন তার নূতন ক'রে আত্মনিয়ন্ত্রণের আশা জাগে: কিন্তু সে আশা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আশা শুধু পূর্ণ হয় তার—রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ক্ষমতার যে অংশীদার। কিন্তু সেও স্বরাট নয়—বিরাট রাষ্ট্রীয় সংস্থার সে প্রতিনিধি। সেই সংস্থাতে তার আশ্রয়, সেই সংস্থার আশ্রয় যে বিশ্বশক্তি তাতে সে আশ্রয়প্রার্থী—অসহায় মানুষ যাকে ভগবান বলে ধারণা করেচে। সাধারণ মানুষের নিকট জীবন তখন বিধির বিধানরূপে প্রতিভাত: আকাশের দিকে তাকিয়ে সে সেই সর্ব-নিয়ন্তার কৃপা চাইচে—রাষ্ট্রিক-সামাজিক সত্তাকে অতিক্রম ক'রে যার নাগালে সে তার ব্যথাবেদনা নিবেদন করতে পারে।

এইক্ষণে আবির্ভাব অবতারের, আবির্ভাব মহামানবের। ধর্মপ্রবর্তন দ্বারা বা ধর্মের মাধ্যমে তাঁরা মানুষকে সে বিশ্বশক্তির মোকাবিলা করিয়ে দিচ্চেন যার নিকট তার ব্যথিত হৃদয়ের ব্যাকুল আবেদন। এখানেই উদ্ভব মানবিকতার: রাষ্ট্রে ও সমাজে ধর্মের অনুশাসনে রূপান্বিত সে মানবিকতা। পরন্তু মানবতার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মানবিকতা—মানুষের হৃদয়ের ব্যথায় দিল সান্ত্বনার

প্রলেপ। ধর্ম মানবিকতায় পরিণত হলো। যুগ যুগ ধ'রে এই মানবিকতার প্রবাহের অন্ত নেই, মানুষের জীবনে তার সর্বব্যাপী প্রভাবের তুলনা নেই।

তবু তা' মানবতা নয়। মানবিকতা মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেচে—কোনো মতে বেঁচে থাকার, সব ভু'লে বেঁচে থাকার, জীবনের পথচলার সামর্থ্য দিয়েচে। কিন্তু তাকে মুক্তি পথের সন্ধান দিতে পারে নি, স্বকীয়তার পূর্ণ সত্তায় মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি তাকে দেবার ক্ষমতা তার নেই। মানুষ সেখানে আশ্রয়-কামী, পরনির্ভরপরায়ণ: বেদনাহত সে শরণাগত: অদৃশ্য শক্তি মানবীয় শক্তিতে স্থাপিত হয়ে, তাতে মিশে গিয়ে তাকে পদানত করেচে। এই ভাবে ইতিহাসের পথে মানুষের দুঃসাধ্য যাত্রা।

তা' ব'লে এ'কথা বলা কখনও সঙ্গত নয় যে মানবিকতা মানুষকে শুধুই করুণার পাত্র করে রাখতে চেয়েচে—তার মানবীয় মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেয়নি। মানুষে মানুষে ভেদজ্ঞান দূর করতে—ভেদের যে অভ্রভেদী দেয়াল নানা আকারে ও প্রকারে মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেচে তা' চূর্ণ করতে মানবিকতার—এমন কি ধর্মীয় মানবিকতার প্রয়াসের মূল্য অনস্বীকার্য। শুধু মানবিক আবেদন দ্বারা ভেদের অবসান ঘটানোর সম্ভাবনা একান্তই সীমাবদ্ধ: বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভেদের কারণ নির্ণয় ও প্রতীকারচেষ্টাই বাস্তববুদ্ধিসম্মত। সে কারণে শুধু মানবিকতা মানুষকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়নি। মানুষ যখন নিজ সত্তায় আর পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারলোনা মানবিকতা তখন শুধু মানুষের পারস্পরিক সাম্য ও সুবিচারের দাবী জানিয়ে গেলো। মানুষ সে দাবী কান পেতে শুনেচে: কিন্তু আত্মসত্তা হারিয়ে ফেলার দরুণ সে দাবীও পূর্ণ করতে অক্ষম হলো।

তবু সে যে স্বরাট, পরিণামে তাকে ঘিরেই সব কিছু আবর্তিত, বিবর্তিত হচ্চে এ' সত্য ক্রমোন্নত বিজ্ঞানের আলোকে বার বার উদ্ভাসিত হয়েচে, মানুষের চিন্তাতে ধরা পড়েচে। যত কিছু অদৃশ্য শক্তি, অদৃশ্য শক্তির দোহাই দিয়ে যত কিছু মানবীয় শক্তি তাকে আচ্ছন্ন করুক না কেন, আত্মসম্বিৎ সে বারবার ফিরে পেয়েচে, আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েচে। সভ্যতার গতি-পথে আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদ তার নিকট একান্ত হ'লো। জ্ঞানবিজ্ঞানের নির্যাস নিয়ে রচিত মানবতাবাদে আজ তার আত্মোদ্ধারের আহ্বান।

গ্রীক চিন্তাধারা ও মানবতাবাদ

প্রোটাগোরাস বলেছিলেন, "দেবতা আছেন বা নেই তা' জানবার আমার কোন উপায় নেই। অতটা জানবার পথে অনেক বাধা রয়েচেঃ কারণ, একে তো প্রশ্নটাই বিশেষ ধোঁয়াটে ধরণের—তার উপর আবার আমাদের আয়ুও সীমান্বিত।" কাজেই তাঁর মতে মানুষের বিচারেই সব কিছুর মূল্য নির্ধারিত হবে,—মানুষের উপলব্ধিতে যা' ধরা পড়েচে তারই শুধু অস্তিত্ব আছেঃ মানুষ যা' উপলব্ধি করেনি তার অস্তিত্ব নেই। প্রোটাগোরাসেরই সমসাময়িক ছিলেন হিপিয়াসঃ তাঁর মতে জীবনকে সর্বোত্তম শিল্পরূপে গ'ড়ে তোলাই মহত্তম আদর্শ, সে শিল্পে হবে সব শিল্পের অধিষ্ঠান। সমগ্র মানবজাতি হ'বে এক ভ্রাতৃমণ্ডলীঃ প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত হ'বে জীবন, মনুষ্যরচিত কৃত্রিম নিয়মকে সে অতিক্রম ক'রবে।

মনুষ্যকেন্দ্রিক এ' জগৎঃ একার্থক এ' জগৎ ও জীবন! গ্রীসে এ' মতবাদের ধারক ও বাহকদের 'সফিষ্ট' বলা হ'তো। কিন্তু তার আগেও সেখানে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ধ্যানধারণা করেছিলেন থেইল্‌স্ঃ তাঁকে একাধারে দর্শনের জনক ও পদার্থবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীতে ঐশ্বরিক কিছু আছে ব'লে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মত ছিল এই যে দেবদেবী কল্পনা করে নিলে পর সৃষ্টির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। কাজেই বাস্তব যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে জ্ঞানকে খুঁজে পেতে হবে। বিজ্ঞান ও দর্শন পরস্পরের হাত ধরাধরি ক'রে চল্‌বে। এ্যানাক্সাগোরাস এর মধ্যে গতিধর্ম এনে দিলেন। তিনি তার নাম দিলেন 'মন'; কিন্তু আসলে তাঁর মত ছিল এই যে আপাতজড় পদার্থের সমাবেশ বিবর্তনক্রমে কোন এক বিশেষ স্তরে পৌছুলে পর তাতে গতি সঞ্চারিত হয়। হেরাক্লিটাসের মতে অগ্নিই জগতের আদি পদার্থঃ ভগবান এ' জগৎ সৃষ্টি করেনি, মানুষও তা' করেনি। আপ্‌নি প্রজ্জলিত, যথাপরিমাণে আপ্‌নি নির্বাপিত অগ্নিই এ' জগতের প্রাণ। হেরাক্লিটাসই প্রথম ডায়েলেকটিকসের সূত্র বাৎলে দেন। সে সূত্র এই যে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়, চূড়ান্ত নয়ঃ সব কিছু ওঠাপড়া ভাঙ্গাগড়ার অধীনঃ সব কিছুর অস্তিত্ব আছে এবং সে অস্তিত্বের অবসানও আছে। এই ডায়লেকটিকস' কালক্রমে হেগেলের হাতে বিকাশলাভ করে এবং মার্ক্স

বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে নেন। হেরাক্লিটাস যা বললেন তার অর্থ এই যে স্বয়ংসিদ্ধ সত্য ব'লে কিছু নেই, নেই পূর্ণ জ্ঞান ব'লে কিছু, কাজেই এমন কিছুই নেই যা' দ্বারা মানুষের মনের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা সম্ভব বা বাঞ্ছনীয় হ'তে পারে।

কেবল বাস্তব পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারাই সত্যিকার জ্ঞানলাভ করা যেতে পারে—প্রোটাগোরাসের এই মত এইভাবেই সমর্থন পেলো। কিন্তু বিপরীত মতের অভ্যুত্থানও সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেছিল এবং ঘটেছিল পীথাগোরাসের হাতে। পাশ্চাত্যে ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠাতা তিনি, আবার গ্রীসের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-দের মধ্যে ছিল তাঁর স্থান। তাঁর চিন্তাধারায় ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তাঁর সান্নিধ্যে এক সঙ্গেই ত্যাগধর্ম ও গণিতবিদ্যার অনুশীলন চল্‌তো। জ্যামিতির ছকে ফেলে দিলেন পীথাগোরাস এই বিশ্বকে : তাঁকে অনুসরণ ক'রেই পরে ইউক্লিডের জ্যামিতি গ'ড়ে উঠ্‌লো। পীথাগোরাসের চিন্তায় এই জগৎ সংখ্যাতে রূপ নিয়েছিল : সে সংখ্যা অমোঘ, বিশ্ববিধান তা'তে প্রকাশলাভ করেছে। বিশ্ব গাণিতিক রূপ নিয়েছে। আড়াই হাজার বৎসর পর স্যার জেম্‌স্ জীন্‌স পীথাগোরাসেরই মতো গণিত-ভগবানে বিশ্বরূপ-দর্শন করেছেন। এখানে মনে রাখা দরকার, জগতের কার্যকারণ সম্বন্ধে প্রাচীনকালের অনুসন্ধানপদ্ধতি ছিল বস্তুনিরীক্ষণ, চিন্তা ও মনন,—হাতে-কলমে পরীক্ষার সূচনা হ'য়ে থাকলেও সে সূচনামাত্র। চিন্তার আভ্যন্তরীণ সংগতি অসংগতির দ্বারাই তার মূল্যবিচার হ'তো : এবং বিতর্কের উদ্ভব ঘটতো সেই বিচারবিবেচনায়। ধ্যানধারণা ছিল চিন্তারই সংহত রূপ। একটা ধারণা ক'রে নিয়ে তার সত্যতাবিচারেই তখন যুক্তির ক্রিয়া চল্‌তো : ধারণা করে নিয়ে পরীক্ষাদ্বারা তার সত্যতাবিচার বিজ্ঞানেরও অঙ্গ। অন্তর্সংগতিকে আশ্রয় করে চিন্তার যে অগ্রগতি—প্রাচীন গ্রীসে তারই মহান সূচনা।

পার্মানিডিস নামে একজনের আবির্ভাব হলো : যুক্তির নামে তিনি বস্তুবাদী দর্শনকে তো আক্রমণ করলেনই, চক্ষুকর্ণজিহ্বার সাহায্যে পরীক্ষা ও জ্ঞানানু-শীলনের যে পদ্ধতি রয়েছে তারও বিরোধিতা করতে ছাড়্‌লেন না। তিনি বললেন যে শারীরিক ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য বিশ্বাস করা বিপজ্জনক। তাঁর মত ছিল এই যে যেহেতু কোনো জিনিস একই সময়ে আছে এবং নেই এমন হতে পারেনা সেহেতু এ' বিশ্বে পরিবর্তন ব'লে কিছু নেই। এ যুক্তির জবাব দিলেন এম্পিডোক্লেস : তিনি বললেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণে ভুলপ্রমাদের সম্ভাবনা আছে

এ' কথা স্বীকার করলেও জ্ঞানানুসন্ধিৎসার মাধ্যম হিসেবে ইন্দ্রিয়কে অগ্রাহ্য করা যায় না। গ্রীকরা সে সময়ে জলঘড়ি ব্যবহার করতেন—অর্থাৎ একটা পাত্র থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল চুইয়ে পড়বার সময় দিয়ে সময়ের হিসেব করতেন। এম্পিডোক্লেস দেখালেন, পাত্রটি থেকে জল বেরোবার ছিদ্র আঙুল দিয়ে চেপে রাখলে পর বাতাসের যে চাপ সৃষ্টি হয় তার ফলে জলপড়ার ইতরবিশেষ হয় এবং তাতে প্রমাণ হয় যে অদৃশ্য বায়ুরও ক্ষমতা আছে জায়গা জুড়ে রাখবার এবং শক্তি প্রয়োগ করবার। দেহের রক্ত চলাচলের সঙ্গে বাইরের বায়ুর চাপের সম্বন্ধ সম্পর্কেও তিনি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এ ধরণের পরীক্ষার ফল বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সুদূরপ্রসারী হলো। পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি ও বারিকে তিনি বিশ্বের আদি উপাদানরূপে গ্রহণ করলেন। এ্যানাক্সাগোরাসও এ' সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন: আদি উপাদানগুলিকে তিনি জগতের সব কিছুর বীজ ব'লে অভিহিত করলেন। আণবিক বিজ্ঞানের সেই হচ্ছে পূর্বাভাষ: জগতের, জীবনের আত্মসৃষ্টির দাবী। সে যুগে ডেমোক্রিটস এ'র নিয়ম লিপিবদ্ধ করলেন: অণুসমষ্টিহিসেবে প্রাণের রূপ বাৎলে দিলেন। তিনি বললেন, যার অস্তিত্ব নেই তা' থেকে কিছুর সৃষ্টি হ'তে পারে না; অণুর সমাবেশ ও পৃথকীকরণেই জগতে যা কিছু পরিবর্তন ঘটে; কারণ ছাড়া কিছু ঘটে না; অণু অসংখ্য ও অন্তহীন আকারের। শূন্যের মধ্য দিয়ে তাদের পতন ঘটচে এবং পরস্পর সংঘর্ষে ও চাপে তারা সৃষ্টি ক'রে চলেচে। সবচেয়ে সুন্দর ও গতিশীল অণুর সমষ্টিতে আত্মার জন্ম, প্রাণের অভ্যুদয়।

আধুনিক বিজ্ঞানে এ' মতবাদের বহু পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন ঘটেচে: কিন্তু অতিপ্রাকৃতিকতা থেকে মানুষের মুক্তির যে ভিত্তি এতে রচিত হয়েছিল, তাতে এ পর্যন্ত কোনো ফাটল ধরেনি। প্রোটাগোরাসের জীবন-দর্শন ডেমোক্রিটসের মতবাদকে আশ্রয় ক'রেই গ'ড়ে উঠেছিল; কিন্তু এথেন্সের রাষ্ট্রিক জীবনের জটিল গতিতে কালক্রমে তা' হারিয়ে গেলো। পৃথিবীকেন্দ্রিক জীবনের জয়ধ্বনি জেগে উঠেছিল মহানেতা মহাবক্তা পেরিক্লিসের কণ্ঠে—পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধের প্রথম বৎসরে এথেন্সের যে সব নাগরিকের মৃত্যু ঘটেছিল তাদের সমাধিপার্শ্বে শোকগাথায়। এথেন্সের রাষ্ট্রতন্ত্রের সমুন্নত আদর্শ ব্যাখ্যা ক'রে পেরিক্লিস বললেন: "আমাদের জন্যে প্রাণ দিলেন যাঁরা তাঁরা বেঁচে থাকবেন শুধু স্মৃতিস্তম্ভে নয়—বেঁচে থাকবেন মানুষের মনে। তাঁদের গৌরব রবে চিরনবীন, মানুষকে উদ্দীপ্ত করবে। কীর্তিমান যাঁরা সমস্ত পৃথিবীই তাঁদের

স্মৃতিস্তম্ভ : সব মানুষের জীবনে গাঁথা হ'য়ে থাকে তাঁদের জীবন। দেশের জন্তে প্রাণ দিয়েচেন যাঁরা তাঁরা আমাদেরে এ'শিক্ষা দিয়েচেন যে দেশের জন্তে বেঁচে থাকাতেই জীবনের প্রকৃত গৌরব।—"

এই জীবনের রয়েচে এক অভিজাত উৎকর্ষ—জীবনকে সমুন্নত করবার বহুমুখী প্রচেষ্টা : সে প্রচেষ্টা দেহকেই ভিত্তি ক'রে, দেহের বিকাশসাধনা অবলম্বন ক'রে। এথেন্সের নাগরিক জীবন, তার অতীত গৌরব, ভবিষ্যতে তার দুঃসাহসিক অভিযান—এদেরই প্রেরণা সেখানে জীবনের পটভূমি রচনা করেছিল। এই জীবনের যা' কিছু তা' নিয়েই জীবন : বাইরের কোনো কিছুর উপর তা নির্ভরশীল নয়। পেরিক্লিসের চিরস্মরণীয় ভাষণে ছিলনা কোনো দেবতার উল্লেখ, ছিলনা যাঁরা প্রাণদান করেছিলেন ভবিষ্যতে তাঁদের কোনোরূপ অস্তিত্ব থাকবে এমন আভাষ। পেরিক্লিসের যুগের গ্রীসীয় সংস্কৃতিতে মানবতাবাদের প্রকাশ সুস্পষ্ট। মানুষকে সমুন্নত করতে সাহায্য করে কিনা, জীবনকে উন্নত করতে পারে কিনা এই ছিল সে সংস্কৃতির বিচারের মান। "এন্টিগোন" নাটকে সফোক্লিস বলেচেন, "জগতে অনেক বিস্ময় আছে, কিন্তু মানুষের চেয়ে বড়ো বিস্ময় আর নেই। বায়ু তার চিন্তাকে বহন ক'রে চলেচে, তার অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার সমস্ত স্বপ্ন অতিক্রম করেচে।" ইউরিপাইডিস এথেনীয় ধর্মসংস্কারকে বিদ্রূপ ক'রে নাটক লিখেছিলেন, অন্যান্তদের লেখাতেও মানব জীবনের প্রতি মমত্ববোধ ফুটে উঠেছিল।

কিন্তু এই ধারা অব্যাহত থাকার উপায় ছিল না। তার কারণ ছিল প্রথমত এই যে এথেনীয় সমাজের স্থিতি ছিল দাসপ্রথার উপর। যদিও বলা হ'য়ে থাকে যে সেখানকার দাসেরা ছিল নামেই দাস, আদতে তাদের কোনো অসন্তোষ ছিল না—দাসপ্রথা সে যুগে স্বাভাবিক বলেই গণ্য করা হতো, তবু দাসপ্রথার সঙ্গে মানবতাবাদের সামঞ্জস্য ঘটানোর অসম্ভাব্যতা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। এথেন্সে মানবতাবাদ প্রোটাগোরাস প্রমুখ সফিষ্টদের মতবাদের উপর গড়ে উঠেছিল : কিন্তু তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তারও আগে যখন জেনোফোন এই মতের প্রতিবাদ করেছিলেন যে যেহেতু এই বিশ্বজগৎ দেবদেবীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেহেতু মানুষের কিছুই করবার নেই, জানবারও নেই, জানা সম্ভবও নয়—তবে অজ্ঞাত অজ্ঞেয় দেবতার প্রতিভূরূপে রাষ্ট্রপরিচালনা করচেন যাঁরা তাঁরাই যা' কিছু জানতে শুনতে পারেন। জেনোফোন ও তাঁর মতাবলম্বীদেরে বলা হয় সংশয়বাদী : তাঁরা বলতেন, কিছুই নিশ্চিত জানবার উপায় নেই, —যাঁরা জেনেচেন বলে বলেন তাঁরা ভ্রান্ত। সংশয়বাদ ছিল একটা মতবাদ মাত্র

তাকে টিকিয়ে রাখার মতো বাস্তব যুক্তির কাঠামো তখনো গ'ড়ে ওঠেনি। সফিষ্টরা সত্যের আপেক্ষিকতা ঘোষণা করলেন বটে—অর্থাৎ বললেন যে অণুর সমাবেশে ও পৃথকীকরণে বস্তুর সৃষ্টি এবং সত্যের রূপও তারই দ্বারা নির্ধারিত: সেহেতু তা অপরিবর্তনীয় নয়, আপেক্ষিক। কিন্তু তাঁরা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করেছিলেন, সে প্রমাণ যে ভুলও হ'তে পারে সে সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। মানুষকে স্বরাট করবার অত্যধিক আগ্রহে তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে প্রাকৃতিক কার্যকারণসম্বন্ধ ব্যতীত কোনো কিছুই সঠিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হ'তে পারে না। সে সম্বন্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হ'লে পর প্রমাণকে প্রকৃতিসিদ্ধ বলা যেতে পারে।

সফিষ্টদের মতবাদে এই ফাঁক ছিল ব'লেই ঘোর যুক্তিবাদী সক্রেটিস তার বিরোধিতা করতে প্রণোদিত হ'য়েছিলেন। সংশয়বাদীদেরে তিনি বললেন: দেব-দেবীদের দ্বারা এ' জগৎ চলচে এ' ধারনা যদি সত্য নাও হয়, কী দিয়ে তা' চলচে তাওতো জানা যায় না: এমনও তো হ'তে পারে যে দেব-দেবীরা চান্‌না যে মানুষ তাঁদের গোপন রহস্যের সন্ধান পাক। সক্রেটিস তাই মানুষকে এই উপদেশ দিলেন যে নিজেদের চেতনাই তাদের হাতে সত্যোদ্ধারের একমাত্র উপায়, কাজেই তারা যেন তাই নিয়ে থাকে—দেবতাদের ব্যাপার নিয়ে মাথা না ঘামায়। কিন্তু সক্রেটিস যে মানুষকে নিজেদের বিচার নিজেদেরই করতে বলেচেন তা' এবং প্রোটাগোরাসের মানবীয় বিচার এক জিনিস ছিল না। সক্রেটিসের মতে ন্যায়, সততা, পুণ্য প্রভৃতির সংজ্ঞা নির্দিষ্ট রয়েচে: মানুষের কাজের বিচার তাদেরই মানদণ্ডে হবে: মানুষ যে অবস্থা বিচার ক'রে সে সবের রূপান্তর ঘটাবে এমন হ'তে পারবেনা।

প্লেটোকে এবিষয়ে গুরুমারা চেলা বলা যেতে পারে। যে নির্দিষ্ট ধারণার কথা সক্রেটিস বলেছিলেন প্লেটো তা' থেকে একেবারে বিশ্বজগৎব্যাপী এক সর্বাত্মক ভাবধারাতে উত্তীর্ণ হলেন এবং তা' থেকে একচ্ছত্র রাষ্ট্রের সমর্থক হয়ে পড়লেন। অভিজাত স্পার্টা নগরী প্লেটোর মতে আদর্শ প্রজাতন্ত্ররূপে প্রতিভাত হলো। প্লেটোর শিষ্য আরিস্ততোল কিন্তু বস্তুবাদী দর্শনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। বস্তু-নিরপেক্ষ ভাবধারার অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে, ভাবের উপর যতটা নির্ভর করা যায় ইন্দ্রিয়ের দৌলতে প্রাপ্ত অনুভূতির উপর নির্ভর করা যায় আরও কম। এই ক'রে তিনি বললেন, "জগতের মূলনীতিগুলো আপনা থেকে কার্যকরী রয়েচে: আমরা শুধু তাদের

প্রয়োগের বিশেষ বিবরণগুলো জানতে পারি।" মানুষকে তার পূর্ণ মর্যাদা দিতে অসমর্থ হলেন আরিস্ততোল : বস্তুত নারীদেরে তিনি সম্মানের আসন দেননি। বস্তুবাদের উপর নির্ভরশীল মানবতাবাদ দাসপ্রথাশ্রিত এথেন্সের অসম সমাজের চোরাবালিতে হারিয়ে গেলো। তবু মনে রাখা দরকার, সক্রেটিস যে মানুষকে নিজের চেতনার উপর নির্ভর করতে বলেছিলেন তাতেই তাঁকে বিষপানে প্রাণ ত্যাগ করতে হ'লো। প্রোটাগোরাসকে পালাতে হয়েছিল, তাঁর রচিত বইগুলো সব পোড়ানো হলো। এ্যানাক্সাগোরাস গ্রেপ্তার হলেন এবং কোনোমতে প্রাণ বাঁচালেন। তাঁরই সমধর্মী ডায়োজেনিসের উপর নানারকম অত্যাচার হ'লো। থেইলস, ডেমোক্রিটস ও তাঁদের ভাবে ভাবুক অন্য যাঁরা ছিলেন তাঁরা নাস্তিক ব'লে নিন্দিত হলেন। আরিস্ততোল মেসিডোনে গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন এবং মেসিডোনপতি ফিলিপ গ্রীসে বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠিত করলেন। গ্রীসের পতন হলো, তার সাংস্কৃতিক ধারাও আর প্রবহমান রইলোনা।

তাই রোম যখন গ্রীস অধিকার করলে তখন সেখান থেকে একচ্ছত্র রাষ্ট্রের আদর্শই গ্রহণ করলে। ড্র্যাকো, সোলোন ও লাইকারগাস গ্রীসে যে আইন প্রণয়ন করেছিলেন তারই উপর রোমের সমাজসংগঠন তৈরী হলো। সিসারো তার উপর ঈশ্বরের ইচ্ছা সংযোজন ক'রে রোমান সাম্রাজ্যের ভাবগত ভিত্তি বচনা করলেন। গ্রীসের চিন্তাধারা কিন্তু তখনো বস্তুবাদ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয় নি। স্টোইক নামক দার্শনিক সম্প্রদায় বললেন, পুণ্যকীর্তিই মানুষের চরম আদর্শ—তাতে যদি ব্যথা পেতে হয় তবে তাই বরণীয়। এই আদর্শেই রোমের বজ্রকঠিন সমাজ গড়ে উঠলো। কিন্তু এপিকিউরাস বললেন, পুণ্যকীর্তিই চবম আদর্শ নয় : আনন্দই হলো আদর্শ। এ শুধু তার দার্শনিক মতবাদ নয় : বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই তিনি এ' মত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ডেমোক্রিটসের পরমাণুবাদ গ্রহণ ক'রে তিনি বললেন, ঘূর্ণাপথে অণু অনেক সময়ে বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং তাতেই মানুষের নিজের ইচ্ছামতো কাজ করার সুযোগ ঘটে। অতিপ্রাকৃতিক কোনো শক্তি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করচে না : কাজেই ভয় করবার কিছু নেই। দেবদেবী নেই, মৃত্যুর পর জীবন নেই। কাজেই যুক্তিঅনুসারী এ' জীবন আনন্দে যাপনে কোনো বাধা নেই। আনন্দ বলতে তিনি বুঝতেন জ্ঞানানুসারী, কঠোর বাস্তব সত্যানুসারী জীবন। স্নেহ ভালোবাসা বন্ধুত্বকে তিনি খুব উচু স্থান দিয়েছিলেন : মানবজীবন মানবীয় অনুভূতিতেই সার্থক হবে, এই ছিল তাঁর মত। তাঁর এই মতবাদের তেমনই অপব্যাখ্যা হলো আমাদের দেশে

যেমন চার্বাকদর্শনের 'খাওদাও স্ফূর্তি কোরো' ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। রোম অবশ্য এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করলে: এপিকিউরাসের মতবাদে মানুষের মুক্তির যে নিশানা ছিল রোম তা' বুঝলোনা, বুঝলেও গ্রহণ করতো না। অবশ্য তারও শ্রেষ্ঠ দার্শনিক লুক্রেশিয়াস এপিকিউরাসের শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। তবে প্রচলিত সংস্কারের মুখ চেয়ে তিনি বলেছিলেন যে দেবদেবী কিছু রয়েচে বটে, কিন্তু তাঁরা মানুষের ব্যাপারে কথনো হস্তক্ষেপ করেন না। সিসারো ঐশ্বরিক ইচ্ছার উপর জোর দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার কারণ দেখিয়েছিলেন এই যে লোকে এ'সব বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করে ব'লেই তাদেরে দিয়ে অনেক কিছু মানিয়ে নেওয়া যায়—অর্থাৎ রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সুবিধাবাদিতাই আসল কারণ। জুলিয়াস সীজারেরও মনোভাব অনেকটা তাই ছিল: তিনি জনসাধারণকে খুশী রাখার জন্যে যাগযজ্ঞ পূজাপার্বণ সবই করতেন অথচ এ'সবে তাঁর অনাস্থা, অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা গোপন ছিল না: মৃত্যুর পরে কোনো জীবন আছে বলেও তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর সমসাময়িক প্রখ্যাত লেখক ওভিড ও হোরেসেরও সে বিশ্বাস ছিল না, রাষ্ট্রনীতিবিদ বড়ো প্লিনিরও নয়। কিন্তু রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রয়োজনে এপিকিউরাসের মতবাদকে চেপে দেওয়া হয়েছিলো।

তা' বলে সে মতবাদ ব্যর্থ হয়েচে এমন বলা চলে না। ডেমোক্রিটস ও এপিকিউরাসের ধারণাকল্পনা হ'তেই কালক্রমে আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েচে। গ্রীস আত্মসমন্বয় রক্ষা করতে পারলো না: এথেন্সের সমাজগঠন তার প্রগতির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ালো—তবু পেরিক্লিসের জবানীতে আমরা প্রাচীন যুগের মানবতাবাদের নিশানা পাই। যুক্তিমিশ্রিত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আদর্শের প্রেরণা ছিল সে মানবতাবাদের প্রাণ, উপযুক্ত কার্যপ্রণালীও তার আয়ত্তে ছিল আর ছিল কৃতকর্মের জন্যে দায়িত্ব নেবার প্রস্তুতি। সে মানবতাবাদ মানুষের আশ্রয়রূপে কল্পিত হয় নি: নতুন সভ্যতা গ'ড়ে তোলার সংকল্প ছিল তাতে, আর ছিল নিখিল মানবসমাজের মনুষ্যত্বের নিকট এই আবেদন—যেন সে নিজেকে পূর্ণ ও কীর্তিমান করে। সে মানবতাবাদ সফল হয় নি; সফল হ'লেও তার ভিত্তি যথেষ্ট মজবুত না হওয়ার দরুণ তার কীর্তি চিরস্থায়ী হতো না: কিন্তু তার ভগ্নাবশেষের ভেতর থেকে রয়ে গেছে শিল্পে ও সাহিত্যে অবিস্মরণীয় অবদান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও চিকিৎসা প্রণালী সম্পর্কে হিপোক্রেটিসের আদি কীর্তি এবং তা' থেকে অর্জিত মানুষের মহৎ উত্তরাধিকার—দুঃসাহসী প্রাণের এই অমলিন প্রকাশ রেখে গেলো গ্রীস ও রোমের পরাস্ত মানবতাবাদ।

প্রাচ্য চিন্তায় মানবতাবাদ

ভারতের তপোবনে আণবিক জগতের রহস্য প্রকাশ পেয়েছিল সে আজ মোটামুটি ছাব্বিশ শত বৎসর পূর্বের কথা। যে সময়ে গ্রীসে প্রাচীন অণুবিজ্ঞান উদ্ঘাটিত হয়েছিল সে সময়েরই কথা। মহর্ষি কণাদ বললেন: প্রত্যেক পদার্থই নানা অংশে বিভক্ত: পরস্পরের সঙ্গে মিলনে ও মিশ্রণে তারা সক্রিয়। কিন্তু ভাগ হ'তে হ'তে যখন আর ভাগ করা যায় না তখন সে পদার্থকে বলা হয় অণু। একই জাতীয় অণুর সংমিশ্রণে পদার্থ সৃষ্টি হ'য়ে চলে। তার কারণ এই যে অণুর মধ্যেই মিশ্রণের ও সৃষ্টির গুণ রয়েচে: তা' ছাড়া এক অতিপ্রাকৃতিক শক্তিও এর মধ্যে ক্রিয়া করচে। কণাদবর্ণিত অণুতে গতিশীলতা ছিলনা ব'লেই তাঁকে এক অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কথা পাড়তে হয়েছিল। আসলে অণুর মধ্যেই পরস্পর মিলনের প্রবণতা রয়েচে। কণাদকে এক অদৃশ্য, অতিপ্রাকৃতিক শক্তির দোহাই পাড়তে হয়েছিল এতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নেই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও অনেককে পদে পদে ভগবানকে কবুল ক'রে চল্‌তে দেখা গেছে।

কণাদের মতবাদে আত্মা নামক কোনো বস্তুর স্থান নেই। আদি কারণ ব'লে কোনো কিছু তিনি স্বীকার করেন নি। বস্তুত তিনি যে আণবিক তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন তা ডেমোক্রিটসের আণবিক মতবাদের চেয়েও বেশী স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁর মতে পরমাণুর পরস্পরের সঙ্গে মেলবার ও মেশবার শক্তি রয়েচে। পরমাণুর পারস্পরিক ক্রিয়া কী ভাবে হয় ডেমোক্রিটস তা' ব্যাখ্যা করেন নি— শুধু বলেছিলেন যে অণুর মিশ্রণ ও সংঘর্ষেই সৃষ্টি ঘটচে: মিশ্রণ ও সংঘর্ষ কেমন ক'রে ঘটচে তা' বলেন নি। কণাদ যে বৈশেষিক দর্শন প্রতিপন্ন করেন তাতে প্রকৃতি নিজেকে ক্রমাগত ভেঙ্গে সৃষ্টি ক'রে চলেচে। বস্তুর রূপান্তর আছে, ধ্বংস নেই।

সাঙ্খ্যদর্শন ঠিক বস্তুবাদে প্রতিষ্ঠিত ছিল না—বরং বুদ্ধিবাদী, স্বভাববাদী দর্শনরূপেই গ'ড়ে উঠেছিল। মহর্ষি কপিল নাস্তিক ব'লে পরিচিত ছিলেন: কিন্তু তাঁর প্রকৃত দার্শনিক অবদান ছিল এই যে—তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে শুধু ভাবজগৎ নয়, বহির্জগতেরও বাস্তব অস্তিত্ব রয়েচে। প্রত্যেক বস্তুরই উৎপত্তি অন্য কোনো বস্তু থেকে—এ'কথা ঘোষণা ক'রে তিনি বাইরের কোনো

সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের সম্ভাবনা অস্বীকার করলেন। প্রকৃতি থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি : আত্মা বা পুরুষও প্রকৃতিরই মতো অনাদি : প্রকৃতি ছাড়া পুরুষ নেই। সাংখ্য, বৈশেষিক ও ন্যায় মিলে স্বয়ম্ভূ জগৎ ও জীবন রচনা ক'রে দিলে। এই সময়েই উদ্ভব হলো চার্বাকদর্শনের : গ্রীসের এপিকিউরাসের মতবাদের সে সমগোত্রীয়। বৃহস্পতিকে এ'দর্শনের প্রবর্তক ব'লে বলা হ'য়ে থাকে। চার্বাক-মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য ব্যতীত কোনো সত্য নেই—এমন কি যুক্তিও সর্বথা নির্ভরযোগ্য নয়। আধুনিক অজ্ঞেয়বাদের দু'হাজারেরও বেশী আগে চার্বাক-দর্শনে হাতেকলমে পরীক্ষা সত্যনির্ধারণের একমাত্র পথ ব'লে প্রতিপন্ন হয়েছিল। কাজেই এ'মতে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো নীতিবাদ গ্রাহ্য নয়। জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বেঁচে থাকা : জীবনই সব, মরণের পর কিছু নেই। বলা বাহুল্য, এ মতকে স্ফূর্তিতে থাকার উপদেশ বলে বিদ্রূপ করা হয়েছিল —এখনও হচ্ছে।

বৌদ্ধ ধর্মকে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের বিদ্রোহের দর্শন ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। সে বিষয়ে ইতিহাসের সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, একথা ঠিক যে একদিকে ন্যায়-বৈশেষিকের বস্তুবাদ, অপর দিকে সাংখ্য ও চার্বাকদর্শনের যুক্তিবাদী ধারার পরিণতি রূপেই বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল। বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রের অনুশাসন অগ্রাহ্য করলে—বেদোক্ত যাগযজ্ঞের প্রয়োজন স্বীকার করলে না। আদি কারণ তথা উপনিষদোক্ত ব্রহ্মার এবং আদি আত্মার অস্তিত্ব তাতে সমভাবে অস্বীকৃত হ'লো। আত্মার উৎপত্তি জীবন থেকে : আত্মা থেকে প্রাণের উৎপত্তি নয়। মানুষের ব্যক্তিচেতনা জীবনপ্রবাহে অর্জিত সংস্কারের সমাবেশ মাত্র : সে সব সংস্কারও কার্যকারণে গ্রথিত। বুদ্ধদেব সাধারণ মানুষকে ব্রাহ্মণ্য-বাদের পাহাড় মাথা থেকে নামিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌বার শক্তি দিলেন। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ পরমাণুকে আশ্রয় ক'রে গ'ড়ে উঠ্‌লো : কিন্তু তিনি এ'ও বললেন যে দুঃখশোক ভরা এ'জগতে নির্বাণই কাম্য। বৌদ্ধধর্মকে উচ্ছেদ ক'রে বেদান্তধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে নেমে এলেন শঙ্করাচার্য্য : তিনি বললেন, পরমাণু থেকেই যদি জগতের উদ্ভব এবং তা' যদি স্বয়ংক্রিয় হবে, তবে তার আবার নির্বাণ হয় কী ক'রে? পরমাণুর ক্রিয়া থামিয়ে দেওয়া যাবে, এ' কেমন ক'রে হ'তে পারে? বৌদ্ধদর্শনের মধ্যে এই মারাত্মক ফাঁক ছিল ব'লেই ব্রাহ্মণ্যবাদ তাতে অণুপ্রবেশ করলে এবং পরিণামে তাকে পরাস্ত করতে সমর্থ হলো। বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু নির্বাণের অন্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বলা হয়েচে, নির্বাণের অর্থ অস্তিত্বের অবসান নয়—কর্মের ভেতরে নিজেকে ভেঙে ছড়িয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দিয়ে মৃত্যুকে জয় করা। মৃত্যু যেহেতু অনিবার্য সেহেতু জগতে ও জীবনে নিজেকে বিস্তার করতে পারলেই আমরা অমরত্ব লাভ করি: অমরত্ব লাভ করবার আর কোনো রাস্তা নেই। আমাদের দেহ ধ্বংস হবে—কিন্তু আমাদের অস্তিত্বকে পরমাণুরূপে চারদিকে ছড়িয়ে দেবে এবং তাই হচ্চে নির্বাণ।

জৈনধর্মও প্রাকৃতিক বিবর্তনের উপর প্রতিষ্ঠিত। জৈনমতে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েচে কিন্তু আত্মার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েচে এই যে তা' অণুসমষ্টিতে গঠিত এবং তার আকার কমতে বাড়তে পারে। তা'তে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই: জল সর্বদাই কমচে বাড়চে, কিন্তু তার প্রবাহ সর্বদাই রয়েচে: তেম্‌নি আত্মা স্থায়ী—যেমন অন্তহীন পরিবর্তন সত্ত্বেও এই দৃশ্যমান জগৎ স্থায়ী।

শঙ্করাচার্য এর জবাব দিলেন এই যে তাই যদি হয় তবে সঠিক কিছুই জানবার উপায় নেই এবং মোক্ষলাভের সাধনাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের আভ্যন্তরীণ আপাত-অসংগতির সুযোগ নিলেও তিনি বস্তুবাদী যুক্তির মোকাবিলা না ক'রে পারলেন না। শঙ্করের অদ্বৈতবাদে ভগবান সর্বব্যাপী: তাইতে জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব নিহিত: আপাতদৃশ্য জগৎ বাস্তব সত্য নয়: মায়াই শক্তির উৎস, ব্রহ্মা জগতের আদি কারণ; কাজেই তিনি কার্যকারণসূত্রে জগতের সঙ্গে এক, তার সঙ্গে তাঁর অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ বর্তমান, তাঁর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তা' যদি হয় তো এই জগতের আলাদা নিয়ন্ত্রাতা আবার কে? শঙ্কর বললেন, ব্রহ্মাই ভগবান এবং মায়ার মাধ্যমে জগৎ নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকেন। কিন্তু মানুষের চেতনা যে বহির্জগৎ থেকেই প্রাপ্ত তা' তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। বস্তুবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে যথাসম্ভব খাপ খাইয়েই তিনি ব্রাহ্মণ্য-বাদী চিন্তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। মানুষ পুনরায় দেবতার অধীন হলো; আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তার আর রইলোনা। ইউরোপে গ্রীসীয় মানবতা-বাদের পরাজয় ঘটলেও বিজ্ঞানের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পুনরায় স্বস্থানে ফিরে যাবার চেষ্টা করচে। ভারতে তা সম্ভব হয়নি, হাজার হাজার বছর ধ'রে অধ্যাত্মবাদী চিন্তারই প্রাধান্য চলেচে। এর কারণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে নবোদ্ভূত বণিকশ্রেণী বাইরের দুনিয়ার সংস্পর্শে এসে স্বাধীন চিন্তাধারা ও মনের প্রসার লাভ করেছিল, তাদেরই সমর্থনে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। কিন্তু ভূস্বামী, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা নিজেদের প্রাধান্য পুনরুদ্ধারের জন্যে তাকে বিতাড়িত করলেন। নিষ্ঠুর বিধাতার অমোঘ বিধানে মানবতাবাদী চিন্তাধারা স্তব্ধ হলো।

তারপরও বিদ্রোহ ঘটেচে; আচারবিচারসর্বস্ব ধর্মীয় প্রভুত্বের বিরুদ্ধে মানবিকতার বিদ্রোহ ক্ষণে ক্ষণে মানবতার জয়ধ্বজা তুলে ধরেচে। প্রেমসাধনায় সব মানুষের সমান মর্যাদা ঘোষিত হলো বৈষ্ণবধর্মে: প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের শাসনের বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্যের একাধারে বিপদসঙ্কুল ও দৃঢ়প্রত্যয়ভিত্তিক অভিযান গভীর ও ব্যাপক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব রেখে গেছে। আসামে শঙ্করদেব ভগবান ও মানুষের মধ্যে মধ্যবর্তী কাউকে স্বীকার করতেন না, পূজার প্রসাদ নিতেন না—ভগবানকে তিনি মানুষের প্রত্যক্ষ ক'রে পেয়েছিলেন। মধ্যযুগীয় সাধনায় মানবিকতা—তথা দেবতা ও মানুষের একাত্মতা রূপে-রসে-গানে ফলবান হলো। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনবাণীতে জীবপ্রেম বিনা ভগবৎপ্রেম নেই। রামমোহন রায় উপনিষদে যে ব্রহ্মবাদ খুঁজে পেয়েছিলেন ও প্রচার করেছিলেন তাতে মানুষ বিশ্বরূপী ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করলে: মানুষ ও ব্রহ্মের মধ্যবর্তী কোনো কিছুর অবকাশ রইলো না। মানবতাবাদের অভিমুখে ব্রহ্মবাদ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ব'লে বর্ণিত হয়েচে। এম্‌নি ভাবে অজানা অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অধিষ্ঠানকে মানুষ সহজ ক'রে নিলে: অবশ্য স্বয়ম্ভূ মানুষকে সে আর ফিরে পেলে না। চিন্তার স্বরাজ্য তার হারিয়ে গেলো। রাষ্ট্রীয় উত্থানপতনের আড়ালে বহু শতাব্দী তাব মানবিকতার আশ্রয়ে কাটলো। তারপর একদিন সে আশ্রয়ও তার রইলো না: ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ভেদে তার জীবন হ'লো জর্জর। আবার সে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইলে: হ'লো তাতে আবার মানবতাবাদী চিন্তার অস্ফুট স্ফুরণ। সে অতি আধুনিক কালের কথা—আধুনিক বিজ্ঞানের সংস্পর্শে তখন সে এসেচে, আধুনিক জীবনের প্রাণবাণী তার মর্ম স্পর্শ করেচে। জীবনে তখন তার আবার নবজাগরণ। সে কথা যথাস্থানে হবে।

চীনের প্রাচীন ইতিহাসে মানবতাবাদের সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া যায় না বটে—কিন্তু কনফুসিয়াসের হিতোপদেশকে কেউ কেউ মানবতাদের দ্যোতক ব'লে ব্যাখ্যা করেচেন। কনফুসিয়াস পরিবারকেন্দ্রিক সমাজকেই বড়ো করে তুলে ধরেছিলেন—এমন কি সেজন্যে সামন্ততন্ত্রের বিরোধিতা করতেও ছাড়েন নি। তিনি যে সমাজনীতি বাৎলেছিলেন তাতে রাজাপ্রজা সবাইর কর্তব্য কঠোর-রূপে নির্ধারিত ছিল। গোষ্ঠীগত অর্থনীতির উপর তিনি প্রজাবৎসল অথচ একচ্ছত্র রাষ্ট্রের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। তারপর লাওৎসে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহের বাণী লিপিবদ্ধ করলেন, কিন্তু তাকে কার্যকরী করতে পারে এমন বিপ্লবী শ্রেণী বা লোকসমষ্টি সে সময়ে না থাকাতে সে বাণী ঘোর

আশাহীনতায় ও ভূয়া শান্তিবাদে পর্যবসিত হলো। বিদ্রোহের বাণী অবশ্য পরে কারও কারও কণ্ঠে স্পষ্টতর হলো এবং বস্তুবাদী চিন্তারও নিদর্শন মিললো; কিন্তু যতদূর জানা যায়, কনফুসিয়াসের জীবনদর্শনও কোনোরূপ অতিপ্রাকৃতিকতার উপর নির্ভরশীল ছিল না। তিনি বলতেন, "জীবন সম্বন্ধেই আমরা কিছু জানতে পারচিনে, এ অবস্থায় মৃত্যু সম্বন্ধে কীইবা জানতে পারি?" ভগবান বা দেবদেবী সম্বন্ধেও তাঁর মত ছিল এই যে—সঠিক কিছু বলা যায় না। চীন দেশের প্রখ্যাত ও আমেরিকাপ্রবাসী লেখক লিন উ টাঙের মতে কনফুসিয়াস সত্যিকার মানবতাবাদী ছিলেন। তিনি বলেচেন যে চীন দেশে মানবতাবাদ কনফুসিয়াসের ভাবধারানুযায়ী গতিপ্রকৃতি লাভ করেচে এবং সে ভাবধারা হচ্চে এই: "চীনদেশের লোকদের এমন বিশ্বাস নেই যে জীবনের লক্ষ্য মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে প্রসারিত রয়েচে। খৃষ্টান মতবাদে মানুষকে এই শিক্ষা দেয় যে আমরা বেচে আছি মরবারই জন্যে; চীনাদের নিকট এ শিক্ষা দুর্বোধ্য বোধ হয়। নির্বাণেও তাদের বিশ্বাস নেই—কারণ ওটা অতিমাত্রায় অধ্যাত্ম ব্যাপার। পার্থিব কৃতিত্বকেও তারা মূল্য দেয় না, কারণ তাতে মানুষকে দাম্ভিক ক'রে তোলে, শুধু উন্নতির জন্য উন্নতি করার কোনো অর্থ নেই ব'লে তেমনিতরো উন্নতিতেও তাদের আস্থা নেই। চীনারা এই স্পষ্ট ও পরিষ্কার সিদ্ধান্তই করেচে যে সরল জীবনযাপনই জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত: সরল জীবনের অর্থ বিশেষ করে' পারিবারিক জীবন ও সবাইয়ের সঙ্গে মিলে মিশে থাকা। চীনারা যে এ' জীবন—এ' মাটির পৃথিবীর জীবনই ভালবাসে এবং অদেখা, অজানা স্বর্গের জন্য তা' ছাড়তে রাজী নয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। জীবন দুঃখের—তবু তা সুন্দর, এবং আনন্দের মুহূর্তগুলি ক্ষণস্থায়ী বলেই মূল্যবান: চীনারা তাই ভালবাসে জীবনকে।" চীনের জাতীয় ভাবধারা সম্বন্ধে এ মন্তব্য সত্য হ'তে পারে। কিন্তু এ দাবী কোনোক্রমেই করা চলেনা যে তার রাষ্ট্রীক-সামাজিক জীবনে এ' ভাব জয়ী হয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে তার জনগণ নিপীড়িত ছিল, আত্মনিয়ন্ত্রণের দুরন্ত সংগ্রাম তাদের করতে হয়েচে: তারই গতিপথে যখন সে দেশ সাম্যবাদে উত্তীর্ণ হ'লো, তখন সে পৃথিবীর অন্যান্য সাম্যবাদী রাষ্ট্রের সমপর্যায়ে পৌছুলো। তাদেরই মতো আজ তার সাম্যবাদের সঙ্গে মানবতাবাদের মোকাবিলা।

ইসলাম এশিয়ার ও আফ্রিকার অন্যতম প্রধান ধর্ম: প্রাচীন সভ্যতারাজির পতনে তার গৌরবময় আবির্ভাব। ইসলাম মানবকেন্দ্রিক ধর্ম নয়, কিন্তু নিজ

অনুবর্তীদের নিকট ইসলাম সাম্যের বাণী বহন ক'রে এনেছে এবং প্রাচীন সমাজের নিপীড়িত, অবহেলিত জনগণের নিকট তা' মুক্তিস্বরূপ প্রতিভাত হ'লো। তারই প্রেরণাতে আরবভূমিতে বুদ্ধির মুক্তি ঘটলো এবং জ্ঞানচর্চায় তার দান অসামান্য হ'লো। আবু রস্দ (ইউরোপে তাঁর নাম ছিল আভেরস), আল গাজালী ও অন্যান্য দার্শনিকগণ যুক্তিকেই জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পন্থা ব'লে নির্দেশ করলেন: আল্লাহ্ দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয় নন—তাঁর কাজের ভেতর দিয়ে বাস্তব-জগতের মাধ্যমে তাঁকে জানতে হ'বে এবং সেজন্যে অনুসন্ধান চালাতে হবে, এই তাঁরা প্রচার করলেন; গ্রীসের প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরনুশীলন ক'রে তাঁরা তার যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা করলেন: জ্ঞানচর্চায় তাঁদের নিকট ইউরোপের—তথা জগতের ঋণ বিপুল হ'লো। এতটা স্বাধীনতা কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানগণ সহ্য করলেন না: বিশেষ ক'রে আভেরসকে অসীম নিগ্রহ সহ্য কবতে হয়েছিল। তবু তাঁরা যে পরিবেশ তৈরী কবেছিলেন তাতে জ্ঞানচর্চা মুক্ত গতিলাভ করলো: ইরাণে সুফী সাধনার উৎপত্তি হ'লো: তার সমন্বয়ী প্রভাব ভারতেরও শিল্পে, সাধনায়, স্থাপত্যে চিরস্থায়ী রূপ ধরেছে। ওমর খৈয়াম যখন লিখলেন:

বুড়ো খৈয়মের সাথে
এসো:
এসো আজ মোরা আনন্দ করি,
এই জানি শুধু নিশ্চয় করি'
জীবন উড়িয়া যায়
শুধু এ' নিশ্চিত হায়
মিছে সব কিছু আর
ফুটিল যে ফুল একবার
যখনি ঝরিল সে
চিরতরে মরিল সে।

তখন এই জীবনকে একমাত্র সত্য জেনে একে প্রতি পলে ফুটিয়ে তোলার আহ্বান জানালেন: সে জীবন শুধু সুরা ও নারী নিয়ে জীবন নয়: গভীরতম সৌন্দর্যানুভূতিতে সার্থক জীবন। মানুষকে আহ্বান জানালেন তিনি তত্ত্বজ্ঞানীদের পরিহার করবার, তথাকথিত অধ্যাত্মতত্ত্বের ধোঁয়াটে জগতে হারিয়ে না যাবার। এই জীবনই সত্য আর সব মিথ্যা: থাকুন সুলতান মাহমুদ তাঁর সিংহাসনে, থাকুন তত্ত্ব শিরোমণিদের মাথায়—হায়রে মিছে, হায়রে মিছে। ওমর খৈয়ামের বাণীতে হ'লো মানুষ ও জীবনের নিঃশেষ মিলন।

খৃষ্টধর্ম ও মানবতাবাদ

মানবিকতার সাহায্যে মানবতাবাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা খৃষ্ট-ধর্মের গতিপ্রকৃতিতে বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত এই চেষ্টাচ্ছলেই খৃষ্টীয় সম্প্রদায় থেকে উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েচে। ওল্ড টেষ্টামেণ্টেও এই পার্থিব জীবনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। সলোমনের গান ও এক্লেজিয়েসটিক্স নামক গানদুটিতে প্রেমের ও জীবনের জয় গীত হয়েচে। সমসাময়িক দুর্নীতি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইহুদী ধর্মগুরুদেব প্রতিবাদের বাণী এখনও লিপিবদ্ধ আছে। নিউ টেষ্টামেন্টে কিন্তু মানবতাবাদের সমর্থক কিছুই নেই। যীশু যে পরোপকার, মানুষের সৌভ্রাত্র বা পৃথিবীতে শান্তির উপর জোর দিয়েছিলেন তার বহুবিধ সুফল হয়েচে—বস্তুত তাঁর জীবন ও বাণী মানুষের জীবনে মানবিকতার চরম স্বাক্ষর রেখে গেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা—ত্রিমূর্তিরূপে কল্পিত যে ভগবান তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ খৃষ্টান ধর্মলোকের ভেতরেই আত্মপ্রকাশ করলেঃ সেখানে মানবতার সেই প্রথম প্রকাশ বলা যেতে পারে। চতুর্থ শতাব্দীতে এরিয়ান নামে একজন পাদ্রী এই মত ঘোষণা করলেন যে যীশুর দেহমন মানবীয় গুণাবলীতেই গঠিত ছিলঃ তাঁর উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করার কোনো সংগতি নেই। যীশুখৃষ্ট মানুষের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, সমসাময়িক দুর্নীতিবিচ্যুতির বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছিলেন এবং মানবজাতির জন্যে আত্মদানের মহৎ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন—এ' কথাই বললেন এরিয়ান। মানবীয় পর্যায়ে যীশুর জীবনের মূল্যনির্ধারণের সেই হয়েছিল সূচনা। খ্রীষ্টীয় যাজকসম্প্রদায় সরকারীভাবে এ মত অবৈধ ঘোষণা করলেন।

তবু এ' মত চেপে রাখা গেলো না। মিগুয়েল সার্ভিটাস ঘোষণা করলেন যে ত্রিমূর্তি পরিকল্পনা একাধারে কুতর্ক ও পাগলামীর উপর প্রতিষ্ঠিত, ধর্মগ্রন্থে এর কোনো উল্লেখ নেই। আসলে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। ক্যাথোলিক ও প্রোটেষ্টান্ট নামক উভয় সম্প্রদায়ই তাঁর এ' মত এবং যে বইয়ের মাধ্যমে তাঁর এ' মত প্রচারিত হয়েছিল তা' নিষিদ্ধ করেছিলেন। পোপের শাসন ও শাস্তি তখন ছিল বড়ো নিদারুণঃ সার্ভিটাস তা' কোনোক্রমে এড়াতে পারলেন—কিন্তু পড়লেন গিয়ে জেনেভাতে জন ক্যালভিনের হাতেঃ ক্যালভিন ছিলেন সেখানকার একচ্ছত্র নায়ক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের পোপ-স্থানীয়।

সেখানে সার্ভিটাসের বিচার হয়, এবং ১৫৫৩ সালে তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হলো: তাঁর প্রাণের ভস্মাবশেষ থেকে উৎপত্তি হয় ইউনিটেরিয়ান আন্দোলনের —যে আন্দোলনের মর্মকথা এই যে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, মানবিকতাই যীশু খৃষ্টের প্রাণ: অমানুষিকতার স্থান নেই তাঁর মধ্যে। এই বাণীকেই ভাষা দিয়েছিলেন সিবাসটিয়ান ক্যাসটিলিও: ১৫৫১ সালে প্রকাশিত তাঁর "সহনশীলতার পক্ষে ইস্তাহার" মানবতাবাদের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে। ক্যাসটিলিও ক্যালভিনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েই জেনেভাতে এসেছিলেন; কিন্তু ক্যালভিনের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাতে ক্যালভিন তাঁর চাকুরি কেড়ে নিলেন এবং জেনেভা থেকে বহিস্কৃত করতেও দ্বিধা করলেননা। এর পরে অতীব দুঃখদারিদ্র্যে ও জীবিকার জন্যে কঠোর একঘেয়ে পরিশ্রমেই তাঁর দিন কাটে। এ অবস্থার মধ্যেই তিনি সার্ভিটাসের হত্যার প্রতিবাদে ইস্তাহার রচনা ও প্রকাশ করেন। একান্ত ভগ্ন-স্বাস্থ্যে ও দীনাবস্থায় মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তা' না হ'লেও হয়তো শত্রুর চক্রান্তেই তাঁকে প্রাণ হারাতে হ'তো। মৃত্যুর পর তাঁর চিন্তাধারা রাষ্ট্রনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তায় এবং রাষ্ট্রিক ইতিহাসেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

ইউনিটেরিয়ান আন্দোলন ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে; আমেরিকায় এর অন্যতম নেতা ছিলেন বিখ্যাত মনীষী ও লেখক এমার্সন। এই আন্দোলন থেকেই ধর্মীয় মানবতাবাদ নামক মতবাদের উদ্ভব হয়: ১৯৩৩ সালে তারই পক্ষ থেকে "মানবতাবাদী ইস্তাহার" প্রকাশ এক স্মরণীয় ঘটনা। ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যক্তি-স্বাধীনতাই ছিল এই আন্দোলনের মূলমন্ত্র: মানবপ্রকৃতির মূল্য ও গৌরব, মানবজীবনের পবিত্রতা তাতে বিজ্ঞাপিত হ'লো: গোঁড়া খৃষ্টধর্মে মানুষকে যে অদৃশ্য শক্তির ক্রীড়নক ও ধরাধামে সে শক্তির যাঁরা প্রতিনিধি তাঁদের দাস বলে গণ্য করা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠলো। সার্বজনীন খৃষ্টধর্ম নামে আরেকটি মতবাদও দেখা দিলো। তার কারবার ছিল সমগ্র মানবজাতিকে নিয়ে। ভগবান সমগ্র মানবজাতিকে মুক্তি দিয়ে পবিত্র আনন্দলোকে তাকে উত্তীর্ণ ক'রে দেবেন, এই ছিল সে মতবাদের মর্ম।

খৃষ্টধর্মের আভ্যন্তরীন গণ্ডীতে যে প্রোটেষ্টাণ্ট আন্দোলন হ'লো তার পক্ষেও এ' দাবী করা হয় যে প্রচলিত খৃষ্টধর্মে বাহ্য অনুষ্ঠান ও অতি-প্রাকৃতিক শক্তির কৃপায় মুক্তিসাধনাই ছিল একান্ত; তার পরিবর্তে

এ' আন্দোলনে সৎকর্ম ও নৈতিক উন্নতির উপর জোর দেওয়া হলো। তাতেই খৃষ্ট ধর্মে মানবিক ধারার প্রবর্তন হলো। সে ধারা বেয়ে যুক্তিঅনুসারী আর যেসব মতবাদ গ'ড়ে উঠলো তাদের মধ্যে ডুয়েলিজম বা দ্বৈতবাদ প্রধান। এ' মতের মর্মকথা এই যে ভগবান আদিতে সব সৃষ্টি করেছিলেন বটে, কিন্তু পরে আর হস্তক্ষেপ করেননি ও করচেন না। বিশ্ব সেই থেকে প্রাকৃতিক নিয়মে আত্মবিবর্তিত হ'য়ে আসচে। কাজেই মানুষকেও নিজ চেষ্টা ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করতে হ'বে। এই মত অষ্টাদশ শতাব্দীতে খুব প্রাধান্য লাভ করেছিল। এর অনুবর্তীদের মধ্যে কয়েকজনের নাম করলেই এর তদানীন্তন প্রভাব উপলব্ধি করা যাবে: স্যার আইজাক নিউটন, ভলটেয়ার, জার্মানির জি, ই, লেসিং, মার্কিন রাষ্ট্রনেতা টমাস জেফারসন ও বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, মার্কিন চিন্তানায়ক টমাস্ পেইন। জেফারসন বলেছিলেন: যুক্তিই একমাত্র অবলম্বন, যুক্তিঅনুসারে প্রয়োজন হ'লে ঈশ্বরের অস্তিত্বও অস্বীকার করতে হবে। জর্জ ওয়াশিংটন এবং যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি জন এ্যাডামসও দ্বৈতবাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়াতে আমেরিকার রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবি মহলে রক্ষণশীলতা ফের জোর ধরে এবং দ্বৈতবাদের প্রভাব কমে যায়। কিন্তু কয়েকটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে খৃষ্টধর্মের মানবিক রূপ পারলৌকিক তত্ত্বকে ছাপিয়ে ফুটে ওঠে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কোয়েকার সম্প্রদায়। তাদের অন্য নাম বন্ধু সম্প্রদায়। কোয়েকারেরা ত্রিমূর্তি পরিকল্পনাতে বিশ্বাস করতেন না। লৌকিক ধর্মের পরিবর্তে ব্যক্তিগত কর্মপ্রেরণার উপরই তাঁদের বি"াস ছিল। তাঁরা দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অনুন্নত জাতিদের উন্নতি বিধান, জেলের বন্দীদেরে যাতে ভালো ভাবে রাখা হয় তার চেষ্টা, জঙ্গীবাদের ও যুদ্ধের বিরোধিতা প্রভৃতিতেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ধর্মসম্প্রদায় পরিচালনার কাজে তাঁরাই প্রথম মেয়েদেরে পুরুষদের সঙ্গে সমানাধিকার দেন। আদর্শের সঙ্গে সংগতি রেখে তাঁরা অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতেন। তাঁদের কর্মপ্রণালী অবৈধ বিবেচিত হলো, তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাও বিপজ্জনক বলে গণ্য হতো। উইলিয়াম পেন ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য: নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের দরুণ যাঁরা লাঞ্ছিত তাঁদের জন্যে তিনি এক উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। তাঁকে বারবার কারাজীবন যাপন করতে হয়েছিল, নয় মাস কাল টাওয়ার অব লণ্ডনে নির্জন কারাবাসও করতে হয়—তবু নিজের মতামতে কোন আপোষ করেন নি।

আমাদের সময়ে হোরেস আলেকজান্দার, মিস আগাথা হ্যারিসন প্রমুখ কোয়েকারদের ভারতের স্বাধীনতার দাবীর প্রতি সহানুভূতি এবং যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির সময়ে এদেশে সেবাকার্যের কথাও এ প্রসঙ্গে সহজেই মনে পড়ে।

উনবিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্রী নামে এক সম্প্রদায় ইংলণ্ডে কিছুটা প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। কার্লাইল এদেরে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন: চার্লস কিংসলী নামক লেখক ছিলেন এদের অন্যতম নায়ক। কিংসলী লিখেছিলেন যে বাইবেল গরীবদেরে ঘুম পাড়িয়ে রাখবার জন্যে আফিমরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কার্ল মার্ক্স ধর্মসম্বন্ধে যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন কিংসলীর ব্যাখ্যার সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল রয়েছে। কিংসলী বললেন—দরিদ্রদেরে বলা হয়েছে যে বাইবেলে মানুষের প্রতি ধৈর্যধারণের অনুশাসন রয়েছে; কিন্তু স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতিও যে রয়েছে সে কথা বলা হয়নি। সম্পত্তিবানদের অধিকার ও শ্রমিকদের কর্তব্যসম্বন্ধে বলা হয়েছে; কিন্তু এ' কথা বলা হয়নি যে সম্পত্তি-বানদের কর্তব্য ও শ্রমিকদের অধিকার সম্বন্ধে বাইবেলে তার দশ গুণ বেশী বলা আছে। খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশেও বিস্তার লাভ করে।

শুধু খৃষ্টধর্মে নয়, অন্যান্য ধর্মেও মানুষের দুঃখ দূর করার অনুশাসন রয়েছে। মানবতাবাদীরা অতিপ্রাকৃতিক কোনো শক্তিতে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু যারা তাতে বিশ্বাস করেন তাঁরা মানুষের ভালোর জন্য যা' কিছু ভাবেন ও করেন তার সঙ্গে তাঁদের যোগ রয়েছে। এ কথা সত্য যে ধর্মীয় ভাবধারা ও কর্মও রক্ষণশীলতারই সহায়ক হয়েছে; কিন্তু তার মধ্যে যাঁরা মানুষের ভালোকে বড়ো ক'রে দেখেছেন তাঁরা অপূর্ব সাহস ও ত্যাগের দৃষ্টান্তও রেখে গেছেন। অসংখ্য লোক মানুষের বিবেকের ও ধর্মের স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষার জন্যে আত্মদান ক'রে গেছেন। গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রামে তাঁদের অবদানও অনস্বীকার্য। এ' কথাও সত্য যে প্রত্যেক ধর্মেই নিজেকে অতিক্রম ক'রে অপরের সেবার কথা বলা হয়েছে এবং সভ্যতার ইতিহাসে এই আদর্শের বিশেষ প্রভাব রয়েছে।

কিন্তু তা'ও পূর্ণ হতে পারে মানবতার দ্বারা: নিছক মানবিকতায় তা কখনো হবার নয়। তার প্রমাণ এই যে বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন জাতি ও দেশের ভেতর ভেদ ও সংঘাতেরই সৃষ্টি করেছে—যদিও অনেক সময়ে বলা হয় যে বিভিন্ন ধর্মের মূলবস্তু এক। বিভিন্ন ধর্ম দূরে থাকুক, একই ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনৈক্য ও সংঘাত নিদারুণ হতে দেখা যায়। দৃষ্টান্ত-

স্বরূপ খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের কথা বলা চলে। অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধেও সেই একই কথা: তাদের পরস্পরের মধ্যেও সংঘাতই বড়ো কথা: ঐক্য বা ভ্রাতৃত্ব নয়। ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দুমুসলমানের দ্বন্দ্ব ও তার রাজনৈতিক ফলাফল এ' প্রসঙ্গে উল্লেখ না ক'রে উপায় নেই। রাজনৈতিক কারণে এ' দ্বন্দের উদ্ভব, অর্থনৈতিক কারণ এতে ইন্ধন যুগিয়েচে—এ' সব যুক্তি মেনে নিলেও এ' কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে ধর্মকে এ' দ্বন্দের উপলক্ষরূপে ব্যবহার করা হয়েচে: তাতে ধর্মের অন্তর থেকে বা ধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকে কার্যকরী কোনো বাধাই আসেনি। ধর্মের মর্মে মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের বাণী নিহিত আছে ব'লে যে দাবী করা হ'য়ে থাকে তা অবাস্তব প্রমাণিত হয়েচে। বোঝা গেছে যে সে বাণী জীবন্ত, প্রাণবন্ত নয়। কাজেই এ' সত্য অস্বীকার করা বৃথা যে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত আশ্রয়ের প্রয়োজন মেটাতে পারেনি: ধর্মীয় মানবিকতাও ব্যর্থ হয়েচে। অদৃশ্য বিধির উপাসকগণ যেখানে পরস্পর হানাহানিতে মত্ত, তাদের উপাসনাবিধি থেকে মিলে মিশে থাকবার কার্যক্রম খুঁজে পেতে অসমর্থ হয়েচে সেখানে একমাত্র ভরসা মানবতাবাদ: মানুষকে ভিত্তি ক'রে, মানুষকে কেন্দ্র ক'রে, মানুষকে বড়ো ক'রে এবং অন্য সব মানুষের সঙ্গে সমান ক'রে যে জীবননীতি—তাই মানুষকে রক্ষা করবে, এই একমাত্র আশা। এ জন্যেই সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে মানবতাবাদকে সরকারী-ভাবে গ্রহণ করবার প্রস্তাব উঠেছিল। আমাদের এ' উপমহাদেশকেও ধর্ম রক্ষা করতে পারেনি: যে সাংস্কৃতিক সমন্বয় ভারতের প্রাণ বলে আমরা বিশ্বাস ও দাবী ক'রে থাকি, তাকে সমর্থন করা দূরে থাকুক—তাকে ধ্বংস করতে চেয়েচে, রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে তাকে পরাস্ত করেচে। অথচ সে সমন্বয়ের বাণী মানবতার বাণী ছাড়া কিছু নয়। মানুষের সুখদুঃখ আশানিরাশাকে একত্র গেঁথে যে মানবিক মূল্যবোধ তাকে শান্তি দেয়, সান্ত্বনা দেয়, সমন্বয়ই তার মর্মবাণী। অন্যপক্ষে আমরা তো দেখচি ধর্মগত বিভেদ লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি, সর্বস্বহানি ঘটালে: মানুষের দুঃখের পাত্র ষোলকলা পূর্ণ করে দিলে, অন্তরবাইরের কোনো আশ্রয় তার থাকতে দিলেনা। তাইতো এ' সবনাশের সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সেজন মারে আর শুধু মরে;
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,

ধার্মিকতার করেনা আড়ম্বর,
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্র মানেনা—মানে মানুষের ভালো।

বিধর্মী বলি মারে পরধর্মেরে,
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে ;
পিতার নামেতে হানে তার সন্তানে,
আচার লইয়া বিচার নাহিক জানে,
পূজা।,হে তোলে রক্তমাখানো ধ্বজা ;
দেবতার নামে এযে শয়তান ভজা।”

কিন্তু এ’ দেবতাই বা কেমন যে শয়তানকে জয় করতে পারলেন না ? এর উত্তর যদি এই হয় যে মানুষ তার কর্মফল ভোগ করচে তবে বলবো মানুষ তা’ হ’লে নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করচে—এবং তাইই মানবতাবাদ।

রেনেসাঁ ও মানবতাবাদ

গ্রীসীয় মানবতাবাদের প্রায় দু'হাজার বছর পর ফের বুদ্ধির মুক্তির ডাক এলো : এলো ইতালীতে : পঞ্চদশ শতাব্দীতে দুকুলভাঙ্গা প্রলয়জাগা যে আন্দোলন জাগলো সে ডাকে, তার নাম পুনরুজ্জীবন বা রেনেসাঁ আন্দোলন। বিশেষ ক'রে ইতালীতে যে এমনধারা আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করলে, তার কারণ ছিল। গ্রীসের দার্শনিক দুই ধারা—ষ্টোইক ও এপিকিউরান—রোমে এসেছিল প্রত্যক্ষভাবে এবং পৌত্তলিক রোমের জীবনদর্শনে সহজভাবে মিশেছিল। ষ্টোইক ও এপিকিউরানদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ ছিল ; কিন্তু ষ্টোইকেরাও জীবনে যুক্তির স্থানের উপর জোর দিতেন, বলতেন যে বিশ্ব একাধারে ঈশ্বর ও জড়পদার্থের উপাদান নিয়ে গঠিত ; অতএব প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে বাঁচতে হবে : প্রকৃতি যেহেতু যুক্তিঅনুসারে চলে, মানুষকেও তাই চলতে হবে।

একদিকে দার্শনিক চিন্তাধারায় মুক্তবুদ্ধির অনুশীলন, অপর দিকে আরব পণ্ডিতদের যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা—এই দুই মিলে রেনেসাঁর জমি প্রস্তুত করেছিল। আরবরা গ্রীসের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা গ্রহণ ক'রে তাকে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছিলেন। আরবদের চিন্তাধারা স্পেনের মধ্য দিয়ে গিয়ে ইউরোপকে আঘাত করে। দার্শনিক আভিসিনাই প্রথম বিশ্ব ও বিশ্বের আভ্যন্তরীন যা' কিছু তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। আরব দার্শনিকগণ হাতেকলমে পরীক্ষা দ্বারা সত্য নির্ধারণের উপর জোর দিয়েছিলেন। নবম শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই গ্রীক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সবই আরবীতে অনূদিত হলো। আভেরোসের কথা পূর্বে বলা হয়েছে : আরব দার্শনিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ, মধ্যযুগে তিনিই আরোস্ততোলীয় চিন্তার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা বলে গণ্য ছিলেন। তিনি বলতেন : মানুষের মগজের মৃত্যু আছে, আত্মারও শেষ আছে : কিন্তু মুক্ত বুদ্ধির মৃত্যু নেই। অতএব মুক্তবুদ্ধির সাহায্যে মানুষ সৃষ্টির নাগাল পায়, অনাদিঅনন্তের স্পর্শলাভ করে। আভেরোসের যুক্তিবাদে আরব চিন্তাধারার মর্ম নিহিত রয়েছে, স্পেনের ভেতর দিয়ে তাঁর প্রভাব ইউরোপের চিন্তাধারায় বিস্তারিত হলো। রোজার বেকন ও এ্যালবার্টাস ম্যাগনাস ছিলেন মধ্যযুগের ইউরোপের চিন্তানায়ক : সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকও ছিলেন তাঁদের প্রায় সমপর্যায়ের লোক। তাঁরা ছিলেন আভেরোসের মন্ত্রশিষ্য। গোঁড়া খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় আভেরোসের মতবাদকে সব অধার্মিকতার মূল ব'লে

অভিশাপ দিলেন, কিন্তু এই মুক্ত বুদ্ধির বাণীই ষ্টোইকদের যুক্তিবাদ ও এপিকিউরানদের মুক্ত জীবনের বার্তার সঙ্গে মিশে রেনেসাঁর পথ প্রস্তুত করলে। রোজার বেকনই পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের প্রবর্তন করেন; বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদিকে সে সময় যাদুবিদ্যা ব'লে গণ্য করা হ'তো; সেহেতু বেকনের বিরুদ্ধে যাদু দেখাবার অভিযোগ আনা হয়েছিল। এ্যালবার্টাস ম্যাগনাস রাসায়নিক পরীক্ষাদি করতেন: অবশ্য সে বিদ্যা তখন অনেকটা আদিম পর্যায়ে ছিল। তা' ছাড়া তিনি উদ্ভিদ-বিদ্যারও অনুশীলন করেছিলেন এবং সে বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখেছিলেন। এ' জন্য তিনিও যাদুকর নামে অভিহিত হয়েছিলেন। অবশ্য দর্শনে ও ধর্ম-বিদ্যালোচনায়ও তাঁর স্থান খুব উচু ছিল। রেনেসাঁ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় দক্ষিণ ইতালীতে; কারণ, আরবদের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগ সে অঞ্চল দিয়েই রক্ষিত হচ্ছিল। সালার্নো ছিল বিজ্ঞানচর্চার এক শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। সারা ইউরোপের চিকিৎসাবিদ্যার্থী ছাত্রেরাও সেখানে যেতো। কারণ, হিপোক্রেটিস ও গ্যালেন গ্রীসে চিকিৎসাবিদ্যার যে জ্ঞান রেখে গিছলেন তা'ও তাঁদের আরব ছাত্রেরাই মার্জিত ও পরিবর্ধিত করেছিল। ইসলাম ধর্ম আরব-জগতে জ্ঞানচর্চায় যে ব্যাপক প্রেরণা সৃষ্টি করে, তারই ধারা বেয়ে সেখানে নূতন সভ্যতা গ'ড়ে ওঠে এবং তা' ইতালীতে স্বীকৃতি লাভ করে। আরব মনীষিগণই থেইলস্, পীথাগোরাস, ডেমোক্রিটস, হিপোক্রেটিস, ইউক্লিড, আকিমিডিস এবং প্রাচীন গ্রীসের অন্যান্য বৈজ্ঞানিক চিন্তাবীরদের জ্ঞানের ভাণ্ডার পুনরুদ্ধার করেন। আভিসেনা, আভেরোস প্রমুখ আরব পণ্ডিতেরা সে ভাণ্ডার থেকে আহৃত জ্ঞান সুবিন্যস্ত, সুসংবদ্ধ ও পরিবর্ধিত করেছিলেন। তারই সূত্র ধ'রে আল গাজালী বললেন: ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হ'লে জ্ঞান জ্ঞানই নয়, সে জ্ঞানেরও বুদ্ধিই একমাত্র কষ্টিপাথর। আর ছিলেন আবুবকর: তিনিই প্রথম বলেছিলেন যে সূর্য চারিদিকে ঘুরচে টলেমির এ' মত সত্য নয়—বলেছিলেন কোপার্নিকাসের আবিষ্কারের তিনশত বছর আগে। বিজ্ঞানচর্চার সূত্র ধ'রে ধর্মীয় চিন্তার উপরও আরবগণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। একেশ্বরবাদ থেকে বৈজ্ঞানিক সূত্র ধ'রে, সৃষ্টি যে নিজস্ব নিয়মেই চলচে এ মতে পৌছুতে বেশী দেরী হ'লোনা: ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে কল্পনাও শিথিল হলো; অতিপ্রাকৃতিক শক্তির আধিপত্য থেকে মানুষের মুক্তির সূচনা ঘট্‌লো।

এই চিন্তাধারা অবশ্য সারা ইউরোপেই বিস্তৃত হয়েছিল, শুধু ইতালীতে নয়। রোমান সাম্রাজ্যের পতন থেকে শুরু ক'রে নবম শতাব্দীতে সম্রাট শার্লামেনের

অভ্যুদয় পর্যন্ত ছিল ইউরোপের অন্ধকার যুগ। তারপর থেকেই ইউরোপ আবার তার সংস্কৃতির ধারা খুঁজে পায়: গোঁড়া ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে ওর বিরোধ উগ্র হয়ে উঠলো। স্কোটাস এরিজেনা বললেন যে জড়পদার্থ ও ঈশ্বর একই সঙ্গে রয়েচে: প্রকৃতি এবং মহাকালের অস্তিত্ব একই সঙ্গে চলেচে: তাদেরই মধ্য থেকে বুদ্ধিরও উদ্ভব হয়েচে। শাস্ত্রীয়, ধর্মীয় অনুশাসন এসেচে তার পরে এবং বুদ্ধিকেই অবলম্বন ক'রে। অতএব বুদ্ধিই অগ্রগণ্য: শাস্ত্রীয় অনুশাসন নয়।

প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে এরিজেনার দুই শিষ্য রসেলিনাস ও পিটার এ্যাবেলার্ড তাঁর মত প্রচার করেন। এ্যাবেলার্ড এ সম্বন্ধে যে বই লেখেন তা বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। রসোলিনাস বলেন যে খ্রীষ্টীয় ত্রিমূর্তি পরিকল্পনার সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। প্রাণ দিয়ে তাঁকে তাঁর মতের মূল্য দিতে হয়। এ্যাবেলার্ড ঐস্লামিক দেশ স্পেনে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। যে জ্ঞানতপস্বীরা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, তাঁরা প্যারীতে পড়াশুনো ক'রে এসেছিলেন। এহেন জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র আরও অনেক গ'ড়ে উঠলো। যে মুক্ত বুদ্ধিতে রেণেসাঁর উদ্ভব, তার প্রথম স্ফূরণ এ' সব কেন্দ্রে হয় বললে ভুল বলা হবে না। মানুষের বুদ্ধির মর্যাদা স্বীকৃতি পেলে।

অবিলম্বে কিন্তু এ' জ্ঞানচর্চা নিছক পাণ্ডিত্যের খেলাতে পরিণত হলো। কী ক'রে ইতালীতে এ' জ্ঞানানুসন্ধান নূতন প্রাণবাণী খুঁজে পেলো তা পূর্বে বলা হয়েচে। কিন্তু সে দেশেও পাড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথিগত জ্ঞানচর্চারই প্রাধান্য ছিল। ইতিমধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্মসংস্কার আত্মরক্ষার তাগিদে আরও কঠোর হ'লো—বৈরাগ্যবাদের সঙ্গে একার্থক হ'য়ে দাঁড়ালো। দুনিয়াটা দুঃখের জায়গা; জীবনের যা কিছু সব বর্জন করতে পারলে তবে ভগবানকে লাভ করা যাবে। এ হেন জীবন দর্শনে মানুষের মতো বাঁচবার প্রেরণা কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; থাকে শুধু মুনিঋষির মতো জীবনযাপনের আদর্শ, এবং যেহেতু সাধারণ মানুষের পক্ষে এহেন আদর্শে জীবনযাপন করা সম্ভব নয়, সেহেতু খ্রীষ্টীয় সমাজ মিথ্যায় ও কপটাচারে ভরে উঠলো। এ' ভাবে ইউরোপ দারুণ এক নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটে এসে ঠেক্‌লো।

এরই ফলে পুনরায় অভ্যুত্থান ঘটে মানবতাবাদের: বলা হয়, ভগবান মানুষকে নিজের প্রতিরূপ ক'রে সৃষ্টি করেচেন—খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রোক্ত এই বাণী যদি সত্য হয় তবে এই দেহকে কিছুতেই অপবিত্র বলা যেতে পারে না, এর কামনা-বাসনাও কখনও অপবিত্র নয়। মানুষ প্রকৃতিরই অংশ: কাজেই প্রকৃতি

আমাদেরে যা দিয়েচেন তা ভোগ করা পুণ্য, না করা পাপ। অতি-প্রাকৃতিক শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা ক'রে তার উপর নির্ভরশীল যে সুনীতি দুর্নীতি দাঁড় করানো হয়েছে তার স্থলে প্রকৃতির সঙ্গে সুসমঞ্জস নীতির প্রতিষ্ঠা করলে মানবতাবাদ। বেঁচে থাকার আনন্দ, বাঁচবার জন্যেই বাঁচা, জীবনকে সর্বদিকে ফুটিয়ে নিজের সুসমন্বিত ব্যক্তিত্ব গ'ড়ে তোলা, এই দুনিয়ায় যা কিছু হচ্চে তার সব কিছুতেই আনন্দ বা বেদনা বোধ করা—সার্বজনীন মানুষের এই আদর্শই আবার মানুষের চোখের সামনে, মনের সামনে ভেসে এলো। তার অনুষঙ্গরূপে এলো ক্যাথোলিক যাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। . প্রতিবাদ প্রচলিত খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের এই ধারণার বিরুদ্ধে যে মানুষ স্বভাবতই নীতিবর্জিত, তার মন অক্ষম। সে বিদ্রোহ এই ব'লে যে, মানুষের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মিক সম্পদ রয়েচে—তারই সাহায্যে তাকে এ জীবন ভোগ ও পূর্ণ করতে হবে : মৃত্যুর পর কী আছে বা নাই তা নিয়ে মাথা ঘামাবার এবং তা দ্বারা মানুষের ন্যায় অন্যায় নির্ধারিত করবার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

এই মতবাদ পেগেন অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্মবিরোধী পৌত্তলিক মতবাদের সমগোত্রীয় : প্রচলিত কোনো ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে এর মিল ছিলনা। প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার হ'তে এই মতবাদের সৃষ্টি : কোপার্নিকাসের সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বাবিষ্কারের মতোই বিরাট সে আবিষ্কার। এ জগৎ আর দুঃখের জগৎ বলে গণ্য রইলোনা, দুঃখকষ্টের ভেতর দিয়ে পরলোকে যাবার রাস্তা ক'রে দেওয়া ছাড়া এ জগতের আর কোনো সার্থকতা নেই—এ ধারণা বাতিল হ'লো। এ জগৎ স্বভাবজ আনন্দ ভোগ করার জায়গা, যশ, সৌন্দর্য ও দুঃসাহসিক কর্মকীর্তির স্থান—এ মত গৃহীত হ'লো। শিল্প, কবিতা, আনন্দের প্লাবনে ভেসে গেলো বহুশতাব্দীলালিত বৈরাগ্যবাদ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এক ধরণের যুক্তিবাদী চর্চা হচ্ছিল বটে : কিন্তু তারও মর্মকথা ছিল এই যে বিশ্বের রথচক্র একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মে চলেচে, মানুষ তার মধ্যে চাকার পাকিতে একটা বাধা স্বরূপ : আর কিছু নয়। রেনেসাঁ এই মতেরই বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্বেও এর মধ্যে পুরাতনে ফিরে যাবার কোনো কথা ছিলনা। প্রাচীন গ্রীসীয় সংস্কৃতিতে মানুষের নীতি জ্ঞানের ও বুদ্ধির যে স্বাধীনতা ছিল, মানুষকে ও তার মুক্ত

বুদ্ধিকে যে মর্যাদা দেওয়া হ'তো, তা' চাপা প'ড়ে গিয়েছিল ধর্মীয় অনুশাসনে, আচ্ছন্ন হয়েছিল পাণ্ডিত্যের বাগ-বিস্তারে—তাকে ফিরিয়ে এনেই হ'লো রেনেসাঁর উদ্ভব। তা' না আন্‌লে পর বিজ্ঞান বা দর্শন কিছুতেই কোনো অগ্রগতি আর সম্ভব হচ্ছিল না। ঐতিহাসিকদের মতে বিখ্যাত সনেটলেখক পেট্রার্ককে দিয়েই রেনেসাঁর যুগ শুরু হয়: দেখা দেয় নতুন যুগের মানুষ—সে মানুষ আত্ম-দর্শন করে, নিজের আদর্শ নিজেই বেছে নেয়, নিজের মনকে সে আদর্শোপযোগী ক'রে গ'ড়ে তোলে। মধ্যযুগের মানুষের জীবন ছিল শুধু মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি। রেনেসাঁর মানুষ নিজ ভাগ্যের ওঠাপড়া উপলব্ধি করলে, জীবনের বাধাবিঘ্নের হিসেব নিলে, প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করলো, জ্ঞানবিজ্ঞান যা' কিছু ছিল সব আয়ত্ত ক'রে নিলো, নিজেকে সবদিকে ফুটিয়ে তোলবার সংকল্পে ব্রতী হ'লো। তারপর ইউরোপের সংস্কৃতি ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত রেনেসাঁ থেকেই নিজের প্রেরণা ও পাথেয় সংগ্রহ ক'রেছিলো। এতদিন বিদ্যাচর্চা আবদ্ধ ছিল ধর্মযাজকদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্কুলে ও বিশিষ্ট মণ্ডলীসমূহের মধ্যে। রেনেসাঁ এনে দিল ব্যাপক জাগরণ, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ, মানুষের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ। রেনেসাঁতে মানবতাবাদের পুনরভ্যুদয় হ'লো। ব্যক্তির মর্য্যাদা ছিল প্রাচীন সফিষ্ট, এপিকিউরান, ষ্টোইক ও প্রথম পর্যায়ের খ্রীষ্টীয় চিন্তার অন্যতম অঙ্গ। রেনেসাঁতে ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব পুনরায় স্বীকৃতি পেলো। মানবতাবাদীগণ শুধু যে প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ফিরিয়ে আন্‌লেন তা' নয়—ধর্মীয় ঐতিহ্যকেও মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে বিচার করলেন। তাঁদেরই পক্ষ থেকে, পিকো ডেলা মিরাণ্ডোলা বলেছিলেন "ভগবান সৃষ্টি শেষ ক'রে মানুষকে অবাধ বিচরণ করতে দিলেন—বিশ্বের নিয়ম জানবার, সৌন্দর্য ভালোবাসবার, মহত্ত্ব বুঝ্‌বার পুরো স্বাধীনতা মানুষের রইলো। তিনি মানুষকে বললেন: তুমি স্বর্গেরও নও, মর্ত্যেরও নও: মর বা অমর কিছুই তুমি নও: নিজেকে গ'ড়ে তোলবার, নিজেকে অতিক্রম করবার পুরো ক্ষমতা তোমার রয়েচে। তুমি ইচ্ছা ক'রে পশুর স্তরে নেমে যেতে পারো—আবার উঠে দেবত্বে পৌছুতে পারো: স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা নিজেকে গ'ড়ে তোলবার সুযোগ শুধু তোমারই আছে। বিশ্বজীবনের অঙ্কুর তোমাতেই নিহিত রয়েচে।"

মানুষের সেই জয়গানের বুঝি তুলনা নেই। মানুষের জয় মানবতাবাদের জয়: মানুষের জয়ই মানবতাবাদ: আর কিছু নয়।

কেউ কেউ বলেচেন রেনেসাঁর উদ্ভব হয় বণিক শ্রেণী ও বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে: তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতীকরূপে। কিন্তু বাস্তব সত্যে এ' মতের সমর্থন মেলেনা। ইতালীর যে সব সহরে বন্দরে বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল, রেনেসাঁ সংস্কৃতিতে তাদের কোন প্রাধান্য ছিল না। বরং দক্ষিণ ইতালীর সামন্ত নৃপতিদেরে রেনেসাঁর পৃষ্টপোষকতা করতে দেখা গিয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপে যখন জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান হচ্চে এবং বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠচে, ইতালীতে তখনও সে সব কিছু হয়নি: সেখানে তখন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাই বিরাজ করছিল। একেকটা নগরকে কেন্দ্র ক'রে যে সব ছোটো ছোটো রাজ্য গ'ড়ে উঠলো তাদের নৃপতিরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা বাড়াবার জন্যে বিদ্বজ্জনের সমাদর ও সম্মান করতে লাগলেন। জাতীয় রাষ্ট্র থাকলে পর রাষ্ট্রাধিপত্য সংস্কৃতিতেও বিস্তৃত হ'তো: তা' না থাকাও ইতালীতে রেনেসাঁ আন্দোলনের উৎপত্তি ও প্রসারের সহায়ক হ'য়েছিল। রেনেসাঁ আন্দোলন ভাবধারার আন্দোলন: ভাবের শূন্যতার প্রতিক্রিয়াতে আপনা থেকেই তার উদ্ভব: সেখানেই তার স্বকীয়ত্ব, অপূর্বত্ব: অর্থনীতি, রাজনীতির সঙ্গে সে জড়িত নয়। ধর্মীয় বৈরাগ্যবাদে আহত হয়ে মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রাণের প্লাবনে ছড়িয়ে পড়লো: ইতিহাসে তারই নাম রেনেসাঁ। দ্বাদশ শতাব্দীতে লাতিন কবিতাতে এসেছিল তার পূর্বাভাষ: আনন্দোজ্জ্বল প্রাণের উচ্ছ্বাস। সেই প্রথম দেখা গেলো, কবি কর্তৃক বন্দনায় রাষ্ট্রনায়কও সেনাপতিগণ ধর্মীয় বীর ও সাধুদের স্থান নিয়েচে। রেনেসাঁ এলো প্রবল সৌন্দর্যানুরাগ ও জীবনের আনন্দ উপভোগের বাণী নিয়ে। ঐতিহাসিকদের মতে রেনেসাঁ ছিল বৈরাগ্যবাদের বিরুদ্ধে সৌন্দর্যানুভূতির অভিযান। সেজন্যই এমন অভিযোগও উঠেচে যে রেনেসাঁ মানবতাবাদের সুনীতি দুর্নীতি জ্ঞানের বালাই ছিলনা। আসলে নীতি ও সৌন্দর্যানুভূতির পারস্পরিক সম্বন্ধের যে সমস্যা প্রাচীনকাল থেকেই রয়েচে, রেনেসাঁ মানবতাবাদে তার নূতন যুগোপযোগী সমাধান প্রত্যক্ষ হ'লো। প্রাচীনকালে গ্রীসে প্লেটো, পেরিক্লিস, এপিকিউরাস ও ষ্টোইকেরা সে সমস্যার বিভিন্ন সমাধান বাৎলেছিলেন। মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতির বিধান ছিল এই যে বৈরাগ্য ও ইহলোকবিমুখতাই একমাত্র ধর্ম: জীবনের ভোগ সুখ থেকে যে যতো দূরে থাকতে পারে তারই ততো মুক্তিলাভের আশা থাকে। সাধারণ মানুষের পক্ষে এ ধরণের জীবনদর্শন অনুসরণ

করতে যাওয়াতে কপটাচার অনিবার্য, এবং বাস্তবেও তাই হয়েছিল। রেনেসাঁ আন্দোলন দেখিয়ে দিল,—শিল্পসৌন্দর্যানুভূতিতে জীবনের যে সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটে তা'তে নৈতিগত জীবনযাপনের প্রশ্নের সমাধান কিভাবে আপ্‌না থেকেই হয়ে যায়।

লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি ছিলেন রেনেসাঁর অন্যতম নায়ক,—শুধু তাই নয়, মানবেতিহাসের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরদের অন্যতম। তিনি লিখেছিলেন যে প্রকৃতি কিভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ করে সে নিয়ম ও পদ্ধতির সন্ধানই তিনি ক'রে আস্‌চেন। বস্তুত রেনেসাঁ রূপায়িত হলো বিশেষ করে শিল্পকলায়, এবং প্রকৃতিকে লক্ষ্য ও অনুশীলন ক'রে তার মধ্য থেকে সত্যনির্ধারণই ছিল শিল্পের লক্ষ্য। এই ক'রে মানুষ নিজেকে প্রকৃতির অঙ্গ ব'লে অনুভব করলে। এইভাবে সে যে সত্য উপলব্ধি করলে তাতে সে নূতন নৈতিক জ্ঞান লাভ করলো; অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা ক'রে তার উপর নির্ভরশীল যে নীতি তা' আর গ্রহণীয় থাকলোনা। রেনেসাঁর আগেকার যুগের শিল্পীগণের অধিকাংশই যাজক ছিলেন, কিন্তু সত্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরাও রক্তমাংসের মানুষকেই রূপ দিয়ে গেছেন। কবি দান্তের রচনায় অতিপ্রাকৃতিকতার অনেক নিদর্শন আছে, কিন্তু কবিপ্রিয়া বেয়াট্রিচ রক্তমাংসের মানুষ,—বৈরাগ্যবাদীরা যে মাটির পৃথিবীকে কান্নায় ভরা ব'লে অভিহিত করে গেছেন সে পৃথিবীরই মানবী। টিশিয়ান যে ম্যাডোনার ছবি এঁকে গেছেন গোঁড়া খ্রীষ্টীয় কল্পনার দেবী জননীর সাথে তার কোনো মিল নেই। লিওনার্ডো বলেছিলেন, শিল্পীকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে তার প্রতিটি গতিবিধির উদ্দেশ্য ও তার অন্তর্নিহিত ভাবাবেগ উপলব্ধি করতে হবে। রেনেসাঁ শিল্প এই প্রাকৃতিকত্ব থেকেই প্রেরণা সংগ্রহ করেছিল। এ' প্রাকৃতিকত্ব বৈরাগ্যবাদ ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত যে নীতিবাদ তার সম্পূর্ণ বিরোধী। "মানুষকে নিজ দেহ গ'ড়ে তুলতে হ'বে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো, মন ফুটিয়ে তুলতে হবে ফুলের মতো—এই ক'রে দেহমনে এমন সম্পূর্ণতা লাভ করতে হবে যা নীতিবিদদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হ'য়ে ওঠে।"—সংক্ষেপে এই হ'লো রেনেসাঁর জীবনদর্শন। এ' জীবন-দর্শনের পিছনে ধর্মীয় বা নৈতিক কোনো অবলম্বন ছিলনা; কাজেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল যে এতে মানুষের নীতিবোধে নৈরাজ্য আসবার সম্ভাবনা রয়েছে। আসলে এতে ছিল লৌকিক নীতি স্বতস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠবার ইংগিত। বৈজ্ঞানিক সত্যই সে নীতির ভিত্তি; কিন্তু তখনও সে

সত্য যথেষ্ট আবিষ্কৃত হয়নি। মধ্যযুগীয় বৈরাগ্যবাদ ও ইহজীবনের প্রতি অশ্রদ্ধা থেকে মুক্তির বাণী নিয়ে এলো রেনেসাঁ : তাতেই তার সামাজিক তাৎপর্য। জীবন পবিত্র, জীবন শ্রদ্ধেয়, জীবন আনন্দ—আপন গতিতে সে আপনার সত্য সৃষ্টি করছে। তাই লিওনার্ডো বলেছিলেন, প্রকৃতি নিয়মে নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু মানুষ সে নিয়ম আবিষ্কার করতে সক্ষম এবং তা' দিয়ে জীবনের উচ্চস্তরে তার মনের শাসন চলচে। এই ছিল রেনেসাঁর জীবননীতি।

প্রাচীন গ্রীক চিন্তাধারার সাক্ষাৎ উত্তরাধিকার, আরবদের বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী জ্ঞানের অবদান ও উগ্র জাতীয়তাবাদের অভাব—এ' তিন সাংস্কৃতিক সত্যের সংমিশ্রণে ইতালীতে রেনেসাঁর মানবতাবাদের স্ফুরণ হয়েছিল, এ' কথা পূর্বে বলা হয়েচে। মেকিয়াভেলীকে জাতীয়তার অগ্রদূত বলা হয় এবং তিনিও রেনেসাঁর সময়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন—, কিন্তু তিনিও ছিলেন মানবতাবাদী ও সার্বজনীন ভাবে উদ্দীপ্ত। মানবতাবাদ ও সার্বজনীনতা পরস্পর সম্বদ্ধ এবং এ' দুইই রেনেসাঁ সংস্কৃতির প্রাণ। কবি দান্তেকে জাতীয়তাবাদের কবি বলা হয় ; কিন্তু প্রাচীন কালের প্রকৃতি উপাসনা ছিল তাঁর প্রেরণার উৎস। তিনি বলেছিলেন : "সারা দুনিয়াই আমার দেশ।" পেট্রাক বলেছিলেন,—বিদ্বান লোক যেখানে থাকুন না কেন সেখানেই তাঁর ঘর : তাঁর কোনো নির্দিষ্ট দেশ নেই। রাজনীতি, দেশপ্রেম ইত্যাদির উর্ধে সার্বজনীনতায় মানুষের ব্যক্তি-সত্তার শান্তি ও স্বস্তিলাভ—রেনেসাঁ সংস্কৃতির এই ছিল লক্ষ্য। জ্ঞানবিজ্ঞান যে আহরণ করচে, প্রকৃতির নিয়ম যে মেনে চলেচে, সে যেখানে যায় সেখানেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে ; সব দেশের নাগরিক সে, ব্যক্তিগত ভাগ্যবিপর্যয় তাকে দমাতে পারে না—রেনেসাঁর মুখপাত্রদের দ্বারা এ' হেন মত বার বার ব্যক্ত হয়েচে। সেই সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিসত্তারও স্বাধীন ও সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেচে। ব্যক্তিমানব ও সার্বজনীনমানব এক সঙ্গে মিশেচে। দান্তে, পেট্রাক, লিওনার্ডো, মাইকেল এঞ্জেলো, বোকাসিও, র‍্যাফেল এবং আরও বহুজনার জীবনসাধনায় রেনেসাঁ মূর্ত হয়ে উঠলো। অতীত সংস্কৃতির সারসংগ্রহে, নব সংস্কৃতি গঠনে ভবিষ্যতের মহৎ সম্ভাবনার সৃষ্টি করলো। ইতালীতে তখন পোপের ক্ষমতা আভ্যন্তরীণ গলদে জীর্ণ হয়ে পড়েচে ; সংহত কোনো রাষ্ট্রক্ষমতা ছিলনা ; এমন কোনো অভিজাত বা ধনিক শ্রেণীও ছিলনা যা সামাজিক প্রাধান্যের দাবী করতে পারতো। মধ্যযুগে অভিজাত বা যাজক শ্রেণীরই প্রাধান্য ছিল : তথাকথিত মহৎবংশে জন্ম না হলে কেউ সমাজে পাত্তা পেতোনা।

রেনেসাঁ যুগের ইতালীতে ব্যক্তিগত গুণই মনুষ্যত্ব বিচারের একমাত্র নিরিখ হ'লো। মানুষের ব্যক্তিসত্তা স্ফুরণের সুযোগ পেলো এবং সমষ্টিসত্তার ভিত্তিরূপে গণ্য হলো: জীবনে ও সমাজে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী জাগিয়ে দিলে। বস্তুত ইতালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ তখন এমন ছিল যে ধর্মীয় চিন্তাতেও বস্তুবাদী জ্ঞান অনুপ্রবেশ করেছিল। রেনেসাঁ আন্দোলনের ইতিহাসে পোপ পঞ্চম নিকোলাসের প্রভাবকে আন্দোলনের সাফল্যের অন্যতম হেতুরূপে বর্ণনা করা হয়েচে। পোপ হবার আগেই তিনি গ্রীক ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে অর্ধজগৎ সন্ধান ক'রে প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের পুঁথি সংগ্রহ করা হয়। গ্রীক নাটকগুলো তিনি অনুবাদ করান—যদিও সে সব নাটকে অনেক ধর্মবিরোধী উক্তি ছিল। লৌকিক বিষয়াদিসম্পর্কিত পাঁচ হাজার প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হ'লো। নিকোলাস ইতিহাসে রেনেসাঁ-পোপ নামেই অভিহিত; তারপরে যিনি দ্বিতীয় পীয়াস নাম নিয়ে পোপ হলেন তিনি ছিলেন মানবতাবাদী ঐতিহাসিক। কপটাচার তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। নিজে পোপ হওয়া সত্ত্বেও তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের সমালোচনা করতেন—বল্‌তেন যে, ধর্মশাস্ত্রে যে সব অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ আছে সে সব মানা নাও যেতে পারে; তবু যে উচু নীতিজ্ঞান তার মধ্যে রয়েচে তার জন্যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণীয়। লোরেঞ্জো ভাল্লা ছিলেন তাঁর অধীনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত; অতীতে এক সময় তিনি পোপের রোষ হ'তে কোনক্রমে আত্মরক্ষা করেছিলেন: এখন তিনিই আবিষ্কার করেন যে, যে দলিলের জোরে রোমের বিশপ পাশ্চাত্য জগতের অধিপতি ব'লে গণ্য হচ্ছিলেন তা' ভুয়ো। পোপ দশম লিও শিল্পী র‍্যাফেলকে প্রাচীন রোমের দৃপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনবার ভার দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে পোপের প্রাসাদ গানে অভিনয়ে আনন্দে স্ফূর্তিতে মুখর থাক্‌তো। পগিও নামক একজন ছিলেন যাজক সম্প্রদায়ের দারুণ সমালোচক; তা সত্ত্বেও তিনি অর্ধ শতাব্দী ধ'রে পোপের আনুকূল্য ভোগ করেছিলেন। এম্‌নি ক'রে রেনেসাঁর আলো সমসাময়িক ইতালীয় সমাজজীবনের অচলায়তন ভেদ করেছিল। যুক্তিবাদী মানুষ যখন দেখ্‌লে চারদিকে অবিচার ও দুঃখের অন্তহীন দৃষ্টান্ত, তখন, বিশ্বজগৎ ভগবানের ন্যায় শাসনে চলচে—এই গোঁড়া খ্রীষ্টীয় মতবাদে আর বিশ্বাস রাখ্‌তে পারলে না। দান্তে, পোগিও এঁরা ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন; এক্ষণে নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়লেন। আর কেউ কেউ অদৃষ্টবাদী হলেন,—এমন কি জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস করতে লাগ্‌লেন। কিন্তু পেট্রার্ক প্রভৃতি সত্যিকার

মানবতাবাদীরা ছিলেন এ সবের তীব্র বিরোধী : তাঁরা বললেন, মানুষের ইচ্ছা-শক্তির উপর কিছু নেই। প্রাকৃতিকত্বকে তাঁরা আশ্রয় করলেন, ধর্মকে নবরূপ দিলেন : বললেন যে এই জীবনে মহত্ব ও সম্মান লাভ করবার জন্যেই পুণ্যের অনুশীলন করতে হবে এবং অমরত্বেরও সেই একই পথ। মানুষ নিজ সাধনায়, নিজ সৃষ্টিতে অমরত্ব লাভ করবে: মানবসংস্কৃতির ধারায় নিজের নিশানা রেখে যাবে। ঐতিহাসিক কীর্তি, ঐতিহাসিক মহত্বলাভের এইই মানবতাবাদী আদর্শ।

প্রাচীন গ্রীসের বিজ্ঞানালোচনার ধারাও আরবদের মারফৎ স্পেনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম ইউরোপে পৌঁছোছল। ইতালীতে তার প্রসার যে মানুষের আত্মিক-স্বাধীনতাসাধনার সহায়ক হয়েছিল, সে কথা পূর্বে বলা হয়েচে। রেনেসাঁ আন্দোলন প্রধানত সাহিত্য ও শিল্পকলার পুনর্জাগরণের আন্দোলন ব'লে গণ্য হয়ে থাকে : কিন্তু তাতে বিজ্ঞানচর্চার স্থানও নগণ্য ছিল না। কবি দান্তে নিজে প্রবল আগ্রহ নিয়ে বিজ্ঞানের অনুশীলন করতেন। পেট্রাক ভূগোলের অনুশীলন করতেন এবং প্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে বই লিখেছিলেন। ফ্লোরেন্সের আকাদেমীতে উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীতত্ত্বের চর্চা হ'তো। গ্রীসের থিওফ্রেটিস দু'হাজার বছর আগে উদ্ভিদবিদ্যা যে স্তরে রেখে গিছলেন, আরিস্ততোল প্রাণী জগতের যে কাহিনী লেখা শুরু করেছিলেন, তারই কাজ এত দিনে আবার নতুন ক'রে শুরু হ'লো। স্যালার্ণো ও বলোগ্নাতে ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুশীলনের প্রধান কেন্দ্র। রেনেসাঁ যুগের সব শিল্পীর ও ভাস্করেরই প্রাণীদেহ সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞান ছিল। শরীরতত্ত্ব, শবব্যবচ্ছেদবিদ্যা ও দৃষ্টিসম্পর্কিত আলোকবিজ্ঞানের বিশেষ অনুশীলন হয়েছিল এবং সে সব বিষয়ে একাধিক সারগর্ভ বইও লেখা হয়েছিল। স্বয়ং লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি মানুষের দেহ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন করেছিলেন। একেক সময়ে একই সঙ্গে দশটি শব ব্যবচ্ছেদ ক'রে তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল। তাঁর সমসাময়িক ছিলেন টস্কানেলী ও প্যাসিওলী : এঁরা তিনজন ছিলেন গণিতবিদ্যা, প্রাকৃতবিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। শুধু তাঁরা তিনজনই নন, বহু সর্বতোমুখী প্রতিভাধরের আবির্ভাব হয়েছিল সে যুগে। একাধারে চিত্রকর, স্থপতি, ভাস্কর, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক,—এমন লোক তখন বিরল ছিল না। র্যাফেল একাধারে শিল্পী ও স্থপতি ছিলেন : মাইকেল এঞ্জেলো ফ্লোরেন্সের দুর্গপ্রাকার নির্মাণ করেছিলেন। প্যারাসেলসাস ও ভ্যাসেলিয়াস মানুষের দেহের গঠন সম্বন্ধে জ্ঞানে ও চিকিৎসাবিদ্যায় যুগান্তকারী

পরিবর্তন আনলেন। প্রাকৃতবিদ্যা অনুশীলনের জন্য নেপল্‌সে এক এ্যাকাডেমী স্থাপিত হ'লো।

কিন্তু লিওনার্ডোই ছিলেন রেনেসাঁর শ্রেষ্ঠ রূপকার: চিন্তাজগতে তিনি আরিস্ততোলের এবং প্রাকৃতবিজ্ঞানে আর্কিমিডিসের সমতুল্য ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে শিল্পী, ভাস্কর, বাস্তুকার, স্থপতি, পদার্থবিজ্ঞানী, জীববিদ্যা-বিশেষজ্ঞ ও দার্শনিক, এবং প্রত্যেক বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। মানুষের ইতিহাসে এহেন প্রতিভার সমতুল আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ। তিনি বলেছিলেন, "প্রকৃতির আলোকে সব কিছু দেখতে হবে: ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাদ্বারা বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিতে হবে। আত্মাও এই মানবিক অস্তিত্বেরই অংশ: তা' ছাড়া আর কিছু যদি সে হয় তবে সেকথা আমি জানিনে; ধর্মযাজকগণ তা' ভালো জানেন।" বহুশতাব্দীব্যাপী অন্ধকারশেষে রেনেসাঁ আন্দোলনে মানুষের আত্মিক স্বাধীনতার সংগ্রাম সত্যসন্ধানকে পুনরায় অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেলো। প্রকৃতি তার আপন নিয়মে চলচে: তার জ্ঞান নিয়ে মানুষ নিজ ভাগ্য জয় করবার পথে অগ্রসর হলো: সে জানলে যে, নিজের আত্মিক স্বাধীনতালাভের ও দুনিয়াকে নতুন করে গড়বার মতো বৈপ্লবিক শক্তির সে অধিকারী। আধুনিক সভ্যতার পত্তন হলো, মানুষের কর্মোদ্যম বিপুল প্রসার লাভ করলো। ব্যক্তি-মানুষও নিজেকে ফিরে পেলো।

সেই ব্যক্তিমানুষ একাকী মানুষ: সেই ব্যক্তিমানুষ অনন্তের আকাঙ্ক্ষী মানুষ। তারই কামনা ফুটে উঠেচে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির 'মোনালিসা' নামক অবিস্মরণীয় চিত্রে; 'মোনালিসা'র দুর্বোধ্য, অপ্রতিরোধ্য, দুঃসহ হাসিতে। যেন মানুষের সহস্র সহস্র বৎসরের ব্যাকুলতা সে হাসির অভিমুখে উন্মুখ: যেন সে হাসিতে সে ব্যাকুলতার অন্তহীন অথচ ধরাছোঁওয়ায় অলভ্য, অধর সান্ত্বনা।

এই পৃথিবীরই সে ব্যাকুলতা, মানব-মানবীর ব্যাকুলতা। যা কিছু বেঁচে আছে, যা কিছু গতিবান তারই কেন্দ্র স্থলে থাকা, যেখানে মানুষের প্রাণশক্তির বলিষ্ঠতম লীলা চলচে সেখানে দেহমন চঞ্চল ক'রে রাখা—এই তো জীবনের সত্য উপলব্ধি, একেই বলে পূর্ণতা। অভ্যাসের ক্রীতদাস না হওয়া, সংস্কারকে কিছুতে কাছে এগোতে না দেওয়া, চিরচঞ্চল প্রাণের লীলাতে এগিয়ে যাওয়া,—এই তো জীবন, এই তো মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম, এই জীবনের নবজাগরণ: এইই রেনেসাঁ।

রিফর্মেশন ও প্রতিক্রিয়া

রেণেসাঁর বিরাট উদার উপলব্ধি সমসাময়িক বিদ্বান শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এ'কথা বলাই বাহুল্য। বিরাট জনসাধারণের মধ্যে এ' উপলব্ধির আশু প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল না। তারা ছিল খ্রীষ্টীয় মতবাদে আশ্রিত, ইহলোকে পরলোকে তারই সান্ত্বনার ধারায় আপ্লুত। তাদেরে ভিত্তি ক'রে মনুষ্যকেন্দ্রিক রেনেসাঁ দর্শনের উপর হামলা আসতে দেরী হলোনা। রেণেসাঁর জন্মস্থান ও লীলাভূমি খাস ইতালীতেই শেষের দিকে আক্রমণ এলো: গিরোলামো স্যাভোনা-রোলা ছিলেন তার নেতা। তিনি নৃপতিদের পাপ ও অনাচারের দিকে জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং পূর্বেকার ধর্মযাজকদের সরল জীবন-যাপনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে ভগবানাশ্রিত জীবনের আহ্বান জানালেন। এই ভাবে তিনি নিজের শহর ফ্লোরেন্সে ধর্মীয় রাষ্ট্র স্থাপন করলেন, রেনেসাঁবাদকে নাস্তিকতা ও দুর্নীতি ব'লে গালি দিলেন, বিজ্ঞানালোচনাও ক্ষতিজনক ব'লে ঘোষণা করলেন। স্পেনের রাজারাণী ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলার পৃষ্ঠপোষকতায় রেনেসাঁর বিরুদ্ধে এক আন্দোলন শুরু হলো: তাকে কাউন্টার-রিফর্মেশন বা পাল্টা রিফর্মেশন বলা হ'য়ে থাকে। এ' নাম হবার কারণ বোধ হয় এই ছিল যে, জার্মানী থেকে যে রিফর্মেশন আন্দোলন শুরু হয় তার উৎপত্তি ও প্রেরণা ছিল প্রগতিমূলক: রেনেসাঁর ভাবধারাই ছড়িয়ে গিয়ে তার জমি প্রস্তুত করেছিল। পরে অবশ্য তা রেনেসাঁর ভাবধারার বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ালো। অপর পক্ষে রেনেসাঁযুগের ইতালীতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতি-জ্ঞান যে স্বাধীনতা লাভ করেছিলো, পাল্টা রিফর্মেশন ছিল তারই বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিযান।

রিফর্মেশনের উদ্ভব হয় জার্মানীতে: পোপের বিরুদ্ধে সম্রাট পঞ্চম চার্লসের বিদ্রোহ উপলক্ষ ক'রে। পোপ তখন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি; কিন্তু জার্মান রাজপুরুষগণ ছিলেন পার্থিব ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষী। অন্যদিকে জার্মানীর যাজক সম্প্রদায় এসেছিল ইতালী হ'তে, এবং রাষ্ট্রের ভেতরে নিজেদের এক রাষ্ট্র গঠন ক'রে স্বয়ংশাসক হ'তে চেয়েছিল। কিন্তু মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে রিফ-র্মেশনের সূচনা হয় ধর্মীয় বিতর্ক উপলক্ষ ক'রে এবং সে বিতর্কের মূল সুদূরাতীতে নিহিত ছিল। বহুযুগ পূর্বে সাধু আগষ্টাইন বলেছিলেন, যীশুর শিষ্যগণ কর্তৃক

লিখিত সুসমাচারের মধ্যেই মুক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে। আচারবিচার গৌণ। পরবর্তীকালে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-নায়কগণ আগষ্টাইনের মতের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ না ক'রেও ধর্মীয় আচার-বিচারের উপর জোর দিতে লাগ্‌লেন। ক্রমে ক্রমে এমন হ'লো যে বিরোধীদেরে তাঁরা ধর্মচ্যুত ব'লে আখ্যা দিলেন। জন উইক্লিফ ও জন হাস্‌ নামক দু'জন ছিলেন এই বিরোধীদের নেতা।

এঁদেরই অনুসৃত ধারা বেয়ে ঘট্‌ল লুথারের বিদ্রোহ : তার রাজনৈতিক তথা জাতীয়তাবাদী পটভূমি পূর্বেই উল্লেখ করেচি। ধর্মকে অস্বীকার করলে ধর্মযাজকদের প্রাধান্যও অস্বীকার করতে হয় এবং লুথারকে তাই করতে হয়েছিল। কিন্তু এই ভাববিদ্রোহের পিছনে ছিল রেনেসাঁর চিন্তাধারা—রটারডম নামক নগরীর অধিবাসী ইরেসমাস ছিলেন জার্মানীতে সে চিন্তাধারার প্রবর্তক। বস্তুত পশ্চিম ইউরোপে রেনেসাঁমানবতাবাদের প্রসারে ইরেসমাসের স্থান ছিল অতি উচ্চে। বিপুল বিদ্যার ও প্রখর বুদ্ধির অধিকারী ইরেসমাস রীতিবদ্ধ কোনো দার্শনিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করে যাননি ; কিন্তু তিনি মানবতাবাদ শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে ধর্ম মানবতাবাদকে আয়ত্ত ক'রে নিয়ে আত্মরক্ষা করবে। তাঁর আশঙ্কা ছিল এই যে ধর্ম যদি মানবতাবাদী না হয় তবে শিক্ষিত সমাজ তা থেকে দূরে চলে যাবে। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিলেন পরস্পর সহনশীল হ'তে, কোনো কারণেই গোড়ামির প্রশ্রয় না দিতে। হিংসার সাহায্যে কোনো ভাবধারাকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে দুঃখ ও অশান্তিই সার হবে। মানুষের চিন্তার উপর জুলুম করলে সারা মানবজাতির মনের স্বাধীনতাকে আঘাত করা হয়। মানব সমাজে যারা শোভন সমন্বয় আনতে চায় তারা এমন কাজ কখনো করবেনা। কাজেই প্রকৃত মানবতাবাদী কখনো কোনো বিশেষ মতবাদ বা দলের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে দেবেনা : কারণ, চিন্তার ও কর্মের স্বাধীনতা ভিন্ন ন্যায়নির্ধারণ হতে পারেনা এবং সে স্বাধীনতা তার বজায় রাখা চাই। সে সর্বদা ঐক্যসাধনাই করবে : মতভেদ ও কলহের প্রশ্রয় দেওয়া তার কর্তব্য নয়। ইরেসমাসের মতে প্রতিটি মত বা ধারণারই অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে : কোনো একটা বিশেষ মত ঠিক আর সব বেঠিক—এমন দাবী স্বীকার করা চলেনা। সমাজের সর্বস্তরে কীরূপ নির্বুদ্ধিতা বর্তমান ইরেসমাস নিজে তা' প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সে সম্বন্ধে হাস্যরসাত্মক বইও লিখেছিলেন। কোনো ভাবধারণারই অস্তিত্বের অধিকার তিনি অস্বীকার করতেন না—যদি ও যতক্ষণ না তা' জোর করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চাইত। জগতে যে এত কিছু

পরস্পর বিপরীতধর্মী ব্যাপার রয়েচে মানবতাবাদীর তাতে কোনো ভয় ; নেই বরং তাতে যে বৈচিত্র্যের প্রকাশ তাতে সে আনন্দোৎফুল্ল। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবিধান তার একমাত্র লক্ষ্য : এমন কি, যেখানে ঐক্য আপাতত অসম্ভব মনে হয় সেখানেই পরস্পরবিরোধী সত্তার মধ্যে মানবিক কতটুকু কী আছে দুঃসাধ্য প্রয়াসে তা' উদ্ঘাটন করে দেখার জরুরৎ তার রয়েচে। এর চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন ইরেসমাস নিজে : তিনি চেয়েছিলেন সামঞ্জস্যবিধান করতে খৃষ্টধর্ম ও প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে—স্বাধীন চিন্তা ও ধর্মশাস্ত্রে, রেনেসাঁ ও রিফর্মেশনে ; অথচ আপাতদৃষ্টিতে এদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা অসম্ভব ব'লেই বোধ হয়। সুদূর ভবিষ্যতে কোনো সময়ে মানুষ সবরকম বৈষম্য ও অনৈক্য পেরিয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, এই ছিল তাঁর আশা। এই মানবতাবাদীর আশা : মানুষকে সে বিশ্বাস করে, আর ধর্মবাদী নির্ভর করে ভগবানের উপর। এই দুইয়ের মধ্যেও ঐক্যবিধান করতে চেয়েছিলেন ইরেসমাস ও তাঁর মানবতাবাদ।

মাত্র তিনখানা বই লিখেছিলেন ইরেসমাস্ : সমসাময়িক চিন্তাজগতে বই তিনখানা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করলে। অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন ইরেসমাস : রাজসম্রাটেরা তাঁর দর্শন পাবার জন্যে ব্যগ্র ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাঁর পদধূলি পেলে নিজেদেরে কৃতার্থ মনে করতো, মূল্যবান নজরানায় তাঁর গৃহ ভরে' উঠতো। ইরেসমাস যে মানবতাবাদ প্রচার করলেন তা' সমর্থন করতে গিয়ে ইংলণ্ডের স্যার টমাস মোর প্রমুখ কেউ কেউ ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ হারালেন ; অথচ ইরেসমাস বৈপ্লবিক কিছু করতে চাননি ; তাঁর মত ছিল এই যে মানবতাবাদে শুধু সমঝোতারই স্থান আছে, বিপ্লবের স্থান নেই : এমন কি তিনি বা মনীষী মন্টেইন এবং অন্যান্য যাঁরা তাঁর ভাবের ভাবুক ছিলেন তাঁরা জগতের কার্যকারণ সম্বন্ধে এমন কোনো নির্দিষ্ট ধারণাও প্রচার করেননি—যাকে খ্রীষ্টীয় মতবাদোক্ত অতিপ্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়াতে বিশ্বাসের বিরোধী বলা যেতে পারে। অপরকে শিক্ষাদানই ছিল তাঁদের মানবতাবাদ প্রচারের একমাত্র উপায়। কিন্তু এ' শিক্ষা শুধু তাঁদেরেই দেওয়া যেতে পারতো যাঁরা শিক্ষিত বলে' অভিহিত, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে মোটামুটি উদ্বুদ্ধ। এর ফল দাঁড়ালো এই যে সাধারণ মানুষ এ' শিক্ষার বাইরে প'ড়ে রইলো—অবজ্ঞাত, অবহেলিত হ'লো। মানবতাবাদের উপর এ' পরিস্থিতির বিপরীত ফল হ'লো এই যে, জনজীবন থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে না পেরে তা' বাস্তবে জোরদার হ'তে পারলোনা, শুধু আদর্শবাদীর স্বপ্ন হ'য়ে রইলো।

এই অবস্থায়ই মার্টিন লুথারের নেতৃত্বাধীন রিফর্মেশনের সঙ্গে ইরেসমাসের সংঘর্ষ বেধে গেলো। ইরেসমাস চেয়েছিলেন রিফর্মেশন শুধু পোপের কেন্দ্রীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পর্যবসিত হবে না—ব্যক্তিমানুষকে তার পূর্ণ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবে। সে জন্যে তিনি মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতার উপর জোর দিয়েছিলেন। ধর্মযাজকগণ কিন্তু মানুষকে এতটা স্বাধীনতা দিতে রাজী ছিলেন না : মানুষ আদিতে পাপী, তাকে আগে হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং সেহেতু সে ঈশ্বরের—তথা ধর্মনায়কদের অধীন, এই ছিল তাঁদের মত। মার্টিন লুথার প্রকাশ্যেই ইরেসমাসের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন—ইরেসমাস যে শান্তি ও প্রেমের বাণী প্রচার করেছিলেন তা'ও তিনি নস্যাৎ ক'রে দিলেন, জানালেন যে ঈশ্বরের প্রভুত্ব বজায় রাখতে যদি তরবারি প্রয়োগ করতে হয় তবে তাই করতে হবে। কার্যত তাঁর এ' মত জার্মানির রাজবংশসমূহের প্রতি উগ্র সমর্থনে আত্মপ্রকাশ করলে। সে সময়ে সেখানে যে কৃষকবিদ্রোহ হয়েছিল তিনি তার বিরোধিতা করলেন—এমনকি, দম্ভভরে দাবী করলেন যে, কৃষকদেরে যে নির্মম হত্যা ও নিপীড়ন দ্বারা দাবিয়ে দেওয়া হয়েচে তা' তারই উস্কানিতে হয়েচে। বলা বাহুল্য, এর পর আর রিফর্মেশনের সঙ্গে ইরেসমাসের কোনো সম্পর্ক রাখা সম্ভব রইলো না। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি নিরাশ ও ক্ষুব্ধ হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। তারপর আর রিফর্মেশনে মানবতাবাদের দ্যোতক কিছু রইলোনা। এ'কথা পূর্বেই বলেচি যে মিগুয়েল সার্ভিটাসের স্বাধীন মতবাদের দরুণ ক্যালভিন তাঁর প্রাণহরণ করেন। সিবাষ্টিয়ান ক্যাষ্টিলিও এর প্রতিবাদে পুস্তিকা লেখাতে তাঁরও লাঞ্ছনা, অপমান ও দুঃখের অবধি রইলোনা। আরও অনেকের তেমনি দুর্গতি ঘটলো : অবশেষে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে গিওডানো ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারাতে রিফর্মেশন যুগের শেষ পর্যায়ের যাজকদের গোঁড়ামি ও পরমতাসহিষ্ণুতা চূড়ান্তরূপে প্রকাশ পেলো। ব্রুনোর অপরাধ ছিল এই যে তিনি কোপার্ণিকাসের মতবাদ সমর্থন করেছিলেন আর বলেছিলেন যে স্থান অনন্ত এবং তার মধ্যে রয়েচে আপন আলোকে প্রজ্বলিত অসংখ্য গ্রহতারকা। বলা বাহুল্য, আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যায় এ'মত সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়েচে। তিনি আরও বলেছিলেন যে সৃষ্টির আকার বিশ্বাত্মা দ্বারা নিরূপিত হয় বটে, কিন্তু তার মধ্যে যে বস্তু রয়েচে তা' স্বয়ংক্রিয়। এই মতে আপাতধর্মবিরোধী কিছু ছিল না : বড়ো জোর বলা হ'য়েছিল যে ঈশ্বর সর্বঘটে বিরাজমান : সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব তা'র নেই ; স্বয়ংক্রিয়তা দ্বারাই সৃষ্টি ঈশ্বরকে আপনাতে ব্যপ্ত ক'রে রেখেচে। কিন্তু এই যে

স্বয়ংগতিশীল পৃথিবী, প্রকৃতি ও স্বয়ংক্রিয় বস্তুর কথা তিনি বললেন, ধর্মীয় শক্তির একচ্ছত্র প্রভুত্ববাদীদের তা' সহ্য হলোনা। তার উপর আবার তিনি ধর্মধ্বজীদের কপটাচার উদ্‌ঘাটন ক'রে দেখালেন।—'পশুর জয়' নামে বই লিখে দেখালেন যে ধর্মীয় গোঁড়ামিতে নীতি বা দৃঢ় বিশ্বাস কোনো কিছুরই বালাই নেই। এর ফল যা' হবার হ'লো। তিনি যে মঠে থেকে জ্ঞানচর্চা করতেন তা তো তাঁকে ছাড়তে হলোই—এমন কি পোপের রোষ থেকে বাচবার জন্যে ইতালীও ছাড়তে হলো। কিন্তু দেশের বাইরে গিয়েও তিনি নিস্তার পেলেন না। জেনেভা, প্যারী, ইংলণ্ড, জার্মানি সব জায়গা থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি স্থির করলেন যে ভেনিসে ফিরে যাবেন এবং নিজের দেশের গোঁড়া ধর্মধ্বজীদের মোকাবিলা করবেন। সেখানে তিনি ধর্মীয় বিচারালয়ের হাতে পড়লেন। আট বৎসর কারাদণ্ডের পর তাঁকে এই শাস্তি দেওয়া হ'লো যে যতটা সম্ভব মোলায়েম-ভাবে, রক্তপাতব্যতীত তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হবে। কার্যত এর অর্থ হ'লো পুড়িয়ে মারা।

ব্রুনোর বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক অবদান অবশ্য ব্যর্থ হয়নি। নিজে তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন না অথচ বিজ্ঞান থেকে যে ভূয়োদর্শন সঞ্চয় করে ছিলেন তাই জ্ঞানানুসন্ধিৎসুদের পথের পাথেয় হ'য়ে আছে। জ্ঞানের জয়যাত্রায় ব্রুনো মহান পথিকৃৎ: আজকের যুগের মানুষের ভাবতে অবাক লাগে যে তিনি ও তাঁর মতো অনেকে শুধু যা' সত্য ব'লে বুঝেছিলেন তা' বলেছিলেন ব'লে সমসাময়িক রাষ্ট্র ও সমাজের হাতে প্রাণ হারান। অবাক লাগে আরও এ' জন্যে যে তাঁরা যে সত্য প্রচার করেছিলেন বর্তমানে তা' একান্ত সহজ, মামুলি সত্য ব'লে গণ্য হয়েচে। এতেই বোঝা যাবে সত্যাবিষ্কারের জন্য, অতিপ্রাকৃতিকত্বে বিশ্বাস থেকে মুক্তিলাভের জন্যে কী দারুণ মূল্যই না মানুষকে দিতে হয়েচে। অবশ্য আজও যে দিতে হচ্চে না তা' নয়। তবে সত্যকে জয়ী করার জন্য আগে যাঁরা প্রাণদান ক'রে গেছেন তাঁদেরই আত্মত্যাগের ফলে সত্য এখন অপেক্ষাকৃত সহজে স্বীকৃতি পাচ্চে, বাঁধাধরা গতানুগতিক অনুশাসন আর তার পথ রোধ ক'রে দাঁড়াতে সাহস পাচ্চেনা। শুধু বিশ্বাস অবলম্বন ক'রে যে সত্য দাঁড়িয়ে আছে সে তার নিজের জগতে নিজেকে গুটিয়ে রয়েচে: মুক্ত বুদ্ধিকে বাধা দেবার ভরসা তার নেই। কিন্তু মানবজাতি যে এ' স্তরে এসে পৌছুলো সত্যসাধনার সে কী দীর্ঘ, বিচিত্র ও সবেদন ইতিহাস। বিশ্বের ইতিহাসে সে ইতিহাস মানবতাবাদের চিরভাস্বর স্বাক্ষর রেখে গিয়েচে, মানুষকে মুক্ত বুদ্ধির অঙ্গনে দাঁড় করিয়ে দিয়েচে।

মানুষের জ্ঞানযাত্রার রথকে রিফর্মেশন যতটা এগিয়ে নিয়ে গেলো, প্রত্যক্ষ রথীরা সে রথচক্র ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেও আর যেন রুখতে পারলেনা : কারণ, ততক্ষণে মানুষ নিজের রথ নিজেই চালাতে শিখে গেছে। কোপার্ণিকাসের পর এলেন প্যারাসেলসাস্ ; কোপার্ণিকাসেরও অর্ধ শতাব্দী পূর্বে নিকোলাস কুসেনাস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে পৃথিবী তার নিজের কক্ষে পরিভ্রমণ করচে। টাইকো ব্রহী জ্যোতির্বিদ্যাকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেলেন। গ্যালিলিও ও কেপলার এই সময়টাতেই তাঁদের যুগান্তকারী আবিষ্কারের সাধনা করছিলেন। মাইক্রসকোপ আবিষ্কার, বিদ্যুতের ক্রিয়া ও পৃথিবীর চুম্বকাকর্ষণ শক্তির উদ্‌ঘাটনও এ' সময়েই হ'লো। আর্কিমিডিসের, লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির ও অন্য কারু কারু গগনস্পর্শী কীর্ত্তি দেখে মানুষ বুঝলো যে সেও অসীম শক্তির অধিকারী, সেও প্রকৃতিকে জয় করার শক্তি রাখে এবং জগতকে নিজের ইচ্ছানুসারে গড়তে পারে। রিফর্মেশন পরে যেরূপই নিক্‌না কেন—খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকেরা যে ভাবতো বিশ্বসংস্থা একেবারে তাদের হাতের মুঠোয় রয়েচে, সে ধারণা ভেঙ্গে চুরে ফেললে। মানুষের মনের উপর রিফর্মেশনের আত্মভ্রষ্টতার ফল এই হ'লো যে তারা বুঝলো যে ধর্মীয় বিধানের কোনো সংস্কার চলেনাঃ তাকে আশ্রয় ক'রে যে কায়েমী স্বার্থ গড়ে' উঠেচে তা'কে অগ্রাহ্য ক'রেই অগ্রসর হ'তে হ'বে। তা'র উপর ধর্মনায়কদের হাত থেকে পার্থিব শক্তি যে ভাবে খসে গেলো তাতে লোকের চোখ খুলে দিলে। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্র রূপ নিলে : শুধু তাই নয়, যে সব ধর্মীয় বিধান ছিল, তাদের বদলে রাষ্ট্রীয় বিধান প্রচলিত হলো। পোপ ও ধর্মযাজকগণ বুঝেছিলেন যে রিফর্মেশনে মানুষের যে অভিজ্ঞতা হ'লো তার ফলে তাদের মুক্তির আকাঙ্খা আরও প্রবল হবে, মানবতাবাদ তাকে পুনরায় গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে। বিশেষ ক'রে শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে মানবতাবাদের প্রভাব আগেই বিস্তৃত হয়েছিল ; ইরেসমাসকে শতাব্দীর শিক্ষাগুরু বলা হ'তো। শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে ধর্মীয় আওতায় ফিরিয়ে আনবার আশায় ইগনেশিয়াস লয়োলা জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করলেন : নূতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ক'রে মানবতাবাদী শিক্ষাধারাকে রোধ করা হলো এ' সম্প্রদায়ের কাজ। কিন্তু ইগনেশিয়াস লয়োলা নিজে ছিলেন মহাজ্ঞানী লোক : তিনি বুঝেছিলেন যে যুগের হাওয়ার বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু করা যাবেনা—আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানকে আয়ত্ত করে নিয়েই যদি আবার অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তিনি তাঁর সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুলকলেজ সমূহে শাস্ত্রীয় আলোচনার

সাথে সাথে বিজ্ঞানচর্চারও ব্যবস্থা করে দিলেন। তার ফল হ'লো এই যে তিনি যে মতলব করেছিলেন তাঁর দেওয়া শিক্ষা তাকে অতিক্রম ক'রে গেলো। জেসুইট পাদ্রীদের দেওয়া শিক্ষার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে গেলো; বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্যে তাঁদের ডাক পড়লো। মানবতাবাদ প্রতিরোধ করবার জন্যে যে শিক্ষাযোজনা হ'লো তার ফল যে হলো জ্ঞানের আলোর অধিকতর বিস্তার—এতেই প্রমাণিত হলো যে, রেনেসাঁর প্রেরণা সারা ইউরোপে ছড়িয়ে গেছে: এমনই তার প্রাণশক্তি যে যা' তাকে প্রতিরোধ করতে এলো তাকেও সে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো।

তাই রিফর্মেশনের ফলে দেখা গেলো—ধর্মীয় বিধানের প্রাধান্য দূর হয়ে নৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েচে: সে প্রাধান্যের ভিত্তি মানুষেরই নীতি-জ্ঞান ও জ্ঞানবুদ্ধি: ধর্মযাজকদের ফতোয়া বা কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তিব কল্পনা সে ভিত্তি নয়। ইরেসমাস যে শান্তি ও সমঝোতাব বাণী প্রচাব কবলেন তার বৈপ্লবিক শক্তি ছিলনা; কিন্তু বিশিষ্ট মনীষীদেব মতে তার ধাবা মানব সভ্যতাতে অব্যাহত রয়েচে এবং এ' যুগেব মহাত্মা গান্ধীও তারই উত্তরাধিকারী। এই শান্তি ও সমঝোতার বাণী নির্জীবের বাণী নয়: বিচিত্র ও জীবন্ত চিন্তাধারার পরস্পব মোকাবিলা ও যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তে প্রাণের অগ্রগতির বাণী। বিজ্ঞান যখন এসে আঘাত করলো মানুষের যুগযুগবাহিত চিন্তাতে, তখন সংঘাতেব বদলে তার প্রাণশক্তিকে আত্মায়ত্ত ক'বে নেবার উদ্যোগ করলেন ইরেসমাস। লোকশিক্ষাক্ষেত্রে তাকেই রূপ দিলেন লয়োলা, এ কথা বললে ভুল বলা হবেনা। লয়োলা বুঝেছিলেন, অত্যধিক কৃচ্ছসাধন ও দৈহিক আত্মনিপীড়ন অত্যধিক ভোগসুখের মতোই আত্মা অর্থাৎ মানুষের আত্মসত্তার পক্ষে ক্ষতিকর। তাঁর মত ছিল এই যে পুণ্যচর্চা শুধু ব্যক্তিগত দায়িত্বে সম্ভব নয়: সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাও তার অনুকূল হওয়া চাই। মানুষের পাপবিচারেও তিনি সামাজিক পটভূমিকে বড়ো স্থান দিতেন। এ বিষয়ে তিনি প্লেটোরই মতের অনুসারী ছিলেন। প্লেটো মনে করতেন, দেহ রুগ্ন, উপবাসী বা অপটু থাকলে মনের কোনো উচ্চচিন্তাও সম্ভব নয়: দেহমনেব সমগ্রতায়ই মানুষের সত্তা গঠিত হয়। লয়োলা এ মত তো গ্রহণ করেছিলেনই তা' ছাড়া তিনি মনে করতেন যে দেশকাল পরিবেশ মানুষের সত্তা ও প্রকৃতিগঠনে গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে: কাজেই দেশকালপরিবেশভিত্তিক যে জীবন তা'তে সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করলে ত'বে নিজেকে সম্পূর্ণ জানা ও ফুটিয়ে তোলা যায়।

মনে হয়, দেশপ্রেমের বাস্তব, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এখানেই : শুধু কর্তব্য বা সামাজিক অনুশাসন বলে নয় : ব্যক্তিসত্তার অন্তর ও অঙ্গ থেকে লয়োলা দেশপ্রেম নিষ্কাষিত করেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি সুষ্ঠু আত্মশাসনের প্রয়োজনও বুঝেছিলেন এবং শিক্ষাবিধিকে একাধারে মানুষের অধ্যাত্ম তথা উচ্চচিন্তার বিকাশে ও সমসাময়িক বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয়ে গ'ড়ে তোলার প্রয়োজন উপলব্ধি ক'রে এমন শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন যা'তে একাধারে মনের স্ফুরণ ও আচরণগত উৎকর্ষ লাভ হ'তে পারে। তিনি বুঝেছিলেন যে শুধু প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না—তা' থাক্‌লে পর সে ঐতিহ্য প্রাণহীন হয়ে পড়বে ; আবার শুধু সমসাময়িক জ্ঞানেও মানুষের মনের ভিত্তি পাকা হ'তে পারে না। এমনি ক'রে তাঁর অধ্যাত্ম চিন্তাতে, যুক্তি সংগত ও সমগ্র স্থান গ্রহণ করলো। রিফর্মেশনের মধ্যেও যে রেনেসাঁর ধারা অব্যাহত ছিল তার এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ খোঁজবার প্রয়োজন নেই।

মানবতাবাদী চিন্তাধারার বিকাশ

সেই যে প্রাকৃতিকতত্ত্ববাদের উপর মানবীয় চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আরিস্ততোল, তার দু'হাজারেরও বেশী বৎসর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন বেনিডিক্ট স্পিনোজা: সপ্তদশ শতাব্দীতে হলাণ্ডে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার যে স্পিনোজার জীবনদর্শনের উৎপত্তি হয় রেনি ডেকার্টের দ্বৈতবাদ থেকে: সে দ্বৈতবাদের একদিকে বিরাজ করছিল ঈশ্বর নামে অভিহিত অতিপ্রাকৃতিক শক্তি আর অন্যদিকে ছিল এই জড় বিশ্বের অবস্থান—যে বিশ্ব গাণিতিক ও যান্ত্রিক নিয়মে পরিচালিত এক বিরাট যন্ত্রমাত্র ও মানুষের দেহ তারই অঙ্গ। সেই জড়প্রকৃতিতে কারু কোনো নিগূঢ় অভিপ্রায় নিহিত নেই, তার কোনো আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও নেই: ডেকার্ট যে নিয়মতান্ত্রিক বিশ্বজগৎকে মানুষের চোখের সামনে উদ্ভাসিত করলেন তার ফলে আরও বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটলো। ফলে মানবতাবাদী ভাবও জোরদার হ'লো। এ হেন দ্বৈতবাদে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব ছিল না: কিন্তু সে সময়ে বিশ্বপ্রকৃতির ক্রিয়াকে ভগবান থেকে স্বতন্ত্র ক'রে দেওয়াই ছিল যুক্তিবাদীদের রীতি: এ' ভাবেই তাঁরা নাস্তিকতা বা অধার্মিকতার অপবাদ থেকে রেহাই পেতেন। কিন্তু ভগবানের যদি বিশ্বনিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতাই না থাকবে তবে দেখা গেলো ডেকার্টের মতে মানুষের উপর ভগবানের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব রইলোনা। ডেকার্টের বই নিষিদ্ধ হ'লো, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তিনি যে বই লিখেছিলেন তা' অপ্রকাশিত রইলো—প্রাণদণ্ড থেকে তিনি কোনোক্রমে রক্ষা পেলেন। একদিকে তিনি সব কিছুতে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে মানুষের বুদ্ধিকে শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য ও ধর্মযাজকদের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পেতে অগাধ সাহায্য করলেন, অন্যদিকে "আমি চিন্তা করি, অতএব নিশ্চয়ই আমার অস্তিত্ব রয়েচে"—তাঁর এই বিখ্যাত উক্তিতে একাধারে মানুষ আত্মচিন্তার নিয়ামক ব'লে স্বীকৃতি পেলে এবং চিন্তাকে জড় অস্তিত্বের উপর প্রাধান্য দেওয়া হ'লো—যার ফলে পরবর্তী তিনশো বছর ধ'রে দার্শনিক চিন্তা বাইরের নিরীক্ষা-পরীক্ষার তোয়াক্কা না রেখে শুধু মানুষের মনে কেন্দ্রীভূত হ'লো, —এমনি ভাবে হ'লো যেন মনের বাইরে দুনিয়ার কোনো অস্তিত্ব নেই। এতেই বোঝা যাবে কেন ডেকার্টের চিন্তার বহুমুখী ক্রিয়া কার্টেসিয়ান বিপ্লব ব'লে অভিহিত হ'য়েচে।

ডেকার্টের চিন্তার আদর্শবাদী ধারার অনুসরণ করেছিলেন ম্যালিব্রাঙ্ক ; বিশপ বার্কলী তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন : অবশেষে হেগেলে তা' পরিণত রূপ লাভ করলে। বার্কলী তো বলেছিলেন, মনের বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই : তার অর্থ, আমি যে বস্তুকে মনে যতটুকু ও যে রূপে ধারণা করতে পারি, তার ততটুকু ও সেরূপেই অস্তিত্ব রয়েচে। এই চরম ভাববাদী দর্শন নানা দেশে ও কালে আরও নানা রূপ নিয়েচে। এমন কি আধুনিক বিজ্ঞানানুসারী চিন্তাও এক পর্যায়ে এর কাছাকাছি এসে পড়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞানে যখন বিশ্ব-জগতের গাণিতিক আইনবাঁধা রূপ ফুটে উঠলো তখন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ স্যার জেম্‌স জীন্‌স্ বলে উঠলেন, "এই গণিতধর্মী বিশ্ববিধানই ভগবান।" কিন্তু বৈজ্ঞানিক মহলে এ মত বিজ্ঞানের ভাববাদী বিকৃতি ব'লে গণ্য হ'লো। জীন্‌সের মতের জবাব হলো এই যে বিশ্বের সব পদার্থের পারস্পরিক সম্বন্ধ গাণিতিক নিয়মে বাধা বটে : কিন্তু নিয়মটাই তো পদার্থ নয়, পদার্থের অন্তর্নিহিত সত্যের প্রকাশও নিয়মে নয় : সে সত্য স্বতন্ত্র অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের অপেক্ষা রাখে। ডেকার্টের চিন্তার ভাববাদী ধারা হেগেলকে আশ্রয় করে কোথায় গিয়ে পৌছুলো তা' আমরা শীগগির দেখতে পাবো। অন্যদিকে তাঁর উত্তরাধিকার প্রকাশ পেলো স্পিনোজার জীবনদর্শনে : সে দর্শন সার্বজনীনতার দর্শন, সার্বজনীন নীতিবাদে তার প্রতিষ্ঠা : ভগবান তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে আছেন। কিন্তু ডেকার্টের প্রায় সমসাময়িক কয়েকজন দার্শনিক তাঁর স্বয়ং-ক্রিয় বিশ্বভিত্তিক মতবাদকে যে ভাবে পূর্ণ ক'রে তুললেন তাতেই ফরাসী এনলাইটেনমেণ্ট বা ফরাসী দেশে জ্ঞানোদ্বোধন আন্দোলনের সূচনা হলো -বং যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লবের ভাবভিত্তি রচনা করলো। ফ্রান্সিস বেকন ডেকার্টের চেয়ে বয়সে সামান্য বড় ছিলেন : ডেকার্ট নিজের চেতনা থেকে নিরেট গাণিতিক যুক্তির সাহায্যে জ্ঞান সন্ধান করেছিলেন ; কিন্তু বেকন বলেছিলেন যে বাহ্য অভিজ্ঞতা ছাড়া সত্য নির্ধারণের অন্য কোনো পথ নেই। ইনডাকৃটিভ বা বিশেষের জ্ঞান থেকে সাধারণে পৌছুবার যে প্রণালী এখন ন্যায়শাস্ত্রের অন্যতম কার্যকরী পদ্ধতি, বেকনই তার উদ্ভাবন করেছিলেন : এমন কি তিনি বলতেন যে সে পদ্ধতিই একমাত্র ও চূড়ান্ত পদ্ধতি : তাকে অতিক্রম ক'রে মনের নিজস্ব কিছু করবার অবকাশ নেই। তাঁরই শিষ্য টমাস হব্‌স্ কিন্তু বললেন যে মনকে এ' ভাবে আলাদা করা বিষম ভ্রম : তাতেই বিভ্রান্তিকর দ্বৈতবাদের সৃষ্টি হয় : আসলে প্রাকৃতিক সত্যের সঙ্গে মনের বোঝা-

পড়া দ্বারাই সত্য নির্ধারিত হয়: মন ও বস্তুর পরস্পর অঙ্গাঙ্গিগত সম্বন্ধ রয়েচে: উভয়ই প্রকৃতিভিত্তিক যুক্তির অঙ্গ: এবং প্রকৃতিভিত্তিক যুক্তিই দর্শনের প্রকৃত ভিত্তি। হব্‌সের এই মত মনকেও বস্তুর অঙ্গ ক'রে বস্তুবাদকে সর্বব্যাপী ক'রে তুললে। ধর্মযাজকগণ তাঁর এ' ধরণের মতবাদে অপ্রসন্ন হলেন; তাঁদের কেউ কেউ তাঁকে পুড়িয়ে মারার প্রস্তাবও করেছিলেন। কিন্তু সে সময়ে ইউরোপে বিজ্ঞানানুশীলনের জোয়ার চলচে; তাতে হব্‌সের বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক সত্য-সন্ধান খুবই প্রভাব বিস্তার করলো। তা' করবার আরও কারণ ছিল এই যে হব্‌স শুধু মানুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয় ক'রে সন্তুষ্ট ছিলেন না—মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রকেও তার অঙ্গীভূত করেছিলেন, তাদেরেও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অন্তর্ভূক্ত করতে চেয়েছিলেন। এরই প্রতিক্রিয়ায় আইডিয়াকে ভিত্তি করে মানুষের কাজের উৎস নির্ণয়ের চেষ্টা আবার শুরু হ'লো—কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হ'লো বলা যায় না। জন লক বললেন যে নিজের বোধশক্তি দিয়ে যা বুঝা যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত: অনুভূতিগ্রাহ্য জ্ঞান পর্যন্ত আমাদের সীমা, এবং তার বাইরে যাবার চেষ্টা করা উচিৎ নয়;—আরও কিছু আছে, আরও গভীরে যেতে পারলে আরও কিছু জানা যাবে এ' রকম অনুমান ক'রে রহস্যের ধূম্রজাল সৃষ্টি করা নিছক মূর্খতা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, লক বস্তুবাদ পর্যন্ত না গেলেও আইডিয়ার প্রভুত্ব স্বীকার করেননি। তাঁর বিচারেও মন প্রকৃতিরই অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়ালো। তখন আবার প্রশ্ন উঠলো: মানুষ কি তবে প্রকৃতির দাস: তার কি নিজস্ব কোনো সত্তা নেই? রেনেসাঁর মানুষ তো ছিল স্বরাট, নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা: এখন কি দেখা যাচ্চে সে তা' নয়: অতিপ্রাকৃতিক ভগবানের অধীন সে নয় কিন্তু প্রকৃতির অধীন তো বটে? এ' প্রশ্নেরই উত্তর মিলেছিল ফরাসী দেশে ঐতিহাসিক জ্ঞানোদ্বোধনে: সে উত্তর এই যে মানুষ প্রকৃতির দাস নয়। কিন্তু সে কথা এখন নয়।

স্পিনোজা যা বলেছিলেন ও লিখেছিলেন সে সব ছিল একেবারে গণিতের চককাটা: জ্যামিতির প্রমাণের মতো তা'তে এক যুক্তি থেকে অন্য যুক্তি উৎসারিত হচ্চে। বিজ্ঞানকে তিনি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেছিলেন: কোপার্ণিকাসের আবিষ্কারের পরবর্তী দুই শতাব্দীর বিজ্ঞানকে ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে উঠেছিল প্রকৃতি-ভিত্তিক তাঁর দর্শন এবং প্রাকৃতিক নিয়মোন্মুখ তাঁর মনোবিজ্ঞান। তিনি বলেছিলেন, "বস্তুর পরস্পরে যে শৃঙ্খলা ও' সম্বন্ধ রয়েচে, আইডিয়াদের ভেতরেও তাই আছে: তা' ছাড়া অন্য কিছু নয়" সেই থেকে এ কথার নড়চড় কেউ করাতে

পারেনি। তাঁর জীবনদর্শনব্যাখ্যানে ভগবানের ও আত্মার অমরত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ভগবান বলতে তিনি সমগ্র প্রকৃতি বুঝাতেন আর আত্মার অমরত্বের অর্থ তাঁর কাছে ছিল এই যে, আত্মা এই জনমেই চিন্তার ও কাজের উৎকর্ষ দ্বারা একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছুবে এবং মৃত্যুর পর মানুষের জীবন অনাদি অতীতের অংশরূপে অস্তিত্ব রক্ষা করবে। এরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি উভয় কূল রক্ষা করেছিলেন বলা যায়: কারণ, তাঁর বিরুদ্ধে নাস্তিকতার অভিযোগ উঠেছিল এবং তাঁর বিপদের সম্ভাবনা ছিল। বস্তুত এ সব কারণে তাঁর শ্রেষ্ঠ বই তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত হতে পারেনি।

স্পিনোজার প্রকৃতিভিত্তিক জীবনদর্শনে দেখা যায় যে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মে বাধা: অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অস্তিত্বই নেই। এই জীবনদর্শন থেকেই জার্মানীতে গ্যয়টে, শিলার প্রভৃতির নেতৃত্বে রোমান্টিক জীবনবাদের অভ্যুদয় হয়। এখানে কিন্তু মনে রাখা দরকার, আইডিয়ালিষ্টিক দর্শনেরও বিকাশ ঘটে জার্মানিতে: কাণ্ট ও হেগেল ছিলেন সে দর্শনের পুরোধা। কাণ্ট প্রথমে এ' জগতের বাস্তব অস্তিত্বের উপরই জোর দিয়েছিলেন: এমনও বলেছিলেন যে বস্তুর স্বরূপ আমরা জানতেই পারিনে: জানতে পারি শুধু আমাদের ধারণা-কল্পনাতে বস্তু যেভাবে প্রতিভাত হয় তা'। এই মত পোষণ করতেন বলেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রকৃতির নিয়ম অনুসন্ধান ও অনুসরণ ক'রে প্রাকৃতিকত্ব-বাদ নামে যে জ্ঞানানুসন্ধানের ধারা প্রবর্তিত হয় তা'ও তিনি গ্রহণ করলেন না: বল্লেন যে সমগ্র জ্ঞানলাভের কোনো আশা নেই: অথচ প্রাকৃতিকত্ববাদে সামগ্রিক জ্ঞানেরই সন্ধান চল্‌চে। এ' কথার জবাব অবশ্য ছিল এই যে প্রাকৃতিকত্ববাদে সামগ্রিক জ্ঞানের সন্ধান করা হয়নি: বাস্তব জ্ঞানের সন্ধান করা হয়েচে। যা' হোক, কাণ্ট যে বললেন বস্তুর স্বরূপ আমরা জান্‌তে পারিনে, শুধু আমাদের মনে তা' যেভাবে প্রতিভাত হয় সে জ্ঞানই আমরা পেতে পারি—এ'র ফল হ'লো এই যে মানুষের জীবননীতির কোনো বাস্তবসম্মত ভিত্তি রইলো না: তার উপর অধ্যাত্ম অনুশাসন চাপিয়ে দিতে হ'লো। মনুষ্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁ'র মত অনেকটা রিফর্মেশন ও মার্টিন লুথারের মতের অনুগামী ছিল। মানুষের বাসনাকামনাকে তি'নি খারাপ জিনিষ বলে মনে করতেন্ না বটে—কিন্তু তাদের কর্তব্যনিষ্ঠার পরিপন্থী ব'লে মনে করতেন: সে কারণে তার মত ছিল এই যে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা ভালোর দিকে নয় এবং অধ্যাত্ম অনুশাসন দিয়ে ত'ার শাসন ও পরিচালনা দরকার।

নীতিকে তিনি বিজ্ঞান থেকে আলাদা ক'রে দেখ্‌তেন এবং বল্‌তেন যে বুদ্ধি দ্বারা উভয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বুদ্ধিতেই ভগবানের ইচ্ছার প্রকাশ—এই সিদ্ধান্ত ক'রে তিনি নীতিব্যঞ্জক আদর্শ দ্বারা ধর্মের সংস্কারে ব্রতী হলেন। বুদ্ধিঅনুসারী ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মানুষকে অহরহ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হচ্চে এবং সে সংগ্রামের ভেতর দিয়েই তার মনুষ্যত্ব গ'ড়ে উঠ্‌চে, মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী এই মতেই রূপ নিল। হেগেলের চিন্তা রূপ নিল এ' মতবাদে যে বিশ্বচেতনা থেকে ভগবান এ' বিশ্ব সৃষ্টি করেচেন: কাজেই মানুষের সুখ দুঃখ সব সে চেতনা থেকে উৎসারিত: এ বিষয়ে কিছু বলবার, করবার নেই। ফলে এ' দর্শন সমাজে রাষ্ট্রে যে' কোনো রূপ পরিবর্তনের বিরোধীরূপে উদ্‌ঘাটিত হ'লো: এমন কি হেগেল বললেন যে যেহেতু রাষ্ট্রে সেই নির্বিকার ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয়েচে সেহেতু রাষ্ট্র কোনো অন্যায় করতে পারেনা! কিন্তু বিশ্বকে সর্বনিয়ন্তার অধীনরূপে ধারণা ক'রেও হেগেল বিবর্তনের যে প্রাণবন্ত, গতিবন্ত ধারা ব্যাখ্যা ক'রে গেছেন, মানুষের চিন্তায় তার যুগান্তকারী প্রভাব ঘটেচে। তিনি বল্‌লেন, সব বস্তুরই পরস্পর সম্বন্ধ রয়েচে: প্রত্যেক অবস্থার মধ্যে এমন কারণের উৎপত্তি ঘটে যাতে বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়—একে বলে থিসীস ও এ্যান্টি-থিসীস: তাকে অতিক্রম ক'রে পৌঁছুতে হয় তৃতীয় ও উচ্চতর স্তরে—তাকে বলা হয় সীন্থেসীস। হেগেলের এই ডায়লেকটিকস অর্থাৎ দ্বন্দসমন্বয়মূলক মতবাদ বিবর্তনের ধারাকে রূপদান করলো। তাঁর মতে এ' বিবর্তন আইডিয়া থেকে উদ্ভূত, আইডিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ' জন্যই পরে বলা হ'লো, এ' দ্বন্দসমন্বয়ের মাথা ছিল নীচের দিকে, পা ছিল উপরে: কার্ল মার্কস্ ও ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স এসে তাকে সোজা ক'রে দিলেন: বস্তুবাদে তাকে মিশিয়ে দিলেন ফল হ'লো ডায়লেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম বা দ্বন্দ্বসমন্বয়-মূলক বস্তুবাদ। তাকে ভিত্তি ক'রে রূপ নিল মার্ক্সবাদ: কিন্তু তা' স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

হেগেলের সমসাময়িক ছিলেন আর্থার সোপেনহাউয়ার: হেগেলের মতবাদের প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধার অবধি ছিলনা। তাঁকে দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে নৈরাশ্যবাদী বলা হ'য়ে থাকে। তাঁর মতে হেগেল যে বিশ্বকে ভাব বা নিছক আইডিয়া রূপে কল্পনা ক'রেছিলেন তা' এক পাগলের কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। আসলে ভাব হ'লো বাহ্য ব্যাপার; এক অদৃশ্য ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে এবং সে এক অমানুষিক, ক্ষতিকর, খামখেয়ালী শক্তি। বলা বাহুল্য, হেগেলের মতবাদকে

শোপেনহাউয়ার পাগলামী বল্‌লেন—কিন্তু শোপেনহাউয়ারের মত লোকের নিকট আরও দুর্বোধ্য ঠেক্‌লো। তবে ভাববাদী দার্শনিকেরা যে নিজেদের মন থেকে বিশ্বশক্তিতে মঙ্গলময়ত্ব ইত্যাদি ভালো ভালো গুণ আরোপ করছিলেন শোপেনহাউয়ার তার কিছুটা সংশোধন করলেন। তিনি বল্‌লেন যে বিশ্বে যদি মানবিক গুণগুলো সব আরোপ ক'রা যায় তবে মন্দ দিকটাও আরোপ না করবার কোনো কারণ নেই। তিনি খারাপ দিকটাই কল্পনা করতেন; তার ফলে দার্শনিক চিন্তাতে মাত্রাজ্ঞান ফিরে আসার সাহায্য হ'লো। তারপর এলেন ফ্রেডারিক নীট্‌শে: তিনিও বিশ্বের অন্তরে এক প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি প্রত্যক্ষ করলেন এবং তাকে ডারউইন-আবিষ্কৃত বিবর্তনবাদ তথা যোগ্যতমের উদ্বর্তনের সঙ্গে মিশিয়ে ক্ষমতালাভের দুরন্ত সংকল্পে মানুষকে আহ্বান করেন। তাঁর মতে এ ভাবেই মানুষ একদিন অতি-মানবে পরিণত হবে। এই মতবাদই পরে হিটলার ও নাৎসীবাদের প্রেরণা যুগিয়েছিল। জাতি হিসাবে জার্মাণদিগতে শ্রেষ্ঠত্ব ও জীবতাত্ত্বিক উৎকর্ষ আরোপ ক'রে পৃথিবীজয়ের আশাতে প্রণোদিত করেছিল। মানুষের মনকেই যদি সব কিছুর উৎস ব'লে কল্পনা করা যায় তবে তাকে বেপরোয়া ছুটতে দিয়ে বিপদ সৃষ্টি করাতেও কোনো বাধা থাকে না। নীট্‌শের মতবাদের তবু একটা ভালো দিক এই যে তিনি এই মানব থেকেই অতিমানব বিবর্তনের কল্পনা করেছিলেন: তাতে কিছুটা চোখ ঝলসে দিলেও মানবত্বের মহিমাও দেদীপ্যমান হয়েছিল।

দর্শনের ভাববাদী ধারার এই পরিণতি ঘটে না, কিন্তু বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবাদী চিন্তার প্রভাব এই ভাববাদেও পড়তে লাগলো। তাতেই উদ্ভব হলো প্যানথীজমের: অর্থাৎ এই মতের যে, ভগবান সর্বঘটে ছড়িয়ে আছেন, একাত্ম হ'য়ে মিশে আছেন: তাঁর কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। আধুনিক দর্শনে ব্রুনো এই মত প্রবর্তন করলেন, কিন্তু তাঁকে প্রাণ দিতে হ'লো। স্পিনোজাকেও এ মতাবলম্বী বলা হ'য়ে থাকে। কিন্তু আসলে তিনি ভগবান কথাটারই অন্য অর্থ ক'রেছিলেন; সে কথা যথা স্থানে বলা হয়েচে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি প্রকৃতিপ্রেমিক কবির কাব্যেও এ' মতের আভাষ পাওয়া যায়। আরও অনেকে 'ভগবান'-য়ের এমন অর্থ করেচেন যাতে মানুষের ভিতরে, পরস্পরের ভিতরে ঐক্য বা ক্রিয়া বুঝায়, অতিপ্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এমন কি ধর্মীয় মানবতাবাদী নামেও এক সম্প্রদায় ছিল: তারা এক ইস্তাহারও প্রকাশ করেছিল, কিন্তু দেখা গেলো,—তারাও প্রকৃতিভিত্তিক মানবতা-

বাদে বিশ্বাসী। ধর্ম বলতে যে অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাস বুঝায় ভাববাদী দর্শনও যেন ধীরে ধীরে তা থেকে দূরে সরে এলো। কিন্তু এখানে প্রকৃতি-ভিত্তিক জীবনদর্শনের স্বতন্ত্র বিকাশধারাও পর্যালোচনা করা দরকার।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন চার্লস ডারউইন ঘোষণা করেন যে নিম্ন-স্তরের প্রাণ থেকে বিবর্তনের দ্বারা মানুষের উৎপত্তি হয়েচে, তখন মানুষ ও তার সব কিছু আপনা থেকেই প্রকৃতির অঙ্গরূপে প্রতিভাত হয়ঃ বিশ্ব জুড়ে এক অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কল্পনা এবং তা থেকে উদ্ভূত সব দর্শন অবাস্তব হয়ে পড়ে। ডারউইনের মতবাদ প্রকৃতিভিত্তিক দার্শনিক চিন্তাধারাকে জোরদার করলে। আমেরিকায় এই চিন্তাধারা বিশেষ প্রসার লাভ করেছিলো। সেখানে এর শ্রেষ্ঠ পুরোধা ছিলেন ডক্টর জন ডেউই। কিছুদিন পূর্বে তাঁর মৃত্যু ঘটেচে। ডেউই ধর্মকে উড়িয়ে দেননি, কিন্তু অতিপ্রাকৃতিক কোনো কিছু কল্পনাকে তিনি আমল দিতেন না। ডারউইনের মতবাদ অনুসরণ ক'রে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে মানুষের মনও বিবর্তিত হ'য়ে এমন স্তরে এসে পৌঁচেচে যাতে মন তার বাঁচবার, ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার উপায় স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েচে। প্রখ্যাত মার্কিন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস্ প্রাগমাটিজম্ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা বস্তুর মূল্য নির্ধারণের সমর্থক ছিলেন। ডেউই তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন বটে কিন্তু জেমসের বিচার সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল ছিল না, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগৎ-সম্বন্ধীয় কতকগুলি পূর্বপোষিত ধারণা তাঁর বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে বুদ্ধিতে প্রায় নৈরাজ্য ঘটিয়ে দিয়েছিল বলে অনেকে সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ডেউইর মতে বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা বুদ্ধির প্রয়োগই ব্যষ্টির ও সমষ্টির যে কোনো সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট পন্থা। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ কর্তব্য: শুধু প্রাকৃত বিজ্ঞানে নয়—সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়েও বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি একান্ত প্রয়োজন। এ' ভাবে তিনি নিজ মনন দ্বারা প্রকৃতিভিত্তিক জীবনদর্শনে পৌঁচেছিলেন। প্রকৃতিভিত্তিক দর্শনের প্রসার আমেরিকায় মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তনে অনেকটা সাহায্য করেচে।

প্রাকৃতিকতত্ত্ববাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলে এসেচে বস্তুবাদ : মানবতাবাদী চিন্তা-ধারায় বস্তুবাদ প্রাকৃতিকতত্ত্ববাদের চেয়েও অধিক প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেচে। বস্তুবাদ ও প্রাকৃতিকতত্ত্ববাদ উভয়েই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও বিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত: কিন্তু বস্তুবাদ জড় পদার্থের উপর একচেটিয়া জোর দিয়েচে এবং এই ধারণা করেচে

যে, সমস্ত সৃষ্টি যন্ত্রের ন্যায় নিয়মচালিত। বস্তুবাদী দর্শনে যান্ত্রিক ক্রিয়াকে এমন সর্বেসর্বা স্থান দেওয়া হয়েছিল যে মানুষ ও নিষ্ক্রিয় পদার্থের মধ্যেও এ' বিষয়ে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। ইদানিং তার কিছু সংশোধন করা হয়েচে : বলা হয়েচে মানুষের মন যদিও আণবিক পদার্থেরই সৃষ্টি এবং মনের ক্রিয়া যদিও দেহের উপর নির্ভরশীল, তবু তার ভাবনা ও অনুভূতি এমন উৎকর্ষ লাভ করেচে যে সাধারণ আণবিক ক্রিয়া থেকে দূরে অনেকটা স্বাধীনভাবে তাদের ক্রিয়া চলচে। তা' ছাড়া প্রাকৃতিকতত্ত্ববাদে যদিও কখনো কখনো ধর্মের সঙ্গে আপোষের মনোভাব দেখা যায়, বস্তুবাদে কোনো আপোষ নেই। এ' জন্যই প্রাকৃতিকতত্ত্ববাদকে বলা হয়েচে নরম ধাঁচের বস্তুবাদ!

প্রাচীন গ্রীস থেকে শুরু ক'রে টমাস হবস্ পর্যন্ত বস্তুবাদের বি‑র্তন ইতিপূর্বে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েচে। তারপর বস্তুবাদের এক জ্বলন্ত প্রকাশ ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে ফরাসী দেশের এনলাইটেনমেণ্ট বা জ্ঞানোদ্বোধন আন্দোলনে। সে আন্দোলনের প্রবর্তকগণ এনসাইক্লোপেডিষ্ট বা বিশ্বকোষ-রচয়িতা ব'লে অভিহিত হয়েছিলেন : লা মেত্রি, হেলভেটিয়াস, হলবাক ও ডিডারো ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। হলবাক বলেছিলেন, অজ্ঞতা ও ভয় থেকে দেবতার সৃষ্টি : মানুষেরই খেয়াল, উৎসাহ বা ধোকা দেবার প্রবৃত্তি দেবতাকে কখনো সুন্দররূপে সাজায়, কখনো বা অপ্রীতিকর রূপে দেখায়; মানুষ দুর্বল—তাই দেবতাদেরে পুজো করে। তা‑দের প্রতি সম্মান দেখানোকে প্রথায় পরিণত করা হয়েচে এ' জন্যে যে মানুষের চোখ তাতে বন্ধ থাকবে এবং অত্যাচারীদের মতলব সিদ্ধি হ'তে পারবে : অত্যাচারীরা যে দে‑পূজার পৃষ্ঠপোষকতা করে তারও সেই একই কারণ। ডিডারোর মত ছিল আরও উগ্র, তিনি বললেন : "রাজা ও পুরোহিতদেরে সবংশে নিধন করতে হবে : শেষ যে পুরোহিত থাকবে তার নাড়িভুঁড়িতে শেষ রাজাকে ফাঁসিয়ে মারতে হবে : তবে মানুষ স্বাধীন হতে পারবে।" ফরাসী বিপ্লবে এ' চিন্তাধারার ফল ফলেছিল; সারা পাশ্চাত্য জগতের সংস্কৃতিতে এ' চিন্তাধারা কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। যথাস্থানে তার আলোচনা করা যাবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বস্তুবাদী চিন্তার নেতৃত্ব চ'লে গেলো জার্মানীতে। প্রথমত ডারউইনের মতবাদ অবলম্বন ক'রে হেকেল বললেন, মানুষের মন ও দেহ উভয়ই নিম্নস্তরের প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়েচে। আরও কেউ কেউ সে মত অবলম্বন করে কাজ ক'রে গেলেন; তারপর এলেন লুডউইগ ফিউয়েরবাক : তাঁকে মার্ক্স ও

এঙ্গেলসের পূর্বসূরী বলা হয়ে থাকে। এঙ্গেলস্ বলেছিলেন, ফিউয়েরবাকই হেগেলের দর্শন এবং বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে তাঁর ও মার্ক্সের ধারণার মধ্যে সেতু রচনা করেছিলেন। ফিউয়েরবাক ব্যষ্টিআত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করতেন না এবং সেকারণে তার শিক্ষকতা চাকুরীও চলে গিয়েছিল। তাঁ'র মতে মানুষের অপূর্ণ আকাঙ্খা, প্রয়োজন ও অনুভূতি থেকেই ধর্মীয় সব পুরাকাহিনীর উৎপত্তি। মানুষ নিজের অন্তরসত্তাকে যে সর্বোত্তমরূপে দেখতে চায় তাকেই ঈশ্বররূপে কল্পনা করে। সে নিজে যে সব গুণকে সবচেয়ে উচু স্থান দেয়, সে সবই সে ভগবানে আরোপ ক'রে থাকে। ফিউয়েরবাককে বস্তুবাদী বলা হয় বটে ; কিন্তু তিনি নিজের মতবাদকে মানবতাবাদ বলতেন। বস্তুবাদী বিবর্তনের উপর জোর দেওয়ার চেয়ে মানুষের পূর্ণ সত্তার প্রকাশেই তাঁর বেশী লক্ষ্য ছিল।

মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ প্রবর্তিত ডায়লেকটিকাল মেটিরিয়ালিজিম বা দ্বন্দসমন্বয়মূলক বস্তুবাদের পটভূমি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েচে। বিশ্বজগৎ যে শুধু এক যান্ত্রিকক্রিয়া-রূপে বর্ণিত হচ্ছিল—বস্তুবাদ আর শুধু সে মতে পর্যবসিত রইলো না—প্রকৃতিতে ও মানুষের সমাজে একাধারে যে প্রাণবন্ত, গতিবন্ত পরিবর্তন চলচে এবং প্রাকৃতিক ও মানবিক সব ব্যাপারের. মধ্যে পারস্পরিক যে অসংখ্য আকার ও প্রকারের সম্বন্ধ রয়েচে, বস্তুবাদ তা'র হিসেব নিয়ে তাকে আয়ত্ত ক'রে তাতে প্রসারিত হলো। মনের উপলব্ধি দেহ থেকে : কিন্তু সে শুধু বাইরের জগতের নিস্ক্রিয় প্রতিবিম্ব নয় : তার স্বতন্ত্র সত্তা ও সৃজনশীলতা রয়েচে এবং সে নূতন নূতন আইডিয়ার সাহায্যে মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টিপরিবেশকে প্রভাবিত ও পুনর্গঠিত করচে। দ্বন্দসমন্বয়ী বস্তুবাদ অবশ্য অতিপ্রাকৃতিক শক্তি-ভিত্তিক ধর্মের প্রতি বিরোধিতাকে আরও প্রবল করে তুললে। পরিধি তার এত ব্যাপক ও তা' এমনই স্বয়ংসম্পূর্ণ যে প্রভাব তার অপরিসীম হ'লো—সাম্যবাদী বিদ্রোহের অবতারণা ক'রে যথাকালে সাম্যবাদী দলের ও সাম্যবাদী রাষ্ট্রের সরকারী দর্শন হয়ে দাঁড়ালো। যথাস্থানে সে প্রসঙ্গের আলোচনা করা দরকার হবে।

আরও কয়েকরকম দর্শন রয়েচে : তাদেরে বস্তুবাদী বা প্রাকৃতিকত্ববাদী বলা চলেনা : কিন্তু তাদের দ্বারা পরোক্ষে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বিকাশের সহায়তা হয়েচে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী দার্শনিক অগস্ত কোমৎ পজিটিভ মতবাদ প্রচার করেন : এখানে পজিটিভ অর্থ বৈজ্ঞানিকমতে নিশ্চিত। বৈজ্ঞানিক মতে যা' নিশ্চিত তাকে অবলম্বন ক'রে যদিও তাঁর মতবাদ গ'ড়ে উঠ্লো, তবুও প্রিয়ার অকালে মৃত্যুর পর তিনি সেই মানবতাবাদকেই ধর্মের

রূপ দিলেন : মানুষকে দেবতার স্থলে বসালেন এবং ধর্মীয় সাধুদেরে পূজা করার পরিবর্তে মানব-জাতির প্রগতিতে যাঁরা কীর্তি রেখে গেছেন তাঁদের এক তালিকা রচনা করলেন। এই মতবাদ পাশ্চাত্যে বেশ প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল। ব্রেজিলের রাজধানী রিও ড্য জেনিরোতে আজ পর্যন্ত কোম্‌তীয় এক মানবতার মন্দির প্রতিষ্ঠিত রয়েচে।

ইংলণ্ডে জন ষ্টুয়ার্ট মিল পজিটিভ মতবাদ গ্রহণ ক'রেও মানুষকে দেবতাতে পরিণত করা সমর্থন করেননি—বাস্তব কার্যকারিতাকে ভিত্তি ক'রে এক দর্শন গ'ড়ে তুলেছিলেন। গণতান্ত্রিক আদর্শের যে নিখুঁত ও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তিনি করলেন তা'তে ব্যাষ্টিমানুষের অধিকার সমগ্ররূপে প্রকট হলো। রাজনৈতিক বিবর্তন অনুধাবন প্রসঙ্গে সে বিষয়ের আলোচনার সুযোগ হবে। হার্বার্ট স্পেনসারও ছিলেন পজিটিভ মতবাদী ; কিন্তু ডারউইনের থিওরী অনুসরণ ক'রে তিনি নৈতিক মানুষ, সফল মানুষ ও দেহবলে বলীয়ান মানুষের যে আদর্শ বাৎলালেন তা'তে মানবতাবাদকে প্রায় অতিক্রম ক'রে যাওয়া হ'লো। কিন্তু আসলে তাঁর নাম জড়িত অজ্ঞেয়বাদের সঙ্গে : অজ্ঞেয়বাদের অর্থ এই যে ঈশ্বর আছেন কি নেই, আত্মা নশ্বর কি অবিনশ্বর তা' জানবার মতো যথেষ্ট উপকরণ মানুষের হাতে নেই। অজ্ঞেয়বাদী কথাটার প্রচলন ক'রেছিলেন টমাস হাক্সলী : তিনি ছিলেন ডারউইনের সহকর্মী ও তাঁর মতবাদের প্রচারে অগ্রণী। অজ্ঞেয়বাদে অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কোনো স্থান ছিলনা : সেহেতু কার্যক্ষেত্রে তা'তে মানবতাবাদের সহায়তা হয়েছিল। তেমনি সহায়তা হয়েছিল অধ্যাপক জন্ টিণ্ড্যালের প্রগাঢ়গভীর ও যুক্তিসংহত চিন্তার দ্বারা। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান অনুসরণ ক'রে তিনি দেখালেন যে সব রকম আকার ও প্রকারের প্রাণের সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি জড় পদার্থের মধ্যে নিহিত রয়েচে। ভগবানকে স্থষ্টিকর্তা ব'লে অস্বীকারও তিনি করেননি—বরং বলেছিলেন যে ভগবানকে আমরা জড় পদার্থের স্রষ্টা ব'লেও সম্মান করবার ভান করি অথচ তাঁর সৃষ্টির পূর্ণ মর্যাদা দিইনে। সুপ্রসিদ্ধ বেলফাষ্ট অভিভাষণে তিনি এ' কথা বলেছিলেন এবং তার পরেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের রব উঠ্‌লো এই ব'লে যে তিনি পরীক্ষালব্ধ সত্যের গণ্ডী পেরিয়ে ধর্মতত্ত্বে অযথা হস্তক্ষেপ করেচেন। তার উত্তরে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখালেন যে পরীক্ষালব্ধ সত্যকে অবলম্বন ক'রে থিওরী গঠন ক'রেই সত্যের সন্ধানকে প্রসারিত করতে হয়। নাস্তিকতার অভিযোগও তাঁর

বিরুদ্ধে উঠেছিল এবং তিনি স্বীকারও করেছিলেন যে বস্তুভিত্তিক নাস্তিকতার প্রভাব তাঁর উপর রয়েচে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন যে তিনি যখন শান্ত সমাহিত চিত্তে থাকেন তখন সৃষ্টিরহস্যের বিরাটত্বের মধ্যে হারিয়ে যান এবং নিজেকেও সেই রহস্যের অঙ্গীভূত ব'লে অনুভব করেন: তখন শুধু নাস্তিকতায় তাঁর তৃপ্তি হয় না। জন টিণ্ড্যালের অগাধ মনীষা এম্নি করেই সৃষ্টি রহস্যের মূলসন্ধানে বিদগ্ধজনকে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

বারট্রাণ্ড রাসেলের পরিচয় অবশ্য বিশেষ ক'রে দেবার প্রয়োজন নেই, তিনি প্রকাশ্যে মানবতাবাদীও নন্: কিন্তু এ' বিশ্ব মনও নয়, বস্তুও নয়—উভনিরপেক্ষ কোনো পদা... ঠিত, এই যে মত তিনি প্রচার করেচেন তা'তে অতিপ্রাকৃততার কোনো স্থান নেই। বাস্তব জীবনে তিনি প্রচণ্ড সমাজসংস্কারক ; প্রথম মহাযুদ্ধকালে তিনি যুদ্ধের বিরোধিতা ক'রে চাকরী হারান ও কারাদণ্ড ভোগ করেন, ধর্ম ও যৌন সম্বন্ধের তিনি যে স্পষ্ট ও বাস্তবানুগ বিশ্লেষণ করেন তার ফলে আমেরিকায়ও তার চাকুরী যায়। মানুষের মঙ্গলের জন্যে এহেন সৎসাহস ও পরিশ্রম মানবতাবাদের সহায়ক না হ'য়ে যায়না।

জর্জ স্যাণ্টাইয়েনার জন্ম হয়েছিল স্পেনে,—কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই তিনি ইতালীতে বাস করছিলেন। তিনি একেক সময়ে প্রাকৃতিকত্ববাদ' আবার অন্য সময়ে মানবতাবাদীর ন্যায় কথা বল্‌তেন কিন্তু নিজের মতবাদকে বস্তুবাদের অন্তর্গত ব'লে মনে করতেন। অতিপ্রাকৃতিক শক্তিভিত্তিক ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বলতেন যে ও' সব হ'লো কাব্যধর্মী গালগল্প—ওর রস উপভোগের বস্তু; অন্ধ কুসংস্কার মনে ক'রে ও' সবের উপর মারমুখো হবার কোন প্রয়োজন নেই। ভগবৎপ্রেমকে খৃষ্টধর্মোচিত বদান্যতার উৎসস্বরূপ বলা হয়ে থাকে ; আসলে বদান্যতা থাক্‌লে পর সেটাই ভগবৎপ্রেম হ'য়ে দাড়ায়। আগে যদিও তিনি যুক্তিবাদের পক্ষে জোরালো বই লিখেছিলেন, পরে অনেকটা প্লেটোকে অনুসরণ ক'রে প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্ররূপে বিদ্যমান এক সার পদার্থের অস্তিত্ব ঘোষণা করলেন। এ জন্যই ডেউই মন্তব্য করেছিলেন যে স্যাণ্টাইয়ানার প্রাকৃতিকত্ববাদ এমন এক মতবাদ যার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। বস্তুত স্যাণ্টাইয়েনা পরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে অনেকটা প্রতিক্রিয়াশীল মত পোষণ করতেন।

এক্‌জিস্টেনশিয়ালিজম বা অস্তিত্বসর্বস্বজীবনবাদকেও মানবতাবাদের

সমগোত্রীয় বলা হয়ে থাকে। ডেনমার্কের সোরেন কির্কেগার্ড থেকে শুরু ক'রে বিভিন্ন জন এ' মতবাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেচেন ; কিন্তু বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক জঁা পল সার্তরে একে যে রূপ দিয়েচেন তাতে অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কোনোই স্থান নেই। তবু তাতে জীবনকে এক বিরাট হতাশারূপে গণ্য করা হয়েচে এমন কি, অস্তিত্বকে ন্যাক্কারজনক মনে করা হয়েছে,—নৈরাশ্য, চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেচে : এরই মধ্যে মনকে কল্পনা করা হয়েচে স্বরাট ব'লে : কর্তব্য, প্রয়োজন প্রভৃতি সব কিছুর ঊর্ধে সে উঠতে পারে। বলা বাহুল্য, এ জীবনদর্শন সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত : সামাজিক দায়িত্ব বা সমবেত প্রচেষ্টার কোনো নিশানা এ'তে নেই। এ' জীবনদশন মানবকেন্দ্রিক বটে, কিন্তু মানবতাবাদের প্রকৃতি, প্রেরণা বা লক্ষ্যের সঙ্গে এর মিল রক্ষিত হয়নি।

যে সব দার্শনিক চিন্তাধারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানবতাবাদকে পুষ্ট করেচে তাদের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করা গেলো। অতিপ্রাকৃতিক শক্তি-ভিত্তিক চিন্তা ও কল্পনার সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতেই মানবতাবাদের নিশানা খুঁজে পাওয়া গেছে। কিন্তু বস্তুবাদ ও প্রাকৃতিকতত্ত্ববাদ এ' দুইয়ের কোনোটার সঙ্গেই মানবতাবাদ অঙ্গাঙ্গিগতভাবে সম্বদ্ধ নয় : উভয়কে অতিক্রম ক'রে সে এক নিজস্ব জীবনদর্শন গ'ড়ে তোলবার প্রয়াসী। বিজ্ঞানের ক্রমাবিষ্কারকে অবলম্বন করেই যে তার এ' প্রয়াস এ' কথা এখন আর না বললেও চলে। যেহেতু বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে এখন বস্তুউৎসারিত মন নিজস্ব সৃষ্টিক্ষমতার স্বীকৃতি লাভ করেচে সেহেতু মানবতাবাদীও বিজ্ঞানাবিষ্কৃত সত্যে নিজের মন প্রয়োগ ক'রে সত্যকে পূর্ণতর, নিশ্চিততর করবার আশা রাখেন। এ' প্রচেষ্টা অন্তহীন : মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এ' প্রচেষ্টার প্রভাব পড়েচে, দাশনিক আত্মানুসন্ধানে সে প্রচেষ্টার ভিত্তি ও সূচনা মাত্র।

সাহিত্যে সংস্কৃতিতে মানবতাবাদ

রেনেসাঁ চিত্রশিল্পে মানবতাবাদী প্রাণ ও প্রেরণার প্রকাশ ইতিপূর্বেই আমরা স্মরণ করেচি। শুধু ইতালীতে নয়: উত্তর ইউরোপেও এর বিস্তার ঘটেছিল। সৌন্দর্য, আনন্দ ও কর্মের প্রবাহ শিল্পে ছন্দিত, নন্দিত হয়েছিল। রুবেন্‌স ও রেমব্রাণ্ডট্ মানবসত্তার অসীম শক্তি ও সম্ভাবনা তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। ইংলণ্ডে কবিদের কাব্যেই মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষরূপে প্রকাশ লাভ করে। স্বয়ং সেক্‌সপীয়র ধর্মের ধার বিশেষ ধারতেন বলে মনে হয় না: অবশ্য ধর্মবিশ্বাসের অস্তিত্ব যে মানুষের জীবনে রয়েচে তা তিনি অস্বীকার করতেন না। তাঁর নাটকে নরনারীগণ জীবনেমরণে পাপপুণ্যে ধর্মকর্মে এই পৃথিবীর সঙ্গে বোঝাপড়া করচে। মানুষের প্রত্যক্ষ জয়বন্দনাও তিনি করেচেন।

ফরাসী এনলাইটেনমেণ্ট বা জ্ঞানোদ্বোধন আন্দোলনে বস্তুবাদী দর্শনের যে বিকাশ ঘটেছিল তা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা গেছে। সাংস্কৃতিক স্ফুরণও এ' আন্দোলনের এক বিশেষ লক্ষণ ও অবদান। ভলটেয়ারের সাহিত্যকীর্তির প্রভাব অসামান্য হয়েছিল। সে কীর্তির পরিধি ছিল অতি ব্যাপক, সাহস ও রসিকতার সংমিশ্রণ তাতে ঘটেছিল। যুক্তি ও জ্ঞানই ছিল তাঁর একমাত্র হাতিয়ার; তাদের সাহায্যে মানুষকে ঠিকমত সত্যে ওয়াকেফহাল করা যাবে,— এই ছিল তাঁর দৃঢবিশ্বাস এবং যা' কিছু মানুষকে পীড়িত করেচে তার বিলোপ সাধন করতে হবে, এই ছিল তাঁর দৃঢ়সংকল্প। এহেন মনোভাবকে সে সময়ে হিউম্যানিটেরিয়ানিজম বা মানবিকতা বলা হতো; কিন্তু বাস্তবে মানবতাবাদী বা মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীই এর মূলে ছিল। ক্যাথোলিক ধর্মযাজকদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি অগ্রণী ছিলেন, কিন্তু ভগবানকে একেবারে অস্বীকার করেননি—কতকটা কৌতুকের ভঙ্গীতে বলেছিলেন, ভগবান যদি না'ও থাকৃতেন,—তাঁকে আমাদের আবিষ্কার ক'রে নেওয়ার প্রয়োজন হ'তো। এ' জন্যই বলা হয়েচে: তিনি দ্বৈতবাদ সমর্থন করতেন—যাজকবিরোধী হ'লেও নাস্তিক ছিলেন না।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রভৃতি যে সব আদর্শ মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উদ্ভূত, ভলটেয়ার ও ফরাসী দেশের বুদ্ধির মুক্তির অন্যান্য নায়কগণ দৃপ্তকণ্ঠে সে সব প্রচার করেছিলেন। ব্যক্তিস্বাধীনতার চরম

অভিব্যক্তি ঘটেছিল তখনই, যখন তিনি একজনকে বলেছিলেন,—"তুমি যা' বলচো তা' আমি একেবারেই অনুমোদন করিনে, কিন্তু তোমার তা' বলার অধিকার আমি দরকার হ'লে নিজের প্রাণ দিয়েও সমর্থন করবো।" ভলটেয়ার ও তাঁর সহকর্মীগণ সমাজের অন্তহীন উন্নতির সম্ভাবনাতে বিশ্বাসী ছিলেন। এখানে মনে রাখা দরকার, এ' ধরণের বিশ্বাস এখন মামুলি ব্যাপার ব'লে বোধ হ'লেও সে সময়ে বিশেষ প্রচলিত ছিল না। বস্তুত এ' বিশ্বাসের উৎপত্তি নিতান্ত আধুনিক কালে হ'য়েচে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানরা কল্পনাই করতেন না যে মানবজাতির উন্নতির কোনো প্রশ্ন আছে। মধ্যযুগে এ' ধরণের উন্নতির কল্পনা পাত্তাই পেতো না। রেনেসাঁর এত অতুলনীয় কীর্তির মধ্যেও এমন কল্পনা কেউ করতেন বলে প্রমাণ নেই যে মানুষ আবার প্রাচীন যুগের কীর্তির পর্যায়ে ফিরে যেতে পারবে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুনবায় মানুষের চোখের সামনে অব্যাহত উন্নতির রাস্তা খুলে গেলো; সে এগিয়ে যাবার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলো। ফরাসী দেশে বুদ্ধির মুক্তির কালে মানব প্রগতির আধুনিক আদর্শ পরিণত রূপ লাভ করলো।

সেই বুদ্ধির মুক্তির আরেক পুরোধা ছিলেন জঁ্যা জ্যাক্‌স্ রুসো: তিনি এতটা ভাবপ্রবণ ছিলেন যে তাতেই অনেক সময়ে বুদ্ধি আচ্ছন্ন হ'য়ে যেতো এবং ভলটেয়ার তাঁকে দার্শনিক ব'লেই স্বীকার করতেন না। কিন্তু যে দুরন্ত আবেগে তিনি মানুষের জন্য সুন্দর, সমুন্নত জী·ন এবং গণতান্ত্রিক সমাজ দাবী করতেন, তাই তাঁকে সত্যিকার মানবতাবাদী করে তুলেছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্যে তিনি মাতোয়ারা হ'য়ে যেতেন, সে সৌন্দর্যের উপলব্ধিকে দর্শনচর্চার সম্পূর্ণতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে শুধু বুদ্ধি নয়, হৃদয়াবেগ—বিশেষ করে সমাজের প্রতি সহানুভূতিরও প্রয়োজন রয়েচে এবং এ' সব যদি থাকে তবেই মানবতাবাদ পূর্ণাঙ্গ হ'তে পারবে।

রুসো ও ভলটেয়ারের জীবন্ত জীবনবাণীর রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রভাব ফরাসী বিপ্লবে পরিস্ফুট হয়েছিল। সে প্রসঙ্গে পুনরায় তার আলোচনা করতে হবে। ইংলণ্ডে আলেকজান্দার পোপ ও অন্যান্যদের কাব্যে মানবতাবাদী ভাবের স্ফুরণ হয়েচে। পোপই বলেছিলেন, "মানুষই মানুষের অনুশীলনের বিষয়; নিজেকে জানো, ভগবানকে জানবার স্পর্ধা কোরোনা।" শেলীর কাব্যে মানবতাবাদের চরম জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়েচে। আঠারো বছর বয়সে তিনি "নাস্তিকতার প্রয়োজন" নামে প্রবন্ধ লিখে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত

হ'ন। "কুইন ম্যাব" নামক কবিতাতে তিনি অতিপ্রাকৃতবাদ ও খৃষ্টধর্মে যা' কিছু অমঙ্গলজনক রয়েছে তাঁর তীব্র নিন্দা করেন। এ কবিতাতে বিশ্বে এক সর্বব্যাপী ভাবের অস্তিত্বে তাঁর বিশ্বাসের আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষকে তিনি মহিমার উন্নত শিখরে তুলে ধরলেন—"প্রমীথিয়ুস আনবাউণ্ড" নামক কবিতায়। মানবীয় শক্তির প্রতিমূর্তি প্রমীথিয়ুস দেবতা জুপিটারের হাতে নিজ শক্তি অর্পণ করেছিলেন: সে শক্তি নিয়ে জুপিটার প্রমীথিয়ুসকে শৃঙ্খলিত ক'রে বসলেন, ফলে জুপিটারকে আবার ক্ষমতাচ্যুত ক'রে প্রমীথিয়ুস ও মানবজাতিকে স্বাধীন হ'তে হ'লো। এই প্রতীক কাব্যটিতে মানুষেব নিজ কল্পনা সৃষ্ট ঈশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করবাব পরে সে বশ্যতার বন্ধন চূর্ণ ক'রে নিজের ভাগ্য 'নজে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হাতে নেবাব এবং কল্পনার স্বর্গেব স্থলে এই পৃথিবীতে স্বর্গরচনার সংকল্প অভিব্যক্ত হয়েছে। শেষ স্তবকটি বলিষ্ঠ মানবতাবাদের স্থায়ী ব্যঞ্জনা হয়ে রয়েছে:

"যে দুঃখের অন্ত হবাব আশা নেই,
তা' সহ্য কবা—
মৃত্যু বা রাত্রিব চেয়েও ঘোব কালো যে অন্যায়
তা' ক্ষমা কবা—
যে শক্তিধর মনে হয সর্বশক্তিমান
তাকে মানতে অস্বীকার করা—
ভালোবাসা ও ধৈর্য ধবা, আশার ভস্মশেষ থেকে
যতক্ষণ না আশার বস্তুটির সৃষ্টি হয়,
সে পর্যন্ত আশা করা—
বদলে না যাওয়া, ভেঙ্গে না পড়া, অনুশোচনা না করা
তোমারই গৌরব সম, হে মহাশক্তিধর টাইটান,
এ'কেই বলে ভালো হওয়া, বড়ো হওয়া, সুখী হওয়া,
সুন্দর স্বাধীন হওয়া:
এই তো জীবন, এই আনন্দ, সাম্রাজ্য চাও তো
তা'ও এই:
এই মানুষের জয়।"

জার্মানিতে মহাকবি গ্যয়টেও বিশ্ব এক সর্বব্যাপী ভাবরূপ ব'লে বিশ্বাস করতেন ; কিন্তু তিনি এই পৃথিবীর বহুমুখী জীবনের জন্যে প্রাণভরা ভালোবাসাকেও ভাষা দিয়ে গেছেন। তাঁর অমর সৃষ্টি "ফাউষ্টে" বর্ণিত আত্মার বন্ধনমুক্তির কাহিনী রেনেসাঁর বাণীকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ' সময়ে জার্মানিতে যে সংগীত রচিত হয় তা'ও মানবতাবাদে উদ্দীপ্ত। স্বয়ং বেটোভেন যে সব সিম্ফনী বা স্বরের একতান সৃষ্টি করেছিলেন তাদের একটিতে অনেক মহৎ লোকের স্মৃতি কীর্তিত হয়েচে, অন্য একটিতে অদৃষ্টের উপর মানুষের জয়ধ্বনি উঠেচে, আবার আর একটিতে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের বাণী পরিশেষে আনন্দের ঝঞ্জনা সৃষ্টি করেচে। ওয়াগনার দেবতাদের সম্বন্ধে এক গাথার মাধ্যমে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার কুফল সুরে ব্যক্ত করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের মহিলা কবি ও ঔপন্যাসিক জর্জ ইলিয়ট, এডওয়ার্ড ফিটজারেল্ড, উইলিয়ম মরিস ও সুইনবার্ণ মানবতাবাদী ভাবের সাহিত্য রচনা করেন। জর্জ ইলিয়ট তাঁর কবিতাতে আত্মার অমরত্বের স্থলে মৃত্যুর পর এই জীবনের প্রভাবের স্থায়িত্বকে তুলে ধরেন। সে স্থায়িত্বের অর্থ এই যে, যারা বেচে রইল তাদের মনে, মহৎ কর্মে, চিন্তায় ও প্রেরণায় সে প্রভাব অমর হ'লো। ইউরোপীয় ভাষা থেকে মানবতাবাদের পরিপোষক একাধিক বইয়ের অনুবাদও তিনি করেছিলেন। ফিটজারেল্ডের খ্যাতি রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামের অনুবাদের জন্য ; কিন্তু সে অনুবাদ এমন যে তাকে মৌলিক সৃষ্টি ব'লে ভ্রম হয় : এই পার্থিব জীবনের বন্দনা তা'তে ঝঙ্কৃত হয়েচে। এ' বাণী খাও দাও স্ফূর্তি করার বাণী—এ' কথা ব'লে ও ভেবে এর বিকৃতি ঘটানো হয়েচে বটে ; কিন্তু এর অন্তর্নিহিত প্রাণমাতানো মানবতাবাদ তাতে ক্ষুণ্ণ হয়নি।

উইলিয়ম মরিস যন্ত্রশিল্পপরিবেশের কুশ্রীতাবর্জিত সরল সুন্দর গ্রাম্য জীবনের চিত্র এঁকেচেন : খানিকটা অবাস্তব হলেও তা'তে সহজ মানবতাবাদের আবেদন রয়েচে। সুইনবার্ণের কবিতাতে মানুষের অনাদি আকাঙ্খা ব্যক্ত হয়েচে, "মানববন্দনা" কবিতাতে তিনি লিখলেন— "মানুষের জয় হোক! মানুষই সব কিছুর প্রভু!" জর্জ মেরিডিথের কবিতাতেও মানবতাবাদী ভাব রয়েচে। ম্যাথু আর্ণোল্ড ধর্মসংস্কারকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন ; তিনি বলতেন যে যীশু দেবতা ছিলেন না—মানুষ ছিলেন এবং মোলায়েম যুক্তির সাহায্যে মানুষকে শিক্ষা দিতেন। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের অন্যতম টমাস হার্ডি মানবতাবাদী ছিলেন বলা যায়, কিন্তু তিনি আবার প্রবল

নৈরাশ্যবাদী ছিলেন: মানুষের উন্নতির ও আনন্দের আশা কোনোকালে পূর্ণ হবে না, এই তিনি বলতেন। এইচ, জি, ওয়েল্‌স জীবনের শেষভাগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে কতকটা নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়েছিলেন: কিন্তু তার পূর্বে তিনি বরাবরই মানবতাবাদী আদর্শের উপর জোর দিতেন ও বলতেন, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা অনুসরণ এবং সমগ্র জগতের এক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থাগঠনের পক্ষে উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা দরকার! জন গল্‌স্‌ওয়ার্দী স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবেই মানবতাবাদকে আধুনিক জগতের মানুষের গ্রহণীয় একমাত্র মতবাদ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

এবার নাম করতে হয় জর্জ বার্ণার্ড শয়ের—যাঁর দীর্ঘ জীবনের সৃজনীশক্তি নিখিলের প্রতিটি মানুষের পূর্ণ সত্তার প্রতিষ্ঠার সাধনায় নিয়োজিত ছিল। সে সাধনার সন্ধানী আলো এমনি তীব্রভাবে সমাজ সংসার, ধর্ম রাষ্ট্র—জীবনের সর্ব-ক্ষেত্রে পড়েচে যে তাতে অদৃশ্য নিয়ন্তা কোনো শক্তির কথা মানুষের মনেই আসে না: যা কিছু ব্যর্থ, অসত্য, সে সব ভেঙ্গে চূর্ণ করে নিজেকে পূর্ণ মানবীয় সত্তায় গ'ড়ে তোলার প্রয়োজনই একান্ত মনে হয়। বিদ্রূপের কষাঘাতে মানুষের মূর্খতা ও কপটতাকে জর্জরিত করেচেন বার্ণার্ড শ: কিন্তু এমনি প্রত্যক্ষ তার অন্তর্লীন মানবিক আবেদন যে তা'তে মানুষকে কৃতজ্ঞ, অভিভূত করেচে—মুহূর্তের জন্যেও কোনোরূপ বিরূপতার অবকাশ রাখেনি। অথচ সে আবেদন ঐশ্বরিক বা মানবীয় করুণার আবেদন নয়: নিজ শক্তিতে নিজে বড়ো হ'বার আবেদন। তাই তাঁ'র জীবনদর্শন ব্যক্ত হয়েচে এই বাক্যে—"জীবনের বহুবিধ বিরাট উদ্দেশ্য রয়েচে; তাদের মধ্যে যে উদ্দেশ্যকে মানুষ নিজেই স্বীকার করে, গ্রহণ করে, তার পূর্ণতার জন্য নিজেকে নিঃশেষে ব্যবহৃত হ'তে দেওয়াতেই জীবনের প্রকৃত আনন্দ; পৃথিবীর আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবার আগেই সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ক্ষয় হয়ে যাওয়া—সেই তো আনন্দ; দুনিয়া তোমাকে সুখী করবার জন্যে আত্মনিয়োগ করচে না ক্রমাগত এই অভিযোগ ক'রে বিলাপ ও প্যানপ্যানানির এক ক্ষুদ্র, খিটখিটে, স্বার্থপর মাটির ঢেলাতে নিজেকে পরিণত করার পরিবর্তে নিজেই প্রকৃতির এক শক্তিরূপে গণ্য হওয়া—সেই জীবনের আনন্দ।—"মহান পুরুষকারের এই বাণী। তাইতো সুধীজনের মতে বার্ণার্ড শ আমাদেরে সমুন্নত করেচেন: তিনি এ পৃথিবীতে এসেছিলেন, বেঁচেছিলেন ব'লে আমাদের জীবনও অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ ও আনন্দময় হ'তে পেরেচে।

উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যেও মানবতাবাদের প্রেরণা অক্ষুণ্ণ ছিল। ফ্লবার্ট, জোলা, ডোডেৎ, মোঁপাসা এঁদের সবাই-র নাম এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। আর্নেষ্ট রেনান যীশুর জীবনের এক মানবতাবাদী ব্যাখ্যা লিখে আন্তর্জাতিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। আনাতোল ফ্রাঁস যে ভাবে তাঁর উপন্যাসে পুরাতন সব কুসংস্কারকে ব্যঙ্গ করেচেন তাতে সারা ইউরোপে গোঁড়ার দল খুব ক্ষেপে উঠেছিল; কিন্তু তিনি গত একশত বৎসর কালের ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী বলে আখ্যাত হয়েচেন। রোমা রোঁলা সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যকেন্দ্রিক জীবনদর্শন গ্রহণ করেননি; কিন্তু মানুষের জীবনের অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব তিনি যে ভাবে উদ্ঘাটিত করেচেন এবং সারা বিশ্বের মানুষের প্রতি তাঁর হৃদয়ের প্রেম প্রসারিত করেছিলেন তাতে তাঁর মানবিকতা মানবতাবাদের চেয়ে কম মহীয়ান হয়নি। সুইডেনে ইবসেনের, রাশিয়াতে টুর্গেনিভ ও গোর্কীর লেখাতে মানবতাবাদ প্রকট হয়েচে। টলষ্টয় খৃষ্টপ্রেমকে মানবপ্রেমে রূপায়িত করেছিলেন—প্রত্যক্ষ মানবতাবাদী না হ'য়েও তিনি মানুষের হৃদয়ের গরিমা ও সুষমা ফুটিয়ে দিয়ে গেছেন।

ফরাসী শিল্পকলাতেও মানবতাবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। ইউজিন ডেলাক্রয়স্কের চিত্রে, অগষ্ট রোডঁ্যার ভাস্কর্যে মানবীয় কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণ বলিষ্ঠতা নিয়ে ফুটেচে। ক্লড ডেবুসীর সুরেলা কাব্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য রসান্বিত হয়েচে।

আমেরিকা—ধনিক জগতের মধ্যমণি আমেরিকা। কায়েমী স্বার্থের বাসা আমেরিকায় ধর্মভিত্তিক জীবনাদর্শের প্রাধান্যইতো স্বাভাবিক! সাম্যবাদী মতে ধর্মই কি কায়েমা স্বার্থের আশ্রয় নয়? তবু সেখানে মানবতাবাদী চিন্তাধারার প্রসারও কম হয়নি। গত শতাব্দীর শেষার্ধে সেখানে রবার্ট জি ইঙ্গারসোল অতিপ্রাকৃতিকত্ববাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ তোলেন। রিপাবলিকান পার্টির অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন তিনি; চিন্তাশীলতা ও বাগ্মিতাও তাঁর অসাধারণ ছিল। তিন দশকের অধিককাল তিনি সারা দেশময় গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রচার ক'রে বেড়ান। তিনি বলতেন "একমাত্র জ্ঞানেই জীবনের আনন্দবিধান সম্ভব।"

মার্কিন কবি-সাহিত্যিকদের অনেকের মধ্যে পার্থিব জীবনের তথা মানবীয় ভ্রাতৃত্ব ও গণতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সৃষ্টি কর্তা বা ভগবানে বিশ্বাস রক্ষা ক'রেও তাঁরা মানবতার সহায়তা ক'রে গেছেন।

হেন্‌রি ডেভিড থোরু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে গান্ধিজীর পূর্বসূরী বলে অভিহিত হ'য়ে থাকেন। অন্যায় কর দিতে অস্বীকার ক'রে তিনি কারাবরণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই যে জীবন আমরা পেয়েছি একে সহজ ও স্বতস্ফূর্ত আনন্দে গ্রহণ করতে খুব কম লোকেই পেরেচে : বলেছিলেন, আত্মার অমরত্বের চিন্তা ক'রে কোনো ফায়দা নেই : এই জীবনে এই জগৎই যথেষ্ট। দাসত্বের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রের পক্ষে তিনি আপোষহীন সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান বাহ্য প্রকৃতি সম্বন্ধে অনবদ্য লেখা : সে লেখাতে দেখা যায়, তাঁর প্রাণ প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে জীবনের মহত্তম উপলব্ধিতে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেচে।

ওয়াল্ট হুইটম্যানের কাব্য ও জীবনবাণীর সঙ্গে আমাদের দেশের লোক মোটামুটি পরিচিত। তাঁকে গণতন্ত্রের কবি বলা হয়ে থাকে : জীবনের জয়গানে তিনি ছিলেন মুখর, বাঁচবার আনন্দে ভরপুর, উপলব্ধিতে চঞ্চল। মার্কিন কবি ও কথাশিল্পীদের মধ্যে আরও অনেকে মানবতাবাদকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েচেন।

প্রাচ্যের সাহিত্যে সংস্কৃতিতে মানবতাবাদের প্রকাশ ঘটেচে মানুষের সার্বভৌম সত্তার স্বীকৃতিতে ততটা নয় যতটা মানুষে মানুষে ভেদ অস্বীকার ক'রে তার অখণ্ড সত্তা প্রতিষ্ঠার সাধনাতে। আমাদের দেশে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল ইসলাম প্রভৃতির কাব্যে—বিশেষত নজরুলকাব্যে অন্যায় অসংগতির বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহী সত্তার পূর্ণ উদ্বোধনে এম্‌নি মানবতার জয় ঘোষিত হয়েচে। কিন্তু এম্‌নি করে মানবসত্তা যেখানে ভগবৎসত্তার নাগাল পেয়েচে শুধু সেখানেই সার্বভৌম মানুষের রূপ উদ্ঘাটনের অবকাশ মিলেচে। তা' মিলেচে প্রেমেরই মাধ্যমে—"দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা" যে আত্মোপলব্ধি দ্বারা তাই মানুষকে দেবতার সমপর্যায়ে বসিয়েচে। বৈষ্ণব কবি এ' অর্থেই বলেছিলেন : সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।

"কিশোরী দাস আমি পীতবাস
ইহাতে সন্দেহ যার
কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে,
বিফল ভজন তার"।

মানবীর প্রেম ও দেবতার প্রেম এখানে এক হ'য়ে গেছে : প্রেমের আসনে ভগবান মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েচেন। মানুষের প্রেম, মানুষের সুখদুঃখ, মানুষের প্রাণলীলাতে যেখানে ভগবানের প্রকাশ সেখানে মানুষ ভগবানের স্থলাধিষ্ঠিত যদি বা না হ'য়ে থাকে তবু সে ভগবানের পর্যায়ে পৌঁছেচে : সে আর অজ্ঞান ভগবানের হাতের অসহায় ক্রীড়নক নয়। এ' বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ নয় : মানুষ এখানে প্রেমের গৌরব লাভ করেচে, তা'তে মহীয়ান হয়েচে। সে যদি মহৎ না হবে, তবে প্রেমের গৌরব লাভ করবে কী করে? সৃষ্টির শরীক হিসেবে মানুষের এহেন আত্মোদ্বোধনের পরিচয় আমাদের কাব্যে, সাহিত্যে, জাতীয় মানসে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীতে সে পরিচয় নিবিড় : ভারতের প্রায় প্রত্যেক ভাষাতে সাহিত্যে ও শিল্পকলায় সে পরিচয় বিবৃত। যুগ যুগ ধ'রে ব্যক্তিমানস তাতে সঞ্জীবিত, সে পরিচয় মানুষকে সৃষ্টির বুকে শ্রেষ্ঠ করেচে। ব্যক্তির মনে সে পরিচয় হয়তো সীমিত হয়েচে, প্রেমকে সার্বিক জীবনের স্তরে উন্নীত করতে পারেনি : তবু তার সাংস্কৃতিক মূল্য কিছুতে কম নয়। আপন গৌরবে সে আপনি চিরভাস্বর।

সাহিত্যে সংস্কৃতিতে মানবতাবাদের স্বীকৃতিতে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব যে প্রভূত সহায়তা করেচে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে সব অধ্যাত্মবাদী ধারণাকল্পনা প্রচলিত ছিল তাদের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব অনিবার্যভাবেই এসে পড়েচে। ধর্মে ও দর্শনে তার ফল যা হয়েচে তা' নিয়ে অনেকে আলোচনা করেচেন। সে আলোচনা অবশ্য এখনও চলচে। তা' ছাড়া যন্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয়েচে, জীবন উপভোগের নানা উপকরণ মানুষের হাতে এসে পড়েচে—তেমনি আবার জীবনের গতি বেড়েচে : জীবনযাত্রার শ্রমসাধ্যতা ও নিয়মানুবর্তিতা এবং বহুবিধ সমস্যাতে সমাজজীবনের যে ক্রমবর্ধমান জটিলতার সৃষ্টি হয়েচে তাতে পার্থিব জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিও জনজীবনে প্রসার লাভ করেচে। এমন একাধিক ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটেচে যারা বিশেষ দেশকালে আবদ্ধ হলেও সমগ্র মানবজাতির চিন্তায় আলোড়ন জাগিয়েচে এবং মানবিক মূল্যবোধকে জোরদার করেচে। সাহিত্যে সংস্কৃতিতে এর প্রভাব যে সুদূর প্রসারী হয়েচে তা' বলাই বাহুল্য। কিন্তু মানবতাবাদী চিন্তাধারা এ' ভাবে বিকশিত হলেও তার প্রকাশ রাষ্ট্রিক বা সামাজিক কারণে অনেক সময়েই বাধা প্রাপ্ত হ'য়েচে। অনেকে তা' প্রকাশ করতে গিয়ে মৃত্যু বা কারাদণ্ড বরণ করেচেন,

অনেকে চাকুরী হারিয়েছেন, জীবিকার উপায় থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এখনও এমন বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে প্রচলিত • শিক্ষাব্যবস্থায় আধুনিক বিজ্ঞানের স্থান হয় না, স্বাধীন মত পোষণ করেন ব'লে যোগ্য ব্যক্তিকেও দূরে স'রিয়ে রাখা হয়। অনেক সময়ে আবার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা জনসাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হ'লে পর পাছে তার অবাঞ্ছনীয় রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া ঘটে সে আশঙ্কায়ও সে চিন্তাধারাকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা হয়। এ পরিস্থিতিতে অনেকেই আপোষের পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হন: নিজেদের চিন্তাধারার সঙ্গে সাবেক মতবাদের সামঞ্জস্যের প্রয়াস করেন। তারই ফলে 'ভগবান', 'আত্মা', 'অমরত্ব' প্রভৃতি শব্দের বহু সংজ্ঞা পরিবর্তন হয়েছে। অনেকটা সে কারণেই মানবতাবাদী চিন্তাধারা অনেক সময়ে শুধু সাহিত্যসংস্কৃতিতেই অকুণ্ঠ প্রকাশ পেয়েছে। বুদ্ধিজীবি তার্কিক ও দার্শনিকের চিন্তাধারা অনেক সময়ে তার নিজের গণ্ডীতেই আবদ্ধ থাকে: সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী তাকে জগতের প্রশস্ত অঙ্গনে ছড়িয়ে দেন। তাই প্রাচীন গ্রীস ও ভারত থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত আমরা মানবসংস্কৃতিতে মানবতাবাদী ধারা অনুধাবন করতে পারি। এমনি ক'রে মানবতাবাদী চিন্তাধারা যে স্তরে এসে পৌঁছেছে তাতে শুধু অতিপ্রাকৃতিকত্ববাদী চিন্তা নয়, বস্তুবাদী চিন্তার সঙ্গেও তাকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে: বস্তুবাদী চিন্তার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক তাৎপর্যের সঙ্গেও বোঝাপড়া করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সাহিত্যসংস্কৃতিতেও সে বোঝাপড়ার ঢেউ এসে লেগেছে: তারও হিসাব আমাদের যথাসময়ে না নিলেই নয়।

ফরাসী এনলাইটেনমেণ্ট ও ফরাসী বিপ্লব

মানুষ যখন জানতে পারলে যে সে কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অধীন নয়, প্রাকৃতিক শক্তির বিধিবিধানেই তার ভাগ্য গঠিত এবং তারও শক্তি রয়েচে নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার, তখন সে একবার নিজের অতীতের দিকে ফিরে চাইলে,—জানতে চাইলে যুগ যুগ ধ'রে সে কীভাবে চ'লে এসেচে। একাধিক মনীষীচিত্তে তখন কৌতূহল ও আগ্রহ জাগলো মানবজাতির ইতিহাসের স্বরূপ নির্ণয় করবার। রেনেসাঁর যুগে এই মতই প্রাধান্য লাভ করেছিলো যে দর্শন যেমন উপদেশের সমষ্টি, ইতিহাস তেমনি উদাহরণ ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিক্ষা দান করে। রিফর্মেশনের যুগে মার্টিন লুথার মানবজাতির অতীত কাহিনী উদ্ঘাটিত ক'রে তারই শিক্ষা দ্বারা মনুষ্যকেন্দ্রিক জ্ঞানানুসন্ধিৎসা রোধ করতে চাইলেন—অতীতকে ডেকে এনে বর্তমানের বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন এই ব'লে যে, অতীতে কখনও মানুষ ভগবানকে অতিক্রম ক'রার স্পর্দা করেনি। যেসুইট পাদ্রীদের জ্ঞানালোচনার কথা পূর্বে বলা হয়েচে, ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁরা পুরোমাত্রায় গবেষণা চালালেন। তখন রিফর্মেশনও শেষ হ'য়ে তার বিরোধী আন্দোলনের প্রাধান্য চলচে, পোপের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েচে। এরই মধ্যে ইতালীর গিয়ামবেটিষ্টা ভিকো "নব বিজ্ঞান" নামে বই লিখলেন, তা'তে প্রচার করলেন যুগান্তকারী মত: সে মত এই যে ইতিহাস সেই বিজ্ঞান যার মধ্যে মানবজাতি নিজেকে সৃষ্টি ক'রে চলেচে।

বসুয়েৎ ছিলেন বয়সে ভিকোর সামান্য বড়ো: তিনি বলেছিলেন যে ইতিহাসের ক্রিয়া তার অন্তর্নিহিত কারণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। বলেছিলেন—ভগবানের ইচ্ছা এই যে, যে কোনো পরিবর্তন ঘটবে তার মূল থাকবে অতীতে। তিনি ও ভিকো উভয়েই ছিলেন ক্যাথোলিক ধর্মপ্রাণ লোক: সাধু আগষ্টাইনের মতবাদের সমর্থন নিয়ে তাঁরা ঈশ্বরেচ্ছাকে ভিত্তি ক'রে ইতিহাসের স্বয়ংক্রিয়তা প্রচার করতে চেয়েছিলেন। বাইবেলোক্ত কাহিনীতে দেখা যায়, প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানবজাতিকে দু'ভাগে ভাগ ক'রা হয়েছিল; হিব্রুরা ছিল ভগবানের বিশেষ প্রিয় আর অন্যেরা ছিল প্রাকৃতিক কার্যকারণে পরিচালিত—অবশ্য তা'ও ভগবানেরই ইচ্ছাতে। সাধু আগষ্টাইন এই দুই ভাগ ভেঙ্গে এক ক'রে দিলেন এবং তাইতে ভিকোর পক্ষে হেতু থেকে হেত্বান্তরে ইতিহাসের বিবর্তন নির্ণয় করতে আর বাধা রইলো না। তাঁর ধর্মবুদ্ধির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক

বুদ্ধির সামঞ্জস্য এ'ভাবেই হ'লো। তিনি সে সামঞ্জস্যের উপর জোর দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু আসলে গ্রোটিয়াস, হবস্, প্রভৃতি প্রাকৃতিকতাবাদীরা দার্শনিকদের চিন্তাধারারই পরিপূরণ করে'ছিলেন। বস্তুত, গ্রোটিয়াসের চিন্তাতে যেটুকু ফাঁক ছিল ভিকো তা' পূরণ করেছিলেন। এখানে গ্রোটিয়াসের চিন্তাধারার মোটামুটি পরিচয় নওয়া প্রয়োজন।

আধুনিক ইউরোপের রাষ্ট্রিক গঠনে হল্যাণ্ডবাসী গ্রোটিয়াসের অবদান অপরিসীম বললেও অত্যুক্তি হয় না। একদিক দিয়ে তিনি ছিলেন ইরেসমাসের সহকর্মী : ১৬২৫ সালে প্রকাশিত তাঁর বই "যুদ্ধ ও শান্তির আইন" আধুনিক রাষ্ট্রিক চিন্তাধারার সূচনা করে। আরিস্ততোলের সময় থেকেই ঐশ্বরিক আইন ও প্রকৃতিদত্ত আইনের তুলনামূলক আলোচনা শুরু হয়েছিল : আরিস্ততোল প্রকৃতিদত্ত আইনকে ন্যায়ের বিধানরূপে অভিহিত করেছিলেন। ষ্টোইকেরা এই চিন্তাধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘোষণা করেন যে সব মানুষই সমান ও স্বাধীন। খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে এই মতই মোটামুটি স্বীকৃত হয়েছিল ; কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের আইনে সব মানুষ সমান ব'লে স্বীকৃত হ'লো না—তবে স্বাধীন ব'লে স্বীকৃত হ'য়েছিল অথচ বহু শতাব্দী পূর্বে সিসারো সাম্য সমর্থন ক'রেছিলেন, বলেছিলেন যে প্রকৃতিদত্ত আইনে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থন নেই। অবশ্য রোমান আইনে দরিদ্রকে ধনীর অত্যাচার থেকে, দুর্বলকে সবলের হাত হ'তে বাঁচাবার ব্যবস্থা ছিল, রাষ্ট্রের সৃষ্টি সবাইর মঙ্গল ও প্রয়োজনের জন্যে হয়েছে বলেই স্বীকার ক'রা হয়েছিল। ইতিমধ্যে ষোড়শ শতাব্দীতে খ্রীষ্টীয় সংঘের পক্ষ থেকে বিধান জারী ক'রা হয়েছিল : সে বিধান ছিল প্রকৃতিদত্ত আইনের অনুসারী : কিন্তু সাধু টমাস এ্যাকুইনাস তাকে "ভগবানের অপ্রকাশিত আইন" ব'লে অভিহিত করেছিলেন। তার মত ছিল এই যে ভগবান প্রকৃতিকে খানিকটা স্বাধীনতা দান করেছেন—প্রকৃতির ক্রিয়াকে ধর্মতত্ত্ব দিয়ে বুঝবার চেষ্টা ক'রার কোনো সার্থকতা নেই। নিজে সরকারীভাবে সেইন্ট বা সাধু ব'লে অভিষিক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রাকৃতিক আইনকে ধর্মতত্ত্ব থেকে মুক্ত ক'রে বুদ্ধির মুক্তির সহায়তা করেছিলেন।

প্রকৃতিদত্ত ন্যায়ের বিধানকে গ্রোটিয়াস পূর্ণরূপে লৌকিক, মানবিক স্তরে প্রতিষ্ঠা করলেন। তার আগে জাঁ বোডাঁ "প্রজাতন্ত্র" নামক চিরস্মরণীয় বইয়ে লৌকিক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং রাজার ক্ষমতার পিছনে ন্যায়ের

সমর্থনের অভাব প্রতিপন্ন করেছিলেন। কিন্তু এতদিন প্রকৃতিদত্ত আইন সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত ছিল তাতে একাধারে মনুষ্যের কর্মের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের ও তার প্রকৃতিদত্ত গুণ ও অধিকারের স্বীকৃতির ব্যবস্থা ছিল। —নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল এই যুক্তিতে যে মনুষ্যপ্রকৃতিও নির্ভরযোগ্য নয়—তারও উপর খবরদারীর দরকার আছে। এখানেই গ্রোটিয়াস মানুষের চরম অধিকার ঘোষণা করলেন: মানুষের সৃষ্টিক্ষমতা ও নৈতিক বিচার শক্তির উপর নির্ভর ক'রে তারই উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন: তিনি বললেন, প্রকৃতিদত্ত আইনে মানুষের গুণ ও শক্তির স্বীকৃতি রয়েছে শুধু নয়—মানুষের প্রকৃতিই সে আইনের আধার ও আশ্রয়, কারণ, মানুষ সমাজ গঠন করতে না চাইলে এবং সুস্থ বুদ্ধিসম্মত জীবন কামনা না করলে প্রকৃতিদত্ত আইনের উৎপত্তি বা অবকাশই হ'তো না। তিনি এ'ও বললেন, ভগবানের ইচ্ছা বলে যদি কিছু থাকে তবে তা'ও প্রকৃতিদত্ত আইনের অধীন: প্রকৃতিদত্ত আইনেই ভালোমন্দ ন্যায়ান্যায় নির্ধারিত হয়েছে; ভগবানের ইচ্ছা তাকে অতিক্রম করতে পারে না। প্রকৃতিদত্ত আইনে মানুষ নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানেরও অনেক অগ্রগতি হয়েছিল। তারই সূত্র ধ'রে এবং গ্রোটিয়াসের বাস্তিক দার্শনিক সিদ্ধান্তের পরে দেকার্ট বুদ্ধির সঠিক পরিচালনা ও বৈজ্ঞানিক সত্য সন্ধানের রীতিবিষয়ে বই লিখলেন। ফ্রান্সিস বেকন—যিনি অভিজ্ঞতার সাহায্যে বিশেষ হতে সাধারণে পৌঁছুবার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন—তিনিও বললেন যে মানুষকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তির উপর জয়লাভ করবার শক্তি দেওয়াই দর্শনের উদ্দেশ্য। 'জ্ঞানই শক্তি" ব'লে যে বহুপ্রচলিত উক্তি রয়েছে সে উক্তি প্রথমে তিনিই করেছিলেন। এতদিন আরিস্তত্তোল প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলে গণ্য হতেন: এখন বস্তুবাদের প্রবর্তক ডেমোক্রিটস সে স্থান অধিকার করলেন। হবস্ ছিলেন পুরোপুরি বস্তুবাদী— প্রকৃতিদত্ত আইনের অর্থ তিনি এই করেছিলেন যে মানুষ যখন পশুর পর্যায়ে ছিল, তখনই নিতান্ত আত্মরক্ষার দায়ে সমাজ গঠন করেছিল এবং তারপর থেকে ক্রমে সভ্যতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে—এর মধ্যে কোনো অপার্থিব দার্শনিক চিন্তার ব্যাপার কিছু নেই। হবসের সঙ্গে গ্রোটিয়াসের তফাৎ ছিল শুধু এই যে গ্রোটিয়াস প্রাকৃতিক আইনের স্বয়ংক্রিয়তাতে বিশ্বাস করতেন: হবসের এরূপ কোন স্বতন্ত্র ক্রিয়াতে বিশ্বাস ছিল না:

শুধু বস্তুর বিবর্তন ও ক্রিয়াতেই তিনি বিশ্বাস করতেন। বস্তুতঃ গ্রোটিয়াসের চিন্তাতে যেটুকু ফাঁক ছিল ভিকো তা'ও পূরণ করে দিলেন। গ্রোটিয়াস প্রাকৃতিক বিধান ও মানুষের—তথা, সমাজের ও জাতির নিজস্ব কর্মবিধানকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখেছিলেন, দুইয়ের সমন্বয় করেননি। ভিকো বললেন, সভ্যতার গতিপথে মানুষের নিজস্ব বিধান ক্রমেই যুক্তি ও প্রাকৃতিকত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক বিধানের নাগাল পেতে চাইচে—অর্থাৎ মানুষ তার অভিজ্ঞতা থেকে বিবেকের সাহায্যে যে প্রাকৃতিক বিধান নির্ণয় করেচে, নিজের চিন্তায় ও কর্মে ত... সত্য করবার চেষ্টা করচে। হবস্ বলেছিলেন, যে সব বিদ্যাকে প্রমাণভিত্তিক বিজ্ঞান বলা হয় ব্যবহারিক দর্শনকেও তাদেরই মতো প্রকৃতিভিত্তিক দর্শন থেকে উদ্ভূত এবং তাদেরই মতো যুক্তিসিদ্ধ ব'লে প্রমাণ করা যেতে পারে। এই সূত্র ধ'রেই ভিকো প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষের ইতিহাস বিশ্লেষণ ক'রে প্রতিপন্ন করলেন যে ইতিহাসের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে পলে পলে সৃষ্টি ক'রে চলেচে। সে-সৃষ্টির গোড়ায় ঈশ্বরেচ্ছার ক্রিয়া তিনি অবশ্য অস্বীকার করেননি। তারপর মন্টেস্কু ও অন্য কেউ কেউ ইতিহাসের স্বয়ংক্রিয়তাকে ধর্মীয় ঐতিহ্যের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন।

ভিকোর মতবাদ আধুনিক দার্শনিক ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় বিপুল ও বহুমুখী প্রভাব বিস্তার করেচে। ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি প্রতিপদে শ্রেণীসংগ্রামও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। হেগেলের ডায়লেকটিক বা দ্বন্দসমন্বয়ে ভিকোর মতের ছাপ সুস্পষ্ট, এবং তারই সূত্র ধ'রে কার্লমার্ক্স ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার অবতারণা করলেন। অন্যদিকে ফ্রান্সে বিপ্লবের যুগে ভিকোর মতবাদের ফল হ'লো জীবনে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টিতে সহায়তা করা। রুশোর অবদানপ্রসঙ্গে সে দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা করা যাবে। আধুনিক যুগে কিন্তু ভিকোর মতবাদের অদ্ভুত পরিণতি ঘটেচে: মার্ক্সবাদ সে মতবাদ থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করেচে, আবার ফ্যাসিবাদও তা' থেকেই নিজের সংগতি দাবী করেচে। তা করবার সুযোগ তার মিললো ভিকোর এই মতে যে মানুষের ইতিহাসে সভ্যতা ও বর্বরতা চক্রগতিতে আসে: একই জাতি সভ্যতাতে উন্নীত হয়ে আবার বর্বরতাতে এলিয়ে পড়ে। অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার যে ভাবে পাশ্চাত্যের পতন হবে ব'লে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার সঙ্গে ভিকোর এ মতের বেশ খানিকটা মিল রয়েচে। ফ্যাসিবাদ এ'কেই অবলম্বন ক'রে বর্ণকৌলিন্যের ভিত্তিতে ইতালীর ও জার্মানীর প্রাধান্য

দাবী ক'রে বসলো। এখানে বলা দরকার, প্রখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক বেণিডিটো ক্রোচে ভিকোর থিয়োরীতে জাতীয়তাবাদের যুক্তিবাদী ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিলেন এবং ফ্যাসিবাদীরা তারই উপর বর্ণাভিমানের রং চড়িয়ে নিজেদের কাজে লাগালেন।

ভিকোর মতবাদকে পূর্ণতর করেছিলেন জার্মানীতে হার্ডার। হার্ডারের মত ছিল এই যে ভাষা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ ইতর প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ হয়ে পড়েছিলো। ধর্মের অভ্যুত্থানও ঘটেছিল মানুষের জানবার, বুঝবার, প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলোর কারণ খুঁজে পাবার আগ্রহ থেকে, প্রাকৃতিক নিয়মে ও আপনা থেকেই মানুষের বিবর্তন ঘটেছে অন্যদিকে ফরাসী এনলাইটেনমেন্টেও ভিকোর পরোক্ষ প্রভাব এসে পড়লো: তা' আমরা এক্ষুনি অনুধাবন করতে পারবো। কাজেই রাজনৈতিক প্রয়োজনে ভিকোর মতের যতই বিকৃতি ঘটানো হয়ে থাকুক না কেন মানবতাবাদী তথা গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় তা যথাযোগ্য স্থানলাভ করেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লব; রুশো ও ভলটেয়ার—এই দু'জনকে তারই উদ্গাতা বলা হ'য়ে থাকে। তার কারণ, এঁরা দু'জনে ছিলেন যথাক্রমে বিপ্লবের অন্তর্নিহিত দুটি ভাবধারার ধারক ও বাহক। সে দুটি ধারার সমন্বয়েই বিপ্লব পূর্ণাঙ্গ হয়েছিল। ভলটেয়ার ছিলেন বুদ্ধিঅনুসারী চিন্তার সমন্বয়ের প্রতীক ও প্রতিনিধি; রুশো চাইতেন বুদ্ধির বাঁধন কেটে কর্মের স্বাধীনতায় মেতে থাকতে। "সামাজিক চুক্তিবদ্ধতা" নামে যে মতবাদ তিনি প্রচার করেছিলেন, তার রাজনৈতিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী হ'য়েছিল। কিন্তু এখানে স্থানকাল স্মরণ রাখা দরকার। বিজ্ঞানের বহুমুখী অগ্রগতির ফলে মানুষের যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ক্রমেই অগ্রসর হ'য়ে চলেছিল। ল্যাপ্লেস বললেন, বিশ্বের মূলে একজন মহানিয়ন্তা রয়েছেন এরূপ অনুমানের কোনোই প্রয়োজন বা অবকাশ নেই। পীয়ার বেইল ডেকার্টের সংশয়বাদী চিন্তা অনুসরণ ক'রেও তাকে অতিক্রম ক'রে গিছলেন। তিনি বললেন, যুক্তিই যদি অনুসরণ করতে হবে, তাকে নিছক বিশ্বাসের সঙ্গে কোনোক্রমেই জড়িয়ে রাখা চলবে না। সুনীতি দুর্নীতিকেও নিজের জোরে দাঁড়াতে হবে, ধর্মের লেজুড় ধ'রে নয়। প্রাকৃতিক জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভব হয়েছিল প্রাকৃতিকত্ববাদের; কিন্তু এতদিন তা' নিছক প্রাকৃতিক নিয়ম অনুশীলনেই সীমাবদ্ধ ছিল। জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা' মানুষের সামগ্রিক

চিন্তাকে প্রভাবিত করতে শুরু করলে—বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতিরূপে প্রতিভাত হ'লো। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতিই সমস্ত জ্ঞান, মনোবৃত্তি ও শারীরবৃত্তির উৎসরূপে স্বীকৃতিলাভ করলো। ইংরাজ দার্শনিক লক বলেছিলেন, নিছক চিন্তা দ্বারাও জ্ঞানলাভ করা যেতে পারে। কণ্ডিলাক বললেন, চিন্তা অনুভূতিনিরপেক্ষ নয় এবং অনুভূতির জন্ম শারীরিক ক্রিয়াতে ; কাজেই মনস্তত্ত্ব শারীরবিজ্ঞানেরই অঙ্গ। ইংরাজ চিকিৎসক ডেভিড হার্টলী এই মতেরই সূত্র ধ'রে আবিষ্কার করলেন যে বাইরের পদার্থের সংস্পর্শে মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীতে যে স্পন্দন সঞ্চারিত হয় তাতেই তার মনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। অতঃপর আইডিয়ার জন্ম কীভাবে হয় সে বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণা চলল ; চেতনার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্ত হ'লো যে মানুষের মস্তিষ্ক ও অন্যান্য স্নায়ুকেন্দ্রে যে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় তাদেরই ফলে আইডিয়া জন্মলাভ করে। একেই বলে প্রমাণসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিকতাবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বস্তুবাদ এই সুরেই এসে পৌছুলো। একে অবলম্বন ক'রে লা মেত্রি ঘোষণা করলেন যে দেহ মন মিলিয়েই মানুষ : অন্যান্য প্রাণীরই মতো সে একটা যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। তিনি ছিলেন ফরাসী এনলাইটেনমেণ্ট বা জ্ঞানোদ্বোধন অন্দোলনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ—প্রগাঢ় বিদ্বান ও চিকিৎসক। তিনি প্রমাণ পেয়েছিলেন যে দ্রুত রক্তসঞ্চালনে মানুষের চিন্তার উপরও ক্রিয়া হয়ে থাকে।

প্রকৃতিভিত্তিক এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষের ইহজাগতিক ব্যাপারেও প্রভাব বিস্তার ক'রলো। অতিপ্রাকৃতিক শক্তির ভাববন্ধন থেকে মুক্ত হ'য়ে মানুষের স্বাধীনতা আত্মনিয়ন্ত্রণের সামর্থ্যে ও সংকল্পে ব্যক্ত হ'লো। রাজার ও ধর্মযাজকদের ক্ষমতা যতদিন অতিপ্রাকৃতিক শক্তির উপর মানুষের বিশ্বাসে ন্যস্ত ছিল, ততদিন সে ক্ষমতার অপব্যবহার হ'তে বাধা ছিলনা। মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা ছিল ব্যাহত : স্বেচ্ছাচারী রাজা ও অত্যাচারী শাসনযন্ত্র ধর্মের দোহাই দিয়েই শাসনপেষণ চালাতো। লকই প্রথম দাবী করেন যে শুধু থিয়োরীতে নয়—আচরণেও রাজনীতিকে ধর্ম থেকে দূরে রাখতে হবে। রাজনীতিকে তিনিই প্রথম দর্শনে রূপায়িত করেন। ইংলণ্ডে ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে যে বিপ্লব হয় তা'ও নিছক লৌকিক বিপ্লব ছিলনা : ধর্মীয় কর্তৃত্বের স্থান তাতে অস্বীকৃত হয়নি। কিন্তু তারই প্রভাবে যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও পরমতসহিষ্ণুতার দাবী উঠলো লক তাকেই

বাস্ত্রিক জীবনদর্শনের রূপ দিলেন। ফ্রান্সের কণ্ডিলাক ছিলেই তাঁরই শিষ্য; ফরাসী দেশে এ জীবনদর্শন মুক্তির বাণীরূপে গৃহীত হ'লো।

ইতিমধ্যে সেখানে দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশে মুক্তিসাধনার জমি প্রস্তুত হ'য়েছিল। সংশয়বাদকে অবলম্বন ক'রে মনটেইন, ডিডারো, লা মেত্রি. ভলটেয়ার প্রভৃতি সকলেই অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে মানুষের বিশ্বাসে আঘাত হেনেছিলেন। সংশয়বাদ গড়ে উঠেছিলো জগতের প্রকৃতি ও কারণ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাতে যে সংশয় জেগেছিলো তাকে আশ্রয় ক'রে; অবশ্য নতুন কোনো ধারণাও তখনও গ'ড়ে ওঠেনি। এ' সময়ে ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের চিন্তার আদানপ্রদান নিবিড় হয়েছিল। প্রকৃতি নিজের নিয়মে কলের মতো চলচে—নিউটনের যুগ থেকে শুরু ক'রে এই মতের সঙ্গে ধর্মীয় চিন্তার সামঞ্জস্য করা হ'য়েছিল এই ব'লে যে, সে আইনে অতিপ্রাকৃতিক শক্তি তথা ভগবানের লীলা প্রকট হয়েচে। ইংরাজ কবি টেনিসন লিখেছিলেন "জ্ঞানীরা বলচেন যে প্রাকৃতিক আইন ভগবানেরই বজ্রবাণী; তা'হলেও আমরা আনন্দ ক'রবো এই ব'লে যে সে বাণী ভগবানেরই বাণী—আর কারু নয়।" ক্রমে বিজ্ঞানের প্রভাবে দার্শনিক চিন্তাতে যে বিপ্লব ঘটলো, তাতে বিজ্ঞান ও ধর্মে যে সাময়িক সমঝোতা হয়েছিল তা' ভেঙ্গে খান খান হ'য়ে গেলো। এমনই সময়ে ফরাসী দার্শনিকেরা স্থির করলেন যে মানুষের মনের কুসংস্কার ও মিথ্যা ঐতিহ্যের বন্ধন দূর করতে হলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলো সাধারণের নিকট পৌছিয়ে দেওয়া দরকার। এই অভিপ্রায় নিয়ে তাঁরা এনসাইক্লোপেডিয়া বা বিশ্বকোষ প্রকাশ করেন। মানুষের চিন্তার বিকাশ ও প্রকাশের ইতিহাসে এ' গ্রন্থ অক্ষয় স্থান অধিকার ক'রে আছে। এতে তাঁরা ধর্মযাজকদের ও ধর্মবিশ্বাসের উপর আঘাত করেননি, নাস্তিকতাও প্রচার করেননি—শুধু পরমতসহিষ্ণুতা, জীবনের সব কিছুতে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ, সম্যক বিচারের পূর্বে মত গঠন না করবার প্রয়োজন, প্রাকৃতিক ব্যাপারের বিজ্ঞানাবিষ্কৃত কার্য-কারণ প্রচার করতে চেয়ে'ছিলেন,—বলেছিলেন যে সাধারণ লোকের ভাগ্যোন্নতিই গভর্ণমেন্টের প্রধান কর্তব্য। মানুষের ইতিহাসে তাঁরা এনসাইক্লোপেডিষ্ট নামে অমরত্ব লাভ করেচেন।

ফ্রান্সের তদানীন্তন রাজসরকার বুঝলেন, জনসাধারণের মধ্যে যদি বিজ্ঞানের জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ে তবে তাঁদের ইহলৌকিক ক্ষমতার ভিত্তি ধ্বংসে পড়বে। কারণ, ঐশ্বরিক শক্তির উপর মানুষের যে বিশ্বাসে সে ক্ষমতা নিহিত,

তাও শিথিল হ'য়ে যাবে। তাঁরা তাই এনসাইক্লোপেডিয়ার দু'খণ্ড প্রকাশিত হবার পর তার প্রকাশ বন্ধ ক'রে দিলেন। তবু ডেনিস ডিডারোর উদ্যোগে তা গোপনে ছাপা হ'য়ে বাইরে প্রচারিত হ'লো; প্যারীতেও লোকে গোপনে পড়তে লাগলো। জ্ঞানোদ্বোধন আন্দোলনের সেই জয়যাত্রা ক্রমে অপ্রতিরোধ্য হ'য়ে উঠলো। এ' জন্যেই পরে নেপোলিয়ন ব'লছিলেন: কালি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলেই আধুনিক যুগে সমাজবিপ্লব ঘটেচে।

এনলাইটেনমেণ্টের সঙ্গে সঙ্গেই তখনকার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সংগঠনের অসহিষ্ণুতা, অত্যাচার ও পা... মনোভাব প্রকট হ'য়ে উঠলো। এরই বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন ভলটেয়ার: সমসাময়িক জনসাধারণকে সচেতন করলেন এই ব'লে যে তারা যদি তখনও জেগে না ওঠে তবে বিপদ অনিবার্য: অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে সম্বল ক'রে যারা কায়েমী স্বার্থের বাসা বেধেচে, তার সর্বনাশ ঘটাবে। কার্ডিনালের পদ ধর্মযাজকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ: ভলটেয়ারকে তা' দিতে চাইলে তিনি তা' প্রত্যাখ্যান করলেন: অসংখ্য পুস্তিকা রচনা ক'রে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির জীবন্ত প্রতীক ছিলেন তিনি—ইতিহাসে মানুষের সক্রিয় ভূমিকাতে জলন্ত বিশ্বাসী। তাঁর মৃত্যুর তেরো বৎসর পর বিপ্লবী জাতীয় পরিষদ তাঁর দেহাবশেষ সাধারণ এক কবর থেকে তুলে নিয়ে জাতীয় স্মৃতিমন্দিরে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। শবাধারের উপর লিখিত হয় এই বাণী: "মানুষের মনকে তিনি অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিলেন; তিনি আমাদেরে স্বাধীনতার উপযুক্ত ক'রে তুলেছিলেন।"

কিন্তু এনলাইটেনমেণ্টের সব চাইতে প্রাণবন্ত পুরুষ—ভলটেয়ারের যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন ডেনিস ডিডারো: হলবাক রচিত "সিসটেম অব নেচার" বা "প্রকৃতির বিধান" নামক বইয়ের প্রেরণা যুগিয়েছিলেন তিনি। সে বইয়ে পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পেলো বিজ্ঞানানুসারী দার্শনিক মতবাদ: এই বিশ্ব স্বতোগতিশীল পদার্থ ভিন্ন কিছু নয়; দেহনিরপেক্ষ কোনো আত্মা নেই; দেহের সঙ্গে আত্মারও মৃত্যু হয়; আনন্দই মানবজাতির মুখ্য লক্ষ্য; মানুষকে আনন্দ ছাড়া পুণ্যচর্চা করতে বলা বৃথা; ধর্ম মানুষের উপর যে সব বাধা নিষেধ চাপিয়ে রেখেচে সে সব সরিয়ে শিক্ষার সাহায্যে তাকে নিজের ও সমাজের পাওনা বুঝে নিতে হবে; বিজ্ঞানচর্চার একমাত্র লক্ষ্য পরিবেশকে মানুষের আশাআকাঙ্খার উপযোগী ক'রে গঠন করা। প্রত্যেক মানুষকে প্রকৃতিচর্চা করতে হবে, প্রকৃতিকে বুঝতে দিতে হবে: যে সব কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস আমাদের উপর

চেপে বসে আছে, প্রাকৃতবিজ্ঞানের সাহায্যে যে সব ঘোচাতে হবে। আনন্দই মানুষের জীবনের লক্ষ্য; কাজেই শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রকৃতিদত্ত অধিকার মানুষের রয়েচে। গভর্ণমেণ্টের শাসনাধিকার সমাজ থেকেই উদ্ভূত; অতএব মানুষের মঙ্গলের জন্যে সে গভর্ণমেণ্ট অপসারিত করার অধিকারও সমাজের আছে।

এই বই বিপ্লবদর্শন বলে' অভিহিত হয়েচে; মহান ফরাসী বিপ্লবের এ' সূচনা করেছিল। মানুষের নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধেও এ' বই যুগান্তকারী চিন্তার সূচনা করলো: বল্‌লো যে, মানুষ যে সব অপরাধ করে—তার ধর্ম, তার গভর্ণমেণ্ট, তার শিক্ষা ব্যবস্থা, তার পরিবেশ তাকে তা' করতে বাধ্য করে। অতএব তাকে পুণ্যবান হ'তে বলা বৃথা। অনেক সময়ে দেখা যায়, ধনী বা প্রভাবশালী লোক যে অপরাধ ক'রে শুধু পার পেয়ে যাচ্চেনা—বাহবাও পাচ্চে, গরীব বা দুর্বল লোককে সেই একই অপরাধের দরুণ কঠোর শাস্তি দেওয়া হচ্চে। সমাজের বিধিবিধান যাকে অপরাধী ক'রে তুলেচে সে-ই অপরাধের জন্যে চরম দণ্ড পাচ্চে।

সমাজবিজ্ঞানের এই বিশ্লেষণ পড়লেই মনে হয় আমাদের যুগের পক্ষেও এ' সমভাবে সত্য। হলবাকের বইয়ের উপসংহারে ডিডারোর চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট ব'লে' মনীষীরা সিদ্ধান্ত করেচেন। তা'তে বলা হচ্চে, দার্শনিক চিন্তার যে ফসল মানবজাতি আহরণ করেচে তা' কাজে লাগতে আর দেরী নেই। তাকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হ'তে হবে: কিন্তু তাতেই নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হ'তে পারবে। সে অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে শুধু আজকের দিনে নয়—অনন্ত ভবিষ্যৎ ধ'রে। স্বয়ং প্রকৃতি আহ্বান করচে মানুষকে জেগে উঠতে, তার নিয়ম অনুসরণ করতে, আনন্দে তাদের জন্মগত অধিকার সত্য ক'রে তুল্‌তে, পুণ্য চর্চা করতে, ও পাপকে পরিহার ক'রে চলতে—কিন্তু পাপীকে ঘৃণা না করতে। আছে শুধু প্রকৃতি: আছে তার বাণীপ্রচারকগণ: তারা প্রাণ দিয়েও সে বাণী প্রচার ক'রে যাবেন; আর আছে প্রকৃতির কন্যাত্রয়—পুণ্য, বিচারশক্তি ও সত্য: এরা ছাড়া আর কোনো দেবতা নেই।

এই বিপ্লবাত্মক বাণী ফ্রান্সের জনমনে শিহরণ তুল্‌লো: অবিলম্বে তা' থেকে বিদ্রোহের বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বিপ্লব শুরু হ'য়ে যাবার পরও এ' বাণী নিজ গতিবেগে আপনাকে পূর্ণ ক'রে চল্‌লো। এনসাইক্লোপেডিষ্টদের মধ্যে তরুণতম ছিলেন কঁদোরসেৎ: তিনি রাজতন্ত্রের স্থলে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দাবী করেছিলেন, কিন্তু রাজার প্রাণদণ্ড সমর্থন করেন

নি। তারই জন্যে তার প্রাণদণ্ড হলো: কিন্তু বন্ধুদেরে সাহায্যে কোনোমতে পালিয়ে—তিনি বাকী জীবন লুকিয়ে কাটালেন এবং তারই মধ্যে লিখলেন মানবসত্তার অগ্রগতির ইতিহাস। তিনি বর্বরতাব নিম্নতম-স্তর থেকে মানুষের অগ্রগতির দশটি পর্যায় নির্দেশ করলেন। দশম পর্যায় তখনও আসেনি: কন্দোরসেং তার ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য থাকবে ব'লে অনুমান করলেন: (১) জাতিতে জাতিতে বৈষম্যের অবসান (২) শ্রেণী বৈষম্যের বিলোপ (৩) ব্যষ্টি সত্তার উন্নয়ন। বলা বাহুল্য, এ' কল্পলোক ছাড়া কিছু নয়: কিন্তু সে কল্পলোক অলীক স্বপ্নলোকও নয়। সে কল্পলোকসৃষ্টিতে মানুষের সৃষ্টিমূলক কল্পনার অফুরন্ত অবকাশ: কল্পনার প্রেরণা তার অতীতে, অতীত কীর্তিতে। তাকেই বলে রোমান্টিসিজম—অবারিত আশা আকাঙ্ক্ষাতে সৃজনী শক্তির সার্থক বিকাশ।

রুশো এ' রোমান্টিসিজমকে রূপায়িত করেন আদিমমানবসুলভ উদ্দামতার আবেদনে। তার দার্শনিক যুক্তি তিনি দেননি—ভাবপ্রবণতার সাহায্যে দুরন্ত আবেগ সৃষ্টি ক'রেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের উদ্গাতাদের মধ্যে তাই একদিক দিয়ে তিনিই সর্বাগ্রগণ্য বলে পরিচিত। যে রাষ্ট্রিক কল্পলোক তিনি রচনা করেছিলেন, প্রাচীন গ্রীসের নগররাষ্ট্রের সঙ্গে তার মিল ছিল; ব্যক্তিগত মালিকানাব্যবস্থাকে তিনি সকল অমঙ্গলের মূল ব'লে মনে করতেন: প্রকৃতি-ভিত্তিক ধর্মেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। তাঁর এ' সমস্ত মতে অবশ্য মৌলিকত্ব ছিল না: তাঁর পূর্বের ও সমসাময়িক আরও কেউ কেউ এ' ধরণের মত পোষণ ও প্রচার ক'রেছিলেন। তার আসল অবদান হ'লো সেই মতবাদ যাতে তিনি সাধারণের ইচ্ছার নিকট ব্যক্তির বাধ্যতা প্রচার ক'রেছিলেন। সাধারণের ইচ্ছা বলতে তিনি সমষ্টির ইচ্ছা বুঝেছিলেন—সকলের ইচ্ছা নয়; তাই তাতে একচ্ছত্রতার উপাদান নিহিত ছিলো। হেগেল রুশোর মতবাদের এ' ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিলেন। সার্বভৌম ইচ্ছা ও অধিকার যখন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে তখন তা' একচ্ছত্র রাজতন্ত্রে রূপ নেয়—সমষ্টিতে কেন্দ্রীভূত হ'লে পর গণতান্ত্রিক ধাঁচে নির্বাচিত এক অভিজাত গোষ্ঠীর শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এ' মতবাদের অন্তর্নিহিত বিপদ প্রকাশ পেলো তখনই যখন রবেসপীয়ারের নেতৃত্বে বিপ্লবী পরিষদ বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করলো—দাঁতন প্রভৃতি বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠগণ বিপ্লবের নামে বিভীষিকা সৃষ্টির প্রতিবাদ ক'রে বিপ্লবের যূপকাষ্ঠে প্রাণ দিলেন। একচ্ছত্র ক্ষমতারক্ষার গরজে রবেসপীয়ার নতুন ক'রে ধর্মের আশ্রয়ও নিয়েছিলেন। "সাধারণতন্ত্রের প্রজাতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে ধর্মীয় ও

নৈতিক ভাবের সম্বন্ধ” ব্যাখ্যা ক’রে এক ভাষণ দিয়েছিলেন। সে ভাষণ খ্যাতি লাভ করে ; তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে এক উৎসবেরও অনুষ্ঠান করেন।

কিন্তু এই প্রতিক্রিয়া স্থায়ী হ’লো না। রবেসপিয়ারকেও প্রাণ দিয়ে নিজ বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য দিতে হ’লো। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা ছড়িয়ে প’ড়লো সারা ইউরোপে। গ্যয়টে প্রমুখ মহাকবি ও দার্শনিকগণ তাকে অভিনন্দন জানালেন। বিপ্লবের ফলে কৃষকেরা জমিদারদের দাসত্বমুক্ত হয়েছিলো, তাদেরে নিয়েই গঠিত হ’লো বিপ্লবীবাহিনী ; নেপোলিয়নের নেতৃত্বে সে বাহিনী ইউরোপের দেশের পর দেশ অধিকার করলে, সামন্ততন্ত্রের বন্ধন থেকে তাদের জনগণকে মুক্তি দিলে। ইতালীকে অষ্ট্রিয়ার শাসনের নাগপাশ হ’তে মুক্ত করলে, জার্মানীর তিনশত ষাটটি সামন্ত রাষ্ট্রকে আধুনিক সমাজকাঠামোর আওতায় এনে একত্র গেঁথে জার্মান রাষ্ট্রকে রূপ দিলে। একমাত্র প্রুশিয়াতে সামন্ততন্ত্র তখনও ঘাটি গেড়ে ছিল ; কিন্তু অচিরে প্রতিবেশীদেশ পোলাণ্ড ও ওয়েষ্টফেলিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক’রে সেখানকার কৃষিপ্রথাতেও সংস্কার প্রবর্তিত হলো—এমন কি ওয়াটার্লুতে নেপোলিয়নের চরম পরাজয়ের পরও ফরাসী বিপ্লবের চিন্তাধারা নিজ প্রভাবে অপ্রতিহত রইলো। সমুদ্রবেষ্টিত ইংলণ্ডে যদিও বিপ্লবের প্রত্যক্ষ আঘাত লাগলোনা, প্রথমত চার্টিষ্ট আন্দোলনে—অর্থাৎ সার্বজনীন ভোটাধিকার দাবী ক’রে যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে—এবং তারপর রিফর্ম আইনে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার ছাপ সুস্পষ্ট। ইংলণ্ডের কবিগণ রুশোর রোমান্টিসিজমে প্রভাবিত হলেন, দার্শনিকগণ বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিকতত্ত্ববাদকে স্বীকার করলেন।

কোড নেপোলিয়ন বা নেপোলিয়নপ্রবর্তিত রাষ্ট্রবিধি বৈপ্লবিক চিন্তাধারার চিরস্থায়ী স্বাক্ষর বহন করচে। সেই প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিক বিধিবিধান আইনের স্বীকৃতি লাভ করলো। নেপোলিয়ন যে শুধু ইউরোপে সামন্ত প্রথা ভেঙ্গে দিলেন তা নয়, সামাজিক সাম্য ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতাকে ভিত্তি ক’রে রাজাপুরোহিতের প্রাধান্যমুক্ত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংস্থা স্থাপন করলেন। বহু শতাব্দী বেয়ে যে দার্শনিক চিন্তাধারা মানব-জাতির মুক্তির নিশানা গ’ড়ে তুলেছিলো তা’ বাস্তবে রূপায়িত হ’লো। সেই হ’লো মানবতাবাদের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ফরাসী বিপ্লবধ্বজাতে লিখিত তিনটি শব্দ মানবজাতি চিরদিন প্রত্যক্ষ করে চলেচে—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা॥

তবু মনে রাখা দরকার, ফরাসী বিপ্লবের সামগ্রিক অবদান কী হয়েচে তা উপলব্ধি না ক’রলে পর তার সামগ্রিক ঐতিহাসিক তাৎপর্যও হৃদয়ঙ্গম করা যাবে

না। এ' বিপ্লবের ফলে দাসেরা মুক্তি পেলে, ইহুদীদেরে যে অবমাননাকর জীবনযাপন করতে হ'তো তারও অবসান ঘটলো। কিন্তু শৃঙ্খলমুক্ত দাসেরা জমির স্বত্ব পেলেনা—এমন কি, দাস হিসেবে যে জমি তারা চাষ করতে পেতো তা'ও তাদের হস্তচ্যুত হ'লো। সামন্ত শাসনের আমলে দেশের বিভিন্ন স্থানের নিজস্ব যে ঐতিহ্যকে বড়ো মনে করা হ'তো, সে সব ঘুচিয়ে দিয়ে সারা দেশের এক শাসন ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলা হ'লো: তাতে বিভিন্ন বিভাগ থাকলো। বিপ্লবের পর প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে সামরিক বাহিনীতে যোগদান আবশ্যিক করা হ'লো: সে বাহিনীরই সাহায্যে পরে নেপোলিয়ন সম্রাট হ'তে পেরেছিলেন। তবু এ বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব: এর দ্বারাই সাম্যের প্রতিষ্ঠা হ'লো, নারীর সমানাধিকারের দাবী উঠলো এবং যুক্তিহীন আচারবিচার, অন্যায় সুযোগ-সুবিধা এবং শ্রেণী বৈষম্যের আপাতবিলুপ্তি ঘটলো। সেই প্রথম গরীব ঘরের ছেলেরাও মানুষ হ'বার, বড়ো হ'বার সুযোগ পেলে: যে যে অবস্থায়ই বা যে পদেই থাকুকনা কেন, তার পদোন্নতির ও মর্যাদালাভের পথ উন্মুক্ত হ'লো। নতুন নতুন ব্যবসায় ও বৃত্তির সৃষ্টি হ'লো—এমন কি, পোষাক, আদবকায়দা, দৈনন্দিন রীতি ও অভ্যাসেও পরিবর্তন দেখা দিলো। নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, নতুন ভাবধাবণার উৎপত্তি, নতুন রীতিনীতির প্রবর্তনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হ'লো। জীবনের সবক্ষেত্রে অতীতকে অগ্রাহ্য করার ঝোঁক দেখা দিলে। তাই যে সবথা ভালো হয়েছিল তা নয়: কিন্তু তাতে মানুষের ক্ষমতাতে সীমাহীন আস্থা প্রকাশ পেলো, মানুষের উদ্যম উচ্চস্তরে উন্নীত হ'লো। কিছুই যেন আর মানুষের অসাধ্য রইলো না। তাতেই সূচনা হ'লো মানুষের সে বিরাট কীর্তির—যার ফলে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের ঐতিহাসিক "সাম্যবাদী ইস্তাহারে" পর্যন্ত বলা হয়েচে: "বুর্জোয়া শ্রেণীই প্রথম দেখিয়েচে মানুষের কর্মোদ্যম কী অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। এদের বিস্ময়কর কীর্তি মিশরের পিরামিড, প্রাচীন রোমের পয়:প্রণালী এবং গথিক গীর্জার মহিমাকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে: এরা যে সব অভিযান পরিচালনা করেচে তার নিকট অতীতকালের জাতিদের দেশ হতে দেশান্তরে গমনের ও ধর্মযুদ্ধ পরিচালনার গৌরব ম্লান হয়ে পড়েচে।" ফরাসী বিপ্লবে সেই মানবীয় শক্তির বিরাট উদ্বোধন: তারই প্রেরণায় দেশে দেশে জনগণের নব জাগরণ। মানুষের এই আত্মোদ্বোধনে রচিত হ'লো মানবতাবাদের জয়যাত্রার পথ।

বিপ্লবোত্তর ভাববিবর্তন ঃ
উদারনৈতিকতা ও মানবতাবাদ

রুশোর রোমান্টিক ভাবধারায় আপ্লুত জীবনদর্শন যুক্তির লৌহকঠিন বাঁধনে বাঁধা থাকবে, এ' সম্ভব ছিল না। তা' রইলোও না, তারই প্রভাবে বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে মানুষের মন আকৃষ্ট হ'লো অতীত ও অলৌকিকের দিকে : সাহিত্য-সৃষ্টিতেও কিছুটা সে প্রভাব প'ড়লো। দার্শনিক ভাবধারায়ও ভাবপ্রবণতা স্থান পেলো বুদ্ধির উপর। ফলে মানুষ আর শুধু যুক্তির উপর নির্ভরশীল রইলোনা : যুক্তির অতীত কোনো কিছু আছে ব'লে তার বিশ্বাস জাগলো এবং সে অতিপ্রাকৃতিকত্বে আকৃষ্ট হ'লো।

তবু রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অত বড়ো শক্তিধর বিপ্লবকে বরবাদ ক'রে দেওয়া সম্ভব ছিল না। নেপোলিয়নের পতন ও রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতে যে নিরাপত্তাবোধের অভাব ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হ'লো তাতে মানুষ পুনরায় ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে চাইলো। এতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই ছিল না। যুগ যুগ ধ'রে মানুষ ধর্মে আস্থা স্থাপন ক'রে এসেচে এবং ধর্মকে ভিত্তি ক'রেই সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ গ'ড়ে তুলেচে। শুধু মানুষের জীবনকে কেন্দ্র ক'রে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গ'ড়ে তুলতে সে অভ্যস্ত ছিল না এবং ধর্মের অভাবে নৈতিক নৈরাজ্য ও সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে ব'লে সে স্বভাবতই শংকিত ছিল। বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে তাই দেখা গেলো, সাধারণ মানুষের মনে বিজ্ঞানানুসারী চিন্তাধারা বইয়ে দেওয়া যাবে ধর্মকে অস্বীকার ক'রে নয়—গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে এবং তার অর্থই, পুরোহিততন্ত্রকে তার পূর্ব প্রাধান্য থেকে অপসারিত করতে হবে। ফেলিসিতে দ্য লেমেনেই ছিলেন সেই শ্রেণীর পাদ্রীদের উত্তরসাধক যাঁরা বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানালেন : বললেন, মানুষের পরস্পরের ভিতর অধিকারের সাম্য স্থাপিত হ'লে পর সে এক ধারে দৈহিক মুক্তি, নৈতিক মুক্তি ও লোকায়ত মুক্তি লাভ করবে। এই মতকে বর্তমান যুগের খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্রের পূর্বাভাষ বলা যেতে পারে। লেমেনেই যাজকপদ থেকে অপসৃত হলেন, মৃত্যুকালেও আপোষ করলেন না। তাঁর জীবন ও মৃত্যু মানুষের

বহুযুগ সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নিকট ধর্মীয় একাধিপত্যের পরাজয়স্বীকৃতির প্রতীক হ'য়ে আছে।

সাটুব্রায়া সাহিত্য রচনা করলেন ভাবাবেগ সম্বল ক'রে—খৃষ্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে বই লিখলেন : নৈরাশ্যক্ষুব্ধ জনগণ তাই সাদরে গ্রহণ করলো। লামার্তিন বিপ্লবের জয়গাথাকে নাট্যে রূপান্তরিত করেছিলেন তারপর এলেন ভিক্টর হুগো : আমাদের দেশে তাঁর পরিচয় বিশেষ ক'রে দেবার প্রয়োজন নেই। তাঁর লেখাতে রোমান্টিক ভাব প্রচুর রয়েচে ; কিন্তু কঠোরতম বাস্তব থেকে সে লেখার উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল। সেই বাস্তবকে তিনি মানবতায় রসান্বিত করেচেন. জীবনের পূর্ণ উপলব্ধিতে রোমান্টিকবাদ সেখানে সত্য হয়েচে। মিচেলে ইতিহাসকে উদ্ঘাটিত করলেন এক মহানাট্যরূপে. অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্য থেকে মানবসত্তা ফুটে বেরুচ্চে : সে মানবসত্তা শুধু মানবসমষ্টি নয়,—মহামানবের উপরও তা' নির্ভর ক'রে নেই— সে নিজেকে নিজে সৃষ্টি ক'রে, বিকশিত ক'রে চলেচে। মিচেলে দেখালেন. সমাজের উচ্চশ্রেণী পুনরায় অতিপ্রাকৃতিক শক্তির দোহাই পাড়্চে—বুদ্ধিজীবিরা পর্যন্ত ছেদো ভাবপ্রবণতার মাধ্যমে দূরাতীতের জাবর কাটতে শুরু করেচে। অসমসমাজগঠনে মানুষের জীবন দুর্বহ হ'য়ে উঠ্‌লো, শ্রেণী-সামঞ্জস্যের আশা লুপ্তপ্রায় হ'লো ; মিচেলের রোমান্টিক আহ্বান বিপ্লবকে সত্য করার, পূর্ণ করার আহ্বান।

রোমান্টিক ভাবধারায় ফ্রান্সে অনুপম সাহিত্যসৃষ্টি হ'লো ; কিন্তু এনলাইটেনমেণ্ট ও বিপ্লবের বুনিয়াদ শক্ত হওয়াতে সেখানে বুদ্ধিদীপ্ত জীবনদর্শনের কোনো ব্যত্যয় ঘটলোনা। রোমান্টিসিজমে রয়েছে মানুষের একদিকে প্রকৃতির মধ্যে পেগেনদের মতো গা ঢেলে দেবার নেশা ; অন্যদিকে দুঃসাহসিক জীবনযাত্রায় নিজের কীর্তিরচনার প্রেরণা। এ'দুইয়ের মধ্যপন্থা হিসাবে রয়েচে এক দার্শনিক চিন্তাক্রম : তা'এই যে, মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ ব্যতীত কিছু নয় ; অতএব তার সৃজনশীলতা প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারে না। বিজ্ঞানের সাহায্যে সে জানতে পেরেছিল যে সে প্রকৃতির রহস্য জেনে তাকে কাজে লাগাতে এবং এম্‌নি ক'রে প্রকৃতিকে জয় করতে পারে। জার্মানীতে একাধারে সৃষ্টিশীল রোমান্টিসিজমের দার্শনিক-সাংস্কৃতিক স্ফুরণ এবং অবাস্তব রোমান্টিসিজমের রাজনৈতিক উন্মার্গগামিতা প্রত্যক্ষ হয়েচে।

উভয় ধারারই পূর্বেতিহাসও রয়েচে। পূর্ববর্তী সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক

নেতৃবর্গ মানুষের আত্ম-সম্পূর্ণতা লাভের সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন। প্রখ্যাত দার্শনিক প্যাসকেলও মানুষের চেতনার অসীম গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন তিনিই ক'রেছিলেন এই স্মরণীয় উক্তি : "চিন্তাশক্তিতেই আমাদের সর্বোত্তম মর্যাদা। চিন্তাশক্তিই মানুষকে মানুষ করেছে। মানুষ উলুখাগড়া মাত্র : তা'ও প্রকৃতির সব চাইতে দুবল উলুখাগড়া। কিন্তু সে উলুখাগড়া চিন্তা করতে জানে—সেইখানেই তার বিশেষত্ব। মানুষকে ধ্বংস করার জন্য বিশ্বের অস্ত্র ধারণের কোনো প্রয়োজন নেই, বাতাসের এক ফুৎকার, এক ফোঁটা জলই তাকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু বিশ্ব যদি তাকে ধ্বংস করেও, তবু সে তার হত্যাকারীর চেয়ে মহত্তর : কারণ তাকে যে হত্যা করা হচ্ছে, এ কথা তার অজানা থাকে না—এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ সজ্ঞান ও সচেতন।"

কিন্তু রোমান্টিসিজমের বাস্তববিরোধী ও প্রকৃতিসর্বস্ব ধারা ইতালীতে ও জার্মানীতে সাময়িক চিত্তবিক্ষেপ সৃষ্টি করেছিলো। সাহিত্যেও সেই চপল মতিত্বের ছাপ পড়লো, কিন্তু অচিরে উভয় দেশে তার প্রতিক্রিয়াও ঘটলো প্রখ্যাত দার্শনিক লাইবনিৎস্ যুক্তির মাধ্যমে ধর্মীয় চিন্তাধারা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। তাঁর সাংস্কৃতিক আবেদন সমগ্র ইউরোপকে প্রভাবিত করেছিলো, তাতে জার্মানীর নতুন ক'রে আত্মোদ্বোধনের সাহায্য হ'লো। প্রাচীন চিন্তাধারা অনুসরণ ক'রেও তাতে যুক্তিবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন লেসিং প্রভৃতি সাহিত্যস্রষ্টাগণ। তারপর ফ্রেডারিক দি গ্রেটের উদ্যোগে ও আনুকূল্যে তারই রাজসভায় ইউরোপের নানাদেশ থেকে গুণীসমাবেশ ঘটলো। ভলটেয়ারও কিছুদিন সেখানে যাপন করেছিলেন, লা মেত্রি ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড থেকে বিতাড়িত হ'য়ে আশ্রয় পেয়েছিলেন। ফ্রেডারিক বলেছিলেন, তিনি জার্মান সাহিত্যের স্বর্ণযুগের পথ প্রস্তুত ক'রে গেলেন। বস্তুতঃ তিনিই জার্মানীতে রেনেসাঁর আলো প্রবেশের রাস্তা খুলে দিয়েছিলেন।

সেই পথ ধ'রে এলেন গ্যয়টে, শীলার, এলেন দার্শনিক-ঐতিহাসিক হার্ডার। তাঁর কথা পূর্বেও বলা হয়েছে। হার্ডার দেখিয়েছিলেন, ইতিহাস মানুষের আত্ম-সৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়। মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ, তার সর্বতোমুখী বিকাশ-ধারা প্রকৃতিরই ক্রিয়া। এ' মতবাদ কাণ্টের মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ : কাণ্টের মতে মানুষ তার ক্রমবিকাশমান ও বুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাশক্তির দ্বারা প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে চলেছে এবং তাইতে তার বিকাশ ঘটছে। গ্যয়টে ও

শীলার ছিলেন পরস্পর বন্ধু ও একই ভাবের ভাবুক। গ্যয়টে প্রথমে খুবই রোমান্টিক ভাবাপন্ন ছিলেন, ষোড়শ শতাব্দীর দুরন্তপ্রকৃতি নাইট—তথা ইতিহাসের তথাকথিত বীরদের স্তবগাথা রচনা ক'রে টিউটন জাতির জাত্যাভিমান জাগাতেও সাহায্য করেছিলেন। 'বসুন্ধরা বীরভোগ্যা' নীতি তাঁর রচনায় সমর্থন পেলো: এমন কি অমর রচনা 'ফাউষ্ট'য়ের প্রথমভাগে তিনি জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ ক'রে স্বভাবপ্রবৃত্তির তৃপ্তিতে জীবনকে ভাসিয়ে দেবার প্রবণতা প্রকাশ করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেলো 'ফাউষ্ট'য়ের দ্বিতীয় ভাগে:— সেখানে মানুষের জীবন সমসাময়িক কালেরই প্রতিবিম্ব—অভিজ্ঞতাতে সমৃদ্ধ, ইতিহাসে নিজ স্থানের ও ঈশ্বর প্রতি নিজ কর্তব্যের উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত, সেই ফাউষ্ট রোমান্স ও বাস্তব, ভাবপ্রবণতা ও নীরস্তব-বিচার বুদ্ধি, বিশ্বাস ও যুক্তি, বিবেক ও ভাবাবেগ, সরল-সহজ মন ও সন্দেহ-প্রবণতার মধ্যে সংগ্রামরত। সে দেখছে সে যাকে বেঁচে থাকা ভেবেছিল তা' বেঁচে থাকা নয়: সে কোনোদিন বাঁচে নি, আজ সে নিজ আত্মার মূল্যে জীবনের তৃপ্তি বাঞ্ছা ক'রছে। এই এক সমগ্র জীবন দর্শন—ক্রমসম্প্রসারিত চিন্তাধারার অভিজ্ঞতানিয়ন্ত্রিত বিবর্তন। রেনেসার সময় থেকে শুরু ক'রে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপ আর এহেন জীবনলেখা লাভ করেনি। তাই 'ফাউষ্ট'কে বলা হ'য়ে থাকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানবতাবাদের এক স্বর্গীয় স্বাক্ষর।

সেই জীবন গ্যয়টের নিজেরই জীবন—নীতি-তত্ত্বের সঙ্গে সেখানে সৌন্দর্যবোধের সমন্বয় ঘটেছে: রোমান্টিসিজমের সঙ্গে প্রাচীন চিন্তাধারার সংঘাত দূর হয়েছে এই নির্দেশে যে শিল্প ও প্রকৃতি সমার্থক নয়: শুধু প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেই জীবনকে লাভ করা যায় না—কাজেই শিল্পের নিয়ম মেনে চলা চাই এবং তা' মানলে পরই আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা পেতে পারি।

কিন্তু সেই যে প্রথম জীবনে জাতীয় বীরদের কাহিনী নিয়ে রোমান্টিক সাহিত্য সৃষ্টি ক'রেছিলেন গ্যয়টে, হার্ডার ঐতিহাসিক বিবর্তন বোঝাতে গিয়ে লোকাত্মার কথা বলেছিলেন—ফরাসী বিপ্লবের গভীর ও ব্যাপক প্রভাবে তাই জাতীয়তাবাদী প্রেরণাতে পরিণত হ'লো এবং রুশো যে আদিম মানবের ভাবাবেগ ও অনুভূতির আবেদন জানিয়েছিলেন, তারই সঙ্গে মিশে জার্মান জাতিকে নিজস্ব এক 'কুলটুর' বা সংস্কৃতি আবিষ্কারে প্রবৃত্ত করালো। ফিক্‌টে ছিলেন এই রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের দার্শনিক। জার্মান জাতিকে সম্বোধন

ক'রে তিনি বল্‌লেন, প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে তাদের নিজস্ব যোগাযোগ রয়েচে—তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতা তাদের জন্যে নয়। জ্যান নামে এক ব্যক্তি প্রচার করলেন, গ্রীক ও জার্মানগণ হ'লো মনুষ্যজাতির মধ্যে দুই পবিত্র জাতি। অন্যে পরে কা কথা: স্বয়ং হেগেল এই দুই জাতিকে ভগবানের অবতার ব'লে প্রমাণ করতে চাইলেন। জাতীয়তাবাদ এক বিশেষ সাংস্কৃতিক জাত্যাভিমানের রূপ নিলে। উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক চিন্তাধারায়ও সে রূপ নেবার সহায়তা হ'লো এ' ভাবে যে ডেকার্টের সময় থেকে মানুষ ও জগৎ সম্বন্ধে যে প্রকৃতিভিত্তিক ধারণা প্রচলিত ছিল, লক ও হিউমের পরীক্ষামূলক দর্শনের প্রভাবে তার ভিত্তি শিথিল হ'য়ে গেলো এবং প্রত্যেকেই নিজের মনগড়া মত হাজির ক'রার সুযোগ পেলে। বিশ্বের এক অখণ্ড সত্তা রয়েচে; সকল খণ্ডসত্তার উপর সার্বভৌম সে সত্তা—এই দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে হেগেল রাষ্ট্রের অধ্যাত্মসত্তা নিরূপণ করলেন এবং শোপেনহাউয়ার যে ইচ্ছাশক্তির সার্বভৌমত্ব প্রচার ক'রেছিলেন তার সঙ্গে মিশে সে চিন্তাধারা জার্মান জাতীয়তাবাদকে প্রখর ক'রে তুললো। এমন কি প্রখ্যাত সুরকার রিচার্ড ওয়াগনার প্রথমে শিল্পের সার্বজনীনতার উপাসক ছিলেন, শিল্পরাজ্যে দেশগত বা ভাষাগত প্রভেদ থাকতে পারে ব'লেও তিনি বিশ্বাস করতেন না, পরে তিনিই জার্মান জাতীয়তাবাদের উগ্র ভক্ত হ'য়ে পড়েন: বুদ্ধির মুক্তি ও অগ্রগতির স্থলে শোপেনহাউয়ার-ঘোষিত ইচ্ছাশক্তি তথা অন্ধ, দুরন্ত আবেগকেই সব কিছুর হেতুরূপে নির্দেশ করেন। এহেন জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে গ্যেটে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন—এমন কি নীটশেও বলেছিলেন, জাতীয়তাবাদ একটা ব্যারাম ও সংস্কৃতিবিরোধী পাগলামী ছাড়া কিছু নয়। তার বিষময় ফল ফলতেও দেরী হলো না: নাৎসীবাদ ও হিটলার জগতের পক্ষে অভিশাপরূপে আবির্ভূত হ'লো। বল্গাহারা রোমান্টিসিজমের এই হ'লো শেষ পরিণতি।

ইংলণ্ডে রোমান্টিক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিলো কাব্যে ও সাহিত্যে: কিন্তু তা পেয়েছিলো তার নিজস্ব ঐতিহ্য থেকেই: ইতালী ও জার্মানীতে তার প্রভাব পড়েছিলো। তা থেকে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলতার বিশেষ সহায়তা হ'য়েছিল বলা চলে না। শেকসপীয়ারের কাব্যধারা প্রবাহিত হ'য়েছিল তার আপন খাতে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে শেকসপীয়ার যে অনবদ্য ঐতিহাসিক

নাটকরাজি রচনা করেছিলেন তাদেরই রোমান্টিক প্রেরণা জাতীয়তার উদ্দীপনা জাগাতে সাহায্য করেছিল ঃ বস্তুত কেউ কেউ তাদেরেই সে উদ্দীপনার প্রধান উৎস ব'লে মনে ক'রে থাকেন। দেশের প্রাকৃতিক পটভূমি ও বিশিষ্ট জীবন-যাপন-প্রণালীই সে জাতীয়তার মর্মকথা। তারই অনুপ্রাণনায় জার্মানীতে গ্যয়টে ও শীলার ও ফরাসী দেশে হুগো জাতীয়তাবাদকে রোমান্টিক ধারাতে উদ্দীপ্ত করেন। ওয়াল্টার স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসেও তার সহায়তা হয়েছিল। (বাংলা দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেরও একই রকম ভূমিকা রয়েচে)। জাতীয় চেতনার বশে জাগলো অতীতের কীর্তি স্মরণ করার, অতীতের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপক উদ্যম। 'তে জাতির সর্বস্তরে জাগলো আলোড়ন: গ্রামের নিরক্ষর কৃষকের লোকসংগীতও জাতীয়তার অবদান রূপে গৃহীত হলো। রুশো এই জাতীয়তাবাদকেই কল্পনার সাহায্যে সঞ্জীবিত ক'রে তুলেছিলেন। জাতীয়তার মূল নিহিত জাতির গভীরতম সত্তাতে—এক ভাষা, এক বাসভূমি, এক জীবনপ্রণালী, এক কর্মব্রতে—এক লক্ষ্যে ও অভিপ্রায়ে। তাই দেখা গেছে, জাতীয়তা ধর্মের পর্যায়ে পৌছেচে ঃ মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গেছে। কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ "সাম্যবাদীর ইস্তাহারে" বলেছিলেন : সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও সর্বহারাদের আধিপত্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে জাতিতে জাতিতে বিভেদ দূর হ'য়ে যাবে। কার্যত এ' পর্যন্ত জাতীয়তার শক্তি হ্রাস হয়নি ঃ এমন কি সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রী দেশগুলিও তাদের জাতীয় সত্তা অক্ষুণ্ণ রেখেচে। তাই বলতে হয়, জাতীয়তাবাদ নিজেকে মানবজাতির ইতিহাসের প্রকৃষ্ট অবলম্বন ব'লে প্রমাণিত করেচে। শ্রেণীবিশেষ, দলবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ যে তাকে নিজের সঙ্গে সমার্থক ক'রে তার বিকৃতি ঘটিয়েচে, তাতে তার বিরাট ঐতিহাসিক ভূমিকার কোনো ব্যত্যয় ঘটাতে পারেনি।

মিলটন নিজে পিউরিটান সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান হ'য়েও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। তবে তাঁর মত ছিল এই যে গণতন্ত্র রক্ষার ভার নির্বাচিত জ্ঞানীগুণীদের হাতেই দেওয়া উচিত। এই মতই পরে রুশোও প্রচার করেছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ ও সাউদীকে প্রকৃতির কবি বলা হয়। ফরাসী বিপ্লবের কালে তাঁদের বয়স অল্প ছিল এবং বিপ্লবকে তাঁরা অভিনন্দিতও করেছিলেন; কিন্তু বিলুপ্ত অতীতের প্রতি আকর্ষণ ও বন্নাহারা জীবনের মোহ

মিলে তাঁদেরে যুক্তিবাদী বিপ্লবের বিরোধী ক'রে তোলে। বার্ক যখন বললেন যে অতীত ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ, অতীত অভিজ্ঞতার অবদান এবং এদের ধারক ও বাহক হ'তে পারে এমন বংশানুক্রমিক শাসকশ্রেণী ব্যতীত সুশাসন সম্ভব নয়, তখন এই কবিগণ তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজনৈতিক বিবর্তন এ' সব মতবাদে বিশেষ ব্যাহত হয়নি। বাইরণ ও শেলী প্রকৃতির কবি ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতি বলতে তাঁরা বুঝতেন মুক্ত-বুদ্ধির ক্রিয়া। তাই তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে অবিরত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের সত্তাকে সৃষ্টি ক'রে চলচে। তাঁদের রোমান্টিসিজম বিপ্লবেরই অনুসারী হ'লো। কিন্তু মনে রাখতে হবে তাঁরা কবি ছিলেন, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবের নিশানা খোঁজবার দায় তাঁদের ছিল না। বিদ্রোহের পথে মানুষকে তাঁরা জয়যুক্ত দেখতে চেয়েছিলেন। তাই কখনও তাঁরা অজানার অভিসারী, কখনও বা নিরাশায় বেদনাবিধুর। কিন্তু মানুষের জীবনটাই যে একটা দুঃসাহসিক রোমান্টিক অভিযান এ' কথা বলতে তাঁরা কখনও ভোলেননি।

রোমান্টিসিজম যদি হয় যুক্তিঅনুসারী, স্বাধীনতা যখন হয় নিয়মের অনুগামী, ইচ্ছাশক্তি যখন বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখনই তারা মানুষকে বলবান ক'রে তোলে—নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার শক্তি দান করে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে উদারনৈতিক মতবাদ জোরদার হ'য়ে উঠেছিল, তার বুনিয়াদ রচনা ক'রেছিল এই যুক্তিসংহত রোমান্টিসিজম, এবং অন্যদিকে এই মুক্তবুদ্ধির অভিযান জ্ঞানবিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য অগ্রগতিতে মানবপ্রাণের সৃজনশীলতা ফুটিয়ে তুললে। একে বলা হয় আধুনিককালীন উদারনৈতিকতা—এবং আধুনিক গণতন্ত্রই এর প্রাণ। জ্ঞানার্জনে যুক্তির প্রয়োগপথেই এর উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু মানবসভ্যতার বিবর্তনে এর বিশিষ্ট ধারাও লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক মানুষের নৈতিক সত্তা রয়েচে, তাকেই আত্মা বলে: তাইতে সব মানুষ এক সার্বজনীন নৈতিক সংস্থার অধীন ও পরস্পর সমান। মানুষের পারস্পারিক বাধ্যবাধকতার এই থিয়োরীই উদারনৈতিকতার ভিত্তি; এবং প্রাচীন গ্রীসীয় চিন্তাধারায়, রোমান আইনে এবং মধ্যযুগের ধর্মীয় সাহিত্যে এর ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই থিয়োরী খ্রীষ্টীয় ভাবধারাতেও স্থান লাভ করেছিল; তবে বলা বাহুল্য মানুষ সেখানে স্বরাটরূপে কল্পিত হয়নি—সেখানে

তার দ্বারা শুধু ভগবানের ইচ্ছা পূরণ হ'য়ে থাকে বলা হ'য়েছে। কিন্তু মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় চিন্তাধারায়ও যুক্তির প্রভাব এসে প'ড়লো এবং তারই অনুসরণে ক্রমে উদারনৈতিক মতবাদের উদ্ভব হ'লো। পোপের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেই এ' মতবাদের সূত্রপাত হ'য়। রিফর্মেশনের কালে প্রশ্ন উঠলো ধর্মীয়—তথা বিবেকের স্বাধীনতার জন্য রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা চলে কিনা। এ' প্রশ্নের মূলে ছিল পোপের বিরুদ্ধে জার্মানীর রাজাদের বিদ্রোহ ও প্রজাদের অধিকারের উপর তার প্রতিক্রিয়া। লুথার ও ক্যালভিন উভয়েই এ' প্রশ্ন চেপে দিয়েছিলেন; কিন্তু পরবর্তীকালে ফ্রান্সের কার্ডিনাল রিশলু নিজে ক্যাথোলিক হওয়া সত্ত্বেও পোপের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জার্মানীর প্রোটেষ্টাণ্ট রাজাদেরে সমর্থন করেছিলেন। রিশলুর দ্বারাই পোপের প্রাধান্যের পরিবর্তে রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতাপ্রতিষ্ঠার নীতির সূত্রপাত হয়। সামন্ত রাজাদের সুযোগসুবিধা অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁদের ক্ষমতা হ্রাস করা ছিল সে নীতির অঙ্গ। তাঁদের স্থলে উদীয়মান বণিক ও মহাজন শ্রেণী রাজানুগ্রহ লাভ করলো এবং রাজার কোষাগারে অর্থ দান করতে লাগলো। এ'ভাবে ক্ষমতা আর রাজাদের মধ্যে আবদ্ধ রইলো না: অন্য শ্রেণীতে তার বিস্তার শুরু হ'লো। এরই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ প্রজাদের—তথা সকল জনগণের অধিকারের দাবী উঠলো। তার আগেই কথা উঠেছিল যে সংখ্যালঘিষ্ঠের মতকেও চেপে রাখার কোনো অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠের নেই; রাজার ক্ষমতাকে পোপের দান ব'লে মনে করবার কোনো কারণও নেই; এবং রাজারও একচ্ছত্র ক্ষমতার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। এ'কথা সর্বপ্রথম যিনি বলেছিলেন তিনি নিজেই পাদ্রী ছিলেন, নাম ছিল তাঁর উইলিয়ম,—ওক্কাম নামে এক জায়গায় ছিল তাঁর নিবাস, সে কারণে তিনি ওক্কাম বলেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর আগে ইতালীর অন্তর্গত পাডুয়া নিবাসী মার্সেগলিও বলেছিলেন, ধর্মীয় বিষয় বিচার ও ধর্মীয় সংস্থা পরিচালনার জন্য যাজক ও জনসাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এক সাধারণ পরিষদ থাকা উচিত। ওক্কাম এ'মত গ্রহণ করেন এবং যথাসময়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়। সাধারণ পরিষদ থেকেই আধুনিক পার্লামেণ্টের উদ্ভব হয়েছে বললে কিছুমাত্র মিথ্যা বলা হবে না। ক্রমে এ' ধরেই নেওয়া হ'লো যে সাধারণ পরিষদ ইচ্ছা ক'রলে পোপকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। ১৫৭২ সালের আগষ্ট মাসে প্যারীতে এক নৃশংস

ব্যাপার ঘটে। রাজকুমার হেনরী অব নাভারে ছিলেন প্রোটেষ্টাণ্ট ; ফ্রান্সের রাজা নবম চার্লসের ভগিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহে অনেক প্রোটেষ্টাণ্ট যোগ দিতে এসেছিলেন। ফ্রান্সে প্রোটেষ্টাণ্টদেরে হিউগেন্ট বলা হ'তো। রাজমাতা ক্যাথারিণের আদেশে তাঁদের অনেককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ' ঘটনাই সেইণ্ট বার্থোলোমিউর হত্যাকাণ্ড নামে কুখ্যাত। গণতন্ত্রের অভ্যুত্থানে এ ঘটনা গভীব প্রভাব বিস্তার করে—ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত সে প্রভাব বিস্তারিত হয়। এ' ঘটনারই প্রতিক্রিয়ায় দু'খানা স্মরণীয় বই রচিত ও প্রকাশিত হ'লো : তাদের একখানার প্রণেতা ছিল ফ্রান্সিস হটম্যান, অন্যটির লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি। এ বই দু'খানাতে রাজার অত্যাচাব প্রতিবোধে জনগণেব অধিকাব প্রতিপন্ন হ'য়েছিল। বলা হ'য়েছিল যে প্রজারা শান্তি শৃঙ্খলা বক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের নিকট নিজেদের স্বাধীনতা কতকটা সমপণ করবে বটে—কিন্তু তা প্রয়োজন বুঝলে ফিরিয়েও নিতে পাববে। সেই সঙ্গে বলা হ'লো, সমষ্টিগতভাবে জনগণের এ' অধিকার আছে—ব্যক্তিগতভাবে নয়। ব্যক্তি হিসেবে মানুষের শুধু প্রার্থনা ও কাঁদাকাটা ক'ববার অধিকার আছে। হবস্ ও লকের মতবাদ প্রচারের পূর্বেই এ মত প্রকাশিত হয়। দেখা যাচ্চে, এখানে গণতান্ত্রিক অধিকারকে ধর্মেব আওতায় রাখা হয়েচে। ইংলণ্ডেব হুইগ সম্প্রদায়ও ধর্মের সঙ্গে লৌকিক অধিকারের সামঞ্জস্য করতে চেয়েছিলেন : বলেছিলেন যে রাজার শাসনের মূলে ঈশ্বরেচ্ছা নিহিত আছে বটে ; কিন্তু লোকের কাছে তাঁকে হিসেব দিতে হবে। এ' মত থেকেই আধুনিক উদারনৈতিক মতবাদের উদ্ভব : তাতে ইংলণ্ডের অভিজাত শ্রেণীর মত প্রতিফলিত হ'য়েছিল। তাঁরা যে খুব গণতন্ত্রকামী ছিলেন তা' নয় : ফিল্মার নামে একজন যখন রাজার ঈশ্বরদত্ত অধিকারের সমর্থনে বই লিখলেন এবং সিডনী, হ্যারিংটন ও কবি মিল্টন তার প্রতিবাদে প্রজাতন্ত্রের সমর্থনে দাঁড়ালেন, তখন হুইগরা তাঁদেরে সমর্থন কবলেন না : বস্তুতঃ ফিলমারের মতবাদকেই প্রভাব বিস্তার করতে দেখা গেলো। সিড্নী লিখেছিলেন :—যে রাজা আইন ভাঙ্গে সে রাজাই নয়। জনগণের অধিকার আছে রাজাব বিচার ও তাকে পদচ্যুত করার। জাতি যতদিনের পার্লামেন্টও ততদিনের। স্বাধীন জাতির অধিকার আছে যখন খুশী সমবেত হ'য়ে সিদ্ধান্ত করার। তথাকথিত বিপ্লবী

ক্রমওয়েল পর্যন্ত এ' ধরণের প্রজাতান্ত্রিক মত সহ্য করতে পারলেন না : তিনি লিড্‌লীকে ফাঁসী দিলেন। উদারনৈতিক মতবাদ এখানেই আটকে রইলো; পরে বার্ক তার রাজনৈতিক দিকটা ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্মসংস্থাকে অতিক্রম ক'রে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অন্যদিক দিয়েও এগিয়ে চলেছিলো। রাষ্ট্রকে পোপের আধিপত্য থেকে মুক্ত করার জন্যে জন উইক্লিফ ও জন হাস্‌ বললেন যে রাজার ক্ষমতাও ঈশ্বরদত্ত; তা' পোপের নিয়ন্ত্রণাধীন হবার কোনো কারণ নেই। জন উইক্লিফ ইংলণ্ডের কৃষকদের বিদ্রোহের নেতৃত্ব ক'রেছিলেন। ঐশ্বরিক ক্ষমতার দোহাই দিয়ে পরে রাজাও কিন্তু গণতন্ত্রের বিরোধিতা করতে কসুর করেননি, কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতাকে ধর্মীয় সংস্থার কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করাতে সে দোহাই বিশেষ খাটলো না, গণতন্ত্রও লৌকিক ভিত্তিতে সে বিরোধিতার মোকাবিলা করার রাস্তা পেলো। উইক্লিফ বললেন, রাজার ক্ষমতা রয়েচে ধর্মীয় সংস্থা পরিচালনায় যে সব গলদ জমে তা' দূর করার, এবং তা' করা তার কর্তব্যও বটে। রাজার ক্ষমতা ধর্মীয় কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হ'য়ে যাতে একচ্ছত্র শাসনে পরিণত না হয় সে চিন্তাও আগেই কেউ কেউ ক'রেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নিকোলাস কুসা বলেছিলেন যে জনসাধারণের অনুমোদন না পেলে পর রাজার বা পোপের রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় কোনো অনুশাসনই গ্রাহ্য নয়। তিনি বলেছিলেন, রাজার উচিত আইন মেনে চলা—কারণ, আইনই তাকে রাজা করেচে। এই আইন প্রকৃতির আইন—যে আইনে মানুষ পরস্পর সমান। সে আইন মানুষের জ্ঞানে ও চেতনায় ধরা পড়ে আরও পরে ষোড়শ শতাব্দীতে, কিন্তু নিকোলাস কুসার মতবাদে এর স্পষ্ট পূর্বাভাষ মিলেছিল। ধর্মীয় চিন্তারই আওতায় জন্মলাভ করলো গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা : ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে তা' একাধারে স্বয়ংক্রিয় প্রকৃতিভিত্তিক নানা মতবাদের ব্যাখ্যানে ও আধুনিক আইননিয়ন্ত্রিত সমাজের প্রথম সূচনায় প্রকাশলাভ ক'রলো। অবশেষে লক তাকে রাজনৈতিক দর্শনের রূপ দিলেন : সে কথা পূর্বে বলা হয়েচে। তিনিও প্রেরণা পেয়েছিলেন হুকারের "এক্লেজিয়েস্‌টিকাল পলিটী" নামক বই থেকে। হুকার তাতে লিখেছিলেন যে মানুষের লৌকিক ব্যবহার-বিধির নির্দেশ ধর্মগ্রন্থ থেকে নেওয়া অন্যায়; স্থানকালপাত্রানুসারে মানুষ প্রাকৃতিক আইন ও যুক্তির সাহায্যে নিজ ব্যবহারবিধি স্থির করবে, এই

ঈশ্বরের ইচ্ছা। লক এই শিক্ষাদ্বারা বিশেষরূপে অনুপ্রাণিত হ'লেন এবং একে ভিত্তি ক'রে আধুনিককালের উদারনৈতিক মতবাদ গ'ড়ে তুললেন। এর দার্শনিক ভিত্তি রচিত হয়েছিল গ্রোটিয়াস ও হবসের মতবাদে: সে কথাও পূর্বে উল্লিখিত হয়েচে। গ্রোটিয়াস প্রাকৃতিক আইনকে ধর্মীয় বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন: বলেছিলেন যে এমন হ'তে পারে যে প্রকৃতি কলের মতো আপনা থেকে চল্‌চে। হবস্ এই মতবাদকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন—প্রাকৃতিক আইন বলে স্বতোসিদ্ধ কিছু নেই, প্রকৃতি কার্যকারণ দ্বারাই ক্রিয়া ক'রে চলেচে। তাঁর মতানুসারে মানুষ প্রকৃতিরই অঙ্গ এবং সেও কার্যকারণদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই মতবাদে মানুষ কল্পিত-অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অধীনতা থেকে মুক্ত হ'লো; সে ব্যক্তিত্বের অধিকার লাভ করলো। অন্যপক্ষে সে বেচে থাকার প্রয়োজনে অপরের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে সমাজগঠন করলে। তা' সে করলে নিজেরই প্রয়োজনে, কাজেই তাতে তার ব্যক্তিত্বের ব্যত্যয় হলোনা। সমাজ পরিচালনার নিয়ম এই যে সমাজের সকলের পারস্পরিক সম্বন্ধ বুদ্ধি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্চে এবং মানুষের মনে বুদ্ধির ক্রিয়া জৈব প্রক্রিয়ারই অন্তর্গত। সমাজসংগঠনের কাজ সমাজের সভ্যদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে সহায়তা করা। হবসের এই রাজনৈতিক দর্শনেই গণতন্ত্রের ভিত্তি নিহিত। তাই তিনি বলেছিলেন, সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র জনগণে বর্তায়। রাজা যদি সার্বভৌম হ'তে চান, তা'হলে তাঁকে জনগণের ইচ্ছার শামিল হ'তে হবে। সব মানুষের যে প্রকৃতিদত্ত অধিকার, প্রত্যেক মানুষে তা' বর্তাচ্চে এবং তাই হ'লো সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। এখানেই হবসের বুদ্ধিঅনুসারী সমাজ-দর্শনের বৈপ্লবিক তাৎপর্য। এ'কে অবলম্বন ক'রেই লক উদারনৈতিক মতবাদের মূলনীতি প্রণয়ন করলেন। প্রথম জীবনে বার্ক তারই পূর্ণরূপ উদ্ঘাটিত ক'রেছিলেন।

কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের পর বার্ক বিপ্লববিরোধী হ'য়ে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় শুধু বুদ্ধিদ্বারা নয় তার ভাবাবেগ, ঐতিহ্যনিষ্ঠা, সমাজের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি সব কিছুর দ্বারা সে প্রণোদিত হয়। এ' মতও তিনি লক থেকেই পেয়েচেন বলে দাবী করতে পারলেন: কারণ লক অংশত হুকারের মতবাদ অবলম্বন ক'রে উদারনৈতিক মতবাদ গ'ড়ে তুলেছিলেন এবং হুকার বলেছিলেন যে মানুষ নিজের

ব্যবহারবিধি নিজেই স্থির করবে, এই ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি হয় তবে অবশ্য ঐতিহ্য, ভাবাবেগ ইত্যাদি সম্পূর্ণ ত্যাগ করা যায় না, কারণ, সে সব মানুষ পেয়েচে তার পূর্বপুরুষদের ও পূর্বযুগের পরিবেশ থেকে এবং তাতেও ঈশ্বরের ইচ্ছা নিহিত আছে, বলা যেতে পারে। বার্ক যখন এ'রকম প্রচার করলেন তখন ফরাসী বিপ্লবের বুদ্ধি-অনুসারী ধারাকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন জেরেমী বেন্থাম হব্‌সের অবিমিশ্র বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে আশ্রয় ক'রে। মেরী ওলষ্টনক্রাফট্ ও টমাস পেইন প্রখর যুক্তির সাহায্যে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করলেন; উইলিয়ম গডউইন বললেন, ব্যক্তিগত মালিকানাই সব অনর্থের মূল—অর্থাৎ তিনি সমাজতন্ত্রবাদের কাছাকাছি এসে পড়েচেন। তবে তাঁর এই আশা ছিল যে জনমতের পরিবর্তন ঘটিয়েই সমাজবিপ্লব আনা যাবে; মনুষ্যপ্রকৃতিতে তার এমনি বিশ্বাসও ছিল। ইতিমধ্যে বিপ্লবোত্তর দার্শনিক চিন্তাধারাও মধ্যপন্থা অবলম্বন ক'রে গ'ড়ে উঠেছিল: একদিকে অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে বহু যুগসঞ্চিত বিশ্বাস, অন্যদিকে গোঁড়া খ্রীষ্টীয় মতবাদ ও ক্রমওয়েলের পরবর্তী যুগের পিউরিটানদের ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিক্রিয়া: এ' দুই-য়ের মধ্যে মানুষের চিন্তাধারা প্রকৃতিভিত্তিক সর্বেশ্বরবাদী ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলো। তারই সঙ্গে বুদ্ধির অনুশাসন মিশে মানুষের নৈতিক ও সামাজিক বাধ্যবাধকতা দাঁড় করিয়ে দিলো। বিবেকের অনুশাসন অর্থাৎ ন্যায়ান্যায়বোধে উদারনৈতিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা হ'লো। কার্যত এ' মতবাদে মানুষ ঈশ্বরের অধীন থেকেও অবাধ বিচরণের অধিকার পেলো। তখনকার রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পরিবেশে সে অধিকার কীসে রূপ নিলো, তা' পরে আলোচনা করা যাবে।

ফরাসী বিপ্লবের বুদ্ধিঅনুসারী জীবনদর্শন বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতিতে উদার-নৈতিক মতবাদে শুব্ধ হ'য়ে পড়লো। তবে ফ্রান্সে কণ্ডিলাক লকের মতবাদকে দোটানা থেকে মুক্ত ক'রে বিজ্ঞানানুসারী প্রাকৃতিকত্ববাদে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইংলণ্ডে তা' হ'লোনা: সেখানে মানুষের ধর্মসংস্কার উদীয়মান ধনিকশ্রেণীর আশ্রয়ে মুক্ত বুদ্ধির অভিযানকে শুব্ধ ক'রে দিলো। লকের মতবাদের আভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্যের সুযোগ নিয়ে বার্কলী বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদকে তীব্র আক্রমণ করলেন, আর হিউম মানুষের জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দিয়ে এই মত প্রচার করলেন যে হাতেকলমে

পরীক্ষায় যা কিছু জনসাধারণের কল্যাণমূলক ব'লে প্রতিপন্ন হয়, তাই গ্রহণীয় : আইন ও শাসন কর্তৃপক্ষকে বিচার করারও তা' ছাড়া কোনো মানদণ্ড থাকতে পারে না। এ'মতও হিউম লকের কাছ থেকেই নিয়েছিলেন বলা যেতে পারে ; কারণ লক বলেছিলেন, জনসাধারণের যা'তে মঙ্গল হয় তাই করা ভগবানেরও ইচ্ছা। অথচ হবস বলেছিলেন সমষ্টিজীবন কল্পনা বই নয় : আসল কথা হ'লো ব্যক্তিদের পরস্পর সহযোগিতা এবং তার মূল হ'লো নিজেদেরে বাঁচিয়ে রাখার আগ্রহ। বলা বাহুল্য, হিউম যে বলেছিলেন, ভালো লাগা বা না লাগা ছাড়া মানুষের কাজ করার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই তা' হবসকথিত বেঁচে থাকার আগ্রহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। ইংলণ্ডে উদারনৈতিক মতবাদ এই ভালো লাগা বা না লাগার নীতিতেই গ'ড়ে উঠলো ; অবশ্য অন্যদিকে চূড়ান্ত সংস্কারমূলক দার্শনিক মতবাদই উদারনৈতিকতারূপে গণ্য হ'তো। হিউম উদারনৈতিক মতবাদকে যে রূপে দাঁড় করালেন তাতে উদারনৈতিকতা বা গণতন্ত্র কিছুই রইলো না—এমন কি নীতিবোধও নয়। ফ্রান্সে হেলভেটিয়াস হিউমের মতবাদকে ভিত্তি ক'রে এক নীতিশাস্ত্র গ'ড়ে তুললেন : তার মর্মকথা ছিল এই যে মানুষ শুধু মানসিক বোধ বা অনুভূতি দ্বারাই সুখ বা দুঃখ বুঝতে পারে, আনন্দও শুধু মানসিক উপলব্ধিরই জিনিষ ; কিন্তু সে অনুভূতিরও উৎপত্তি দেহে। কাজেই মানুষকে যদি প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া যায় তবে সে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হ'য়ে নিজের স্বার্থকে সবাইর স্বার্থের অঙ্গ ও অংশরূপে ভাবতে শিখবে। এই মতবাদের ক্রটি ছিল এইখানে যে এতে ভালোমন্দ ব'লে নির্দিষ্ট কিছু রইলোনা : সব কিছুই ব্যক্তিগত ভালো না লাগার উপর ছেড়ে দেওয়া হ'লো। উদীয়মান ধনিকশ্রেণী এরই সুযোগে অবাধ স্বাধীনতা দাবী করে বসলো। ফলে বেন্থাম পর্যন্ত ব্যক্তিমানুষের প্রকৃতিদত্ত অধিকার কিছু আছে ব'লে স্বীকার করলেননা। ব্যক্তিগত ভালো লাগা না লাগার বিচার ব্যক্তির কোনো কাজে লাগলো না—সমষ্টির ইচ্ছাকে বড়ো ক'রে তুললে। এইভাবে ইউটিলেটিরিয়ানিজম বা বাস্তবে কাজে লাগার নীতিকে আশ্রয় ক'রে উদারনৈতিক মতবাদ মানবতাবাদ থেকে দূরে স'রে গেলো। এখানে মনে রাখতে হবে, একটানা যুক্তি অনুসরণের ফলেই এরূপ ঘটলো : ফরাসী বিপ্লবের পর যে কিছুটা রোমান্টিকতার আঁচ মানুষের চিন্তায় ও দৃষ্টিভঙ্গীতে এসে গিছলো, ইউটিলেটিরিয়ানিজম হ'লো যেন তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ফলে এ জ্ঞান চালু

রইলোনা যে, মানুষের অন্তহীন সৃজনশীলতা রয়েছে, সে নিজেই নিজের ভাগ্য সৃষ্টি করতে পারে। তার পরিবর্তে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারব্যবস্থা মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো, আইন ক'রে মানুষের ভালো করবার রেওয়াজ এলো। বলা বাহুল্য, একে গণতন্ত্র বলা চললোনা। জেমস মিল একেই সমর্থন করেছিলেন,—বলেছিলেন, যুক্তি মানে চুল চেরা হিসেব ক'রে চলা, ব্যবসায়ী-শ্রেণী তখন উন্নতির মুখ দেখচে, তাদের উন্নতি মানে অধিকাংশ লোকের উন্নতি; ইউটিলেটিরিয়ানিজম তাদের পক্ষে খুব উপযোগী: কারণ, তার অর্থ ধ'রেবেঁধে হিসেব ক'রে চলা, ব্যবসায়ী শ্রেণী তাই ক'রে নিজেদের ও তার সঙ্গে সমাজের উন্নতি সাধন করছে এবং ন্যায়াবচার ও সাম্যের নামে তাদের স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করলে পব যুক্তির রাস্তা ছেড়ে আবার রোমান্টিক বাড়াবাড়ি করা হবে। জেমস মিল যুক্তির এই যে ব্যাখ্যা করেছিলেন তাকে অনেকে অপব্যাখ্যা মনে ক'রে থাকেন। ইতিমধ্যে আবার এক দল লোক আইন ক'রে কারও ভালো ক'রতে যাওয়ার প্রতিবাদ করলো। তাদের বক্তব্য ছিল এই যে নিজের আনন্দে কাজ করাই যদি মানুষের স্বাভাবিক রীতি হয় এবং তাতেই যদি সকলের মঙ্গলও হয়, তবে রাষ্ট্রের পক্ষে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করা কোন দিক দিয়েই সঙ্গত হ'তে পারেনা। এ' কথা যারা বল্লেন তাঁদেরে ফিজিয়োক্রাট বা আনন্দ-সর্বস্ববাদী বলা হ'তো; কুইসনে নামক একজন ছিলেন তাঁদের নেতা। বেন্থাম এ' মতের সঙ্গে আপোষ করলেন এই ব'লে যে আইন করার উদ্দেশ্যও হবে যুক্তি ও নিয়মের সাহায্যে মানুষের আনন্দের নিরাপত্তা বিধান করা—হস্তক্ষেপ নয়। কিন্তু এই আনন্দভিত্তিক মতবাদের আভ্যন্তরীণ ত্রুটি ছিল এই যে এতে ব্যক্তিগত আনন্দেচ্ছা এবং সামাজিক ও নৈতিক আনন্দবিধানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটলো। কারণ, মানুষকে বলা হ'লো যে সে নিজের আনন্দে চল্‌তে পারবে আবার তাকে সব চাইতে বেশীসংখ্যক লোকের সব চাইতে ভালো যাতে হয়, তা'ও করতে হবে। এই দ্বন্দ্ব মেটাবার চেষ্টা হ'লো এই বলে' যে মানুষের আত্মা অমর এবং সে ইহলোকে যে পুণ্য কাজ করবে পরলোকে তার পুরস্কার পাবে।

জেমস্ মিলের ছেলে জন ষ্টুয়ার্ট মিল কিন্তু উদারনৈতিক মতবাদের অন্তর্নিহিত নৈতিক আদর্শে ফিরে গেলেন। লিবার্টি বা স্বাধীনতার উপর তিনি এক প্রবন্ধ লিখলেন, উদারনৈতিকতার বিবর্তনে সে প্রবন্ধের স্থায়ী স্থান

রয়েচে। তাতে তিনি বলেছিলেন, সব চাইতে বেশীসংখ্যক লোকের সব চাইতে মঙ্গল করার দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে কারু উপর চাপানো যেতে পারেনা: প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্বীকার করতে হ'বে। সমাজে যথাসম্ভব ধন-সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে আইন করার প্রয়োজন তিনি ঘোষণা করলেন। এরই দরুণ বলা হয়েচে যে তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের দিকে ঝোঁক ছিল। গোঁড়া ইউটিলেটিরিয়ান মতবাদে যে সব চাইতে বেশী লোকের সব চাইতে মঙ্গল সাধনের কথা বলা হ'য়েছিল, তাতে শতকরা একান্ন জন লোকের মঙ্গলের জন্য বাকী শতকরা উনপঞ্চাশ জন লোককে চেপে দেওয়াও চল্‌তো। বস্তুত গ্রীণ নামে একজন লিখলেন যে সকলের মঙ্গলেই প্রত্যেকের মঙ্গল; অতএব ব্যক্তি-স্বাধীনতার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে সমাজের সেবা করা। উদারনৈতিক মতবাদ এখানে এসেই আট্‌কে গেছে। ফ্রান্সের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য তখনও শেষ হয়ে যায়নি, উদারনৈতিক মতবাদ সেখানে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলো। কণ্ডিলাক বললেন যে, লক যে ঐতিহ্য, ভাবাবেগ ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়ার কথা বলেছিলেন, সে সব দৈহিক বা অনুভূতিগ্রাহ্য; অতএব তাদের স্বতন্ত্র সত্তা আছে বলে' কল্পনা ক'রে নেবার প্রয়োজন নেই। ক্যাবানিস নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যকে ভিত্তি ক'রে মানসিক ও দৈহিক ক্রিয়ার ঐক্য প্রতিপন্ন করলেন এবং হলবাকের পূর্বোল্লিখিত বইয়ে তা' সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদী দর্শনের অঙ্গীভূত হ'লো। এ'তে ব্যক্তিমানুষই উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক সংস্থার মূল বলে' গণ্য হলো: সমাজকে মঙ্গলময় মনে করা যেতে পার্‌বে শুধু তবে ও তখনই যদি ও যখন তা' ব্যষ্টির মঙ্গল সাধনে সহায়তা ক'রে: স্বাধীনতা মানুষের অচ্ছেদ্য অধিকার; কারণ তা' ছাড়া তার উন্নতি সম্ভব নয়। মানুষ আসলে বুদ্ধির উপাসক; তাকে শিক্ষা দিতে পার্‌লে ও তার পথের সব বাধা দূর ক'রতে পারলে সে আপনা থেকেই নিজেকে এবং তার সাথে সবাইকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এই হলো মতবাদ হিসাবে উদারনৈতিকতার সর্বোত্তম পরিণতি। স্কটল্যাণ্ডনিবাসী প্যাট্রিক গেড্‌সের জীবন ও বাণীতে অনেকে এ' উদার-নৈতিকতার সুষ্ঠু প্রকাশ কবুল করেচেন; সে জীবন ও বাণী ভারতবাসীর বিশেষ করে অনুধাবন করবার কারণ রয়েচে। সার্বজনীনতা ছিল সে বাণীর প্রাণ। গেড্‌স কিন্তু শুধু হৃদয়ের অনুভবকে অবলম্বন ক'রে সে বাণী রচনা করেননি: একাধারে শিল্প, সংগীত ও বিজ্ঞানকে ভিত্তি ক'রেই তাঁর

জীবনদর্শন গ'ড়ে উঠেছিলো। জাতির উদ্যম, জাতির অন্তর্সত্তা থেকেই মানুষের প্রাণের জাগরণ: কিন্তু সে শুধু সমগ্র মানবজাতির প্রাণের অঙ্গ ও অংশরূপে। ভগিনী নিবেদিতার নিকট চিঠিতে তিনি জাতিদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার কুফল ও পারস্পরিক প্রভাবের সুফল ব্যক্ত করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু সৃষ্টির অন্তরের ঐক্যকে মূলসূত্র রূপে ধ'রেই তাঁর আবিষ্কার করেছিলেন; তাতেই আকৃষ্ট হ'য়ে গেড্‌স আচার্যদেবের এক জীবনী লিখলেন। চিন্তা ও কর্মের সমন্বয় ঘটলো তাঁর বাণীতে: তিনি দেখালেন যে মানুষ প্রতিপদেই নিজেকে অতিক্রম ক'রে যাচ্চে—রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি, শিল্পের মাধ্যমে সে প্রতিপদেই পুনর্জন্ম লাভ করচে। কোথাও এর অন্যথা ঘটচে দেখলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না: সে কারণে ভারত পর্যন্ত এসে তিনি প্লেগ-বিধ্বস্ত শহরগুলির শোধন, নতুন শহর পরিকল্পনার কাজ ও শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। নিজে তিনি ছিলেন জীববিদ্যা-বিশারদ,—জীববিদ্যা বিষয়ে বিরাট বইও লিখেছিলেন। তবু তাঁর মত ছিল এই যে বিজ্ঞানানুশীলনই যথেষ্ট নয়: বিজ্ঞান যাতে সমাজের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত হয় তার জন্য বাস্তব দায়িত্ব নিতে হবে। ধর্মীয় আচার-বিচার তিনি মানতেন না।—কিন্তু একাধারে সব ধর্ম এবং নাস্তিকতা ও অজ্ঞেয়-বাদ থেকে সাংস্কৃতিক সম্পদ আহরণ করেছিলেন। হিন্দুর শিবমূর্তিতে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেই শক্তি যার দ্বারা প্রকৃতি অক্ষম, অযোগ্যকে অস্তিত্ব থেকে বাদ দিয়ে চলেচে, ব্রহ্মাতে তিনি বিশ্বের প্রাণশক্তি নিরীক্ষণ করেছিলেন। ইহুদীধর্মে তিনি মহাজাগতিক ক্রিয়া, জীববিকাশ ও মানবেতিহাসের মধ্যে ঐক্যসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন; গ্রীসে যে নয়জন শিল্প ও সংগীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কল্পনা করা হয়েছিল তাদেরে তিনি মানুষের বুদ্ধির ও হৃদয়ের সর্বোচ্চ বিকাশের প্রতিমূর্তিরূপে গণ্য করেছিলেন। সারা বিশ্বের চেতনাকে আপন ক'রে নিয়ে তিনি মানুষের অগ্রগতির নিশানা রচনা করলেন। তাই তিনি প্রায়ই গ্যয়টের এ'বাণীর পুনরুক্তি করতেন: "জীবগণ সর্বদাই অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাইচে ও কৃতকার্যও হচ্চে:" ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক যুগে এই হ'লো মানুষের শক্তির সর্বোত্তম স্বীকৃতি।—এই প্রকৃত উদারনৈতিকতা।

কিন্তু ব্যবহারবিধি হিসেবে তা' কীরূপ অসম্পূর্ণতায় এসে ঠেক্‌লো তা' পূর্বে

আলোচনা করেচি। বস্তুবাদী দর্শন সেখানে প্রতিহত হ'লো। ইতিমধ্যে কান্ট অবিমিশ্র বুদ্ধিবাদের সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা লিখেছিলেন। তাতে তিনি এই বলেছিলেন যে বুদ্ধি নিছক যুক্তিতে পর্যবসিত নয়: তার এক অতীন্দ্রিয় সত্তা রয়েচে; তারই জোরে সে এই বিশ্বকে নৈতিক জগৎ ও বৈজ্ঞানিক জগৎ এ' দু' ভাগে ভাগ ক'রেচে। ভগবানকে তিনি আবাহন করলেন না শুধু এ' জন্যে যে ভগবানকে আমরা জানি এ' কথা বল্‌তে পারলেন না, শুধু বিশ্বাসকে স্থান দিলেন। এতেই ক্যাটাগরিক্যাল্ ইম্পারেটিভ বা বিশ্বাসের সরাসরি অনুশাসনের উদ্ভব হ'লো। তার অন্তর্নিহিত ভাববাদকে ফিক্‌ট্ ও হেগেল ফুটিয়ে তুললেন। হেগেল সমষ্টিসত্তাকে রাষ্ট্রে রূপান্তরিত ক'রে দেখ্‌লেন। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ তাতে প্রেরণা লাভ করলো। ইংলণ্ডে যখন উদারনৈতিকতা "সমষ্টির মঙ্গলে ব্যক্তির মঙ্গল" এই মতবাদে রূপ নিয়েছিল, বার্ণাড বোসানকোয়েট তখন সমষ্টির সাথে হেগেল বর্ণিত রাষ্ট্রসত্তাকে মিশিয়ে দিলেন। তারপর আর উদার-নৈতিকতার কোনো পদার্থ রইলো না। গণতন্ত্রের পথও আপাতনিরুদ্ধ হ'য়ে গেলো। তখনই এবং হেগেলের মতবাদকে অবলম্বন ক'রেই বিপ্লবী সাম্যবাদের প্রবর্তন করলেন কার্ল মার্ক্স।

আইডিয়া ও রিয়ালিটি ঃ
মার্ক্সবাদ ও মানবতাবাদ

এইবার আমরা আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক সমস্যার মুখোমুখী এসে পড়েচি।

সে সমস্যা সাময়িক সমস্যা নয়—এমন কি এক যুগের বা শতাব্দীর সমস্যাও নয়। আধুনিক যুগের সমস্যা বললুম এ' জন্যে যে আধুনিক যুগেই এ' প্রকট হয়েচে,—বহু যুগলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিজ সমাধান দাবী করেচে। এ' সমস্যা আইডিয়া ও রিয়ালিটি—বাংলায় যাকে বলা যায় ধারণা ও বাস্তবাবস্থা—এ' দুইয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও পৌর্বাপর্য নিয়ে। এখানেই আমাদের কার্ল মার্ক্সের যুগান্তকারী মতবাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ মোকাবিলা।

কার্ল মার্ক্স বলেছিলেন, অর্থনৈতিক পারম্পর্য—তথা মানুষ জীবিকার জন্যে অন্যের সঙ্গে যে অর্থনৈতিক সম্বন্ধে যেতে বাধ্য হয়, তাই তার সমষ্টিগত গতির নিয়ামক ; এবং যুগে যুগে সে সম্বন্ধের বিবর্তনের মধ্য দিয়েই ইতিহাস গ'ড়ে উঠেচে। এই অর্থে অর্থনৈতিক শক্তিই ইতিহাসের চালক হিসেবে কাজ করচে। ইতিহাসের এক পর্যায়ে মানুষ যে অর্থনৈতিক সংস্থাতে থাকে, কালক্রমে অর্থাৎ জীবিকার্জনের নূতন প্রয়োজন ও নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে তার অভ্যন্তরে বৈষম্য দেখা দেয়, এবং তাকে আর টিকে থাকতে দেবেনা এমন বিপরীত অবস্থার—ইংরেজীতে যাকে বলে এন্টি-থিসীস,—তার সৃষ্টি হয়। সে অবস্থার স্বীকৃতির অভাবে বিপ্লব ঘটে এবং বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানুষ নূতন ও যুগোপযোগী অর্থনৈতিক সম্বন্ধে ও সংস্থাতে উপনীত হ'য়ে সিন্থেসীস বা সমন্বয় লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসও এক ধাপ এগিয়ে যায়। বলা বাহুল্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই এই অর্থনৈতিক ক্রিয়া ঘটচে, ও কালচক্রে ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্চে। নূতন প্রয়োজন যথা জনসংখ্যাবৃদ্ধি, নূতন পদ্ধতি যথা যন্ত্রশিল্পের উদ্ভাবন মানুষকে সামন্ত প্রথা থেকে ধনতন্ত্রে উত্তীর্ণ করেচে। এইভাবে মানুষ আদিম সাম্যবাদ থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে এসে সাম্যবাদ বা কম্যুনিজমের দুয়োরে দাঁড়িয়েচে। মার্ক্স যখন এ' কথা লিখেছিলেন তারপর অবশ্য কম্যুনিজমের অনেকটা প্রতিষ্ঠা ঘটেচে এবং সর্বজাগতিক ভিত্তিতে তার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অবশিষ্ট জগতের সামনে চ্যালেঞ্জরূপে উদ্যত রয়েচে।

হেগেল যে ভাববিবর্তনের কথা বলেছিলেন এবং ডায়লেকটিক্‌স্ বা দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের ভিত্তিতে তাকে প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন, মার্ক্স তাকে বাস্তব তথা বস্তুবাদী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে স্বভাবসংগত অর্থাৎ উল্টো থেকে সোজা ক'রে দিলেন,—এহেন দাবীর অস্তিত্ব পূর্বে উল্লেখ করেচি। কিন্তু মানবজাতির অর্থনৈতিক বিবর্তনের রহস্য উদ্ঘাটনে মার্ক্সের যে ঐতিহাসিক অবদান রয়েচে তার গুরুত্ব স্বীকার ক'রেও উপরোক্ত দাবী এখন কেউ কেউ অস্বীকার করচেন দুই কারণে। প্রথম কারণ তাঁরা যা' দেখিয়েচেন তা এই যে ইতিহাস অর্থনৈতিক বিবর্তন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এ কথা বললেই বস্তুবাদের মর্যাদারক্ষা হলোনা: কারণ বস্তুবাদের পরিধি আরও অনেক ব্যাপক, মানবজাতির ভাববিবর্তনও তার অন্তর্ভুক্ত। গতিশীল বস্তু হ'তেই আইডিয়া গ'ড়ে উঠেচে এবং যেহেতু ইতিহাস শুধু মানুষের জীবিকার্জনের কাহিনী নয়, তা' মানুষের সমগ্রভাবে বেঁচে থাকার সংগ্রামের কাহিনী, অতএব তার সব কিছু ভাবকল্পনা ইতিহাসের অন্তর্গত তো বটেই—তার উপর ইতিহাসের নিয়ামকরূপে তাদেরও প্রকৃত স্থান রয়েচে। মার্ক্স যে অর্থনৈতিক পারস্পর্যের কথা বলেচেন তার উদ্ভব হয়েচে মানুষের জীবন সংগ্রামের এক বিশেষ পর্যায়ে: মানুষ যেদিন শুধু ফল সংগ্রহ ক'রে জীবন ধারণ ক'রতো সেদিন সে কোনো অর্থনৈতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল না। অনেকদিন পর যেদিন সে হালচাষ ক'রতে শিখলো সেদিন অন্য মানুষের সঙ্গে তার অর্থনৈতিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হ'লো বলা যেতে পারে। সোজা কথায়, অর্থনৈতিক প্রয়োজনে যে দিন সে অন্য মানুষের সঙ্গে, সমবেত সত্তার অর্থাৎ সমাজের অঙ্গীভূত হ'লো, সেদিন মানুষের ইতিহাসে অর্থনৈতিক পারস্পর্য দেখা দিলো। কিন্তু ইতিহাসের শুরু তার অনেক আগে। তার নিয়ামক মানুষের জীবনের সামগ্রিক পারস্পর্য। সে কারণে বলা হয়েচে, ইতিহাস শুধু অর্থনৈতিক শক্তিতে চালিত নয়—একাধারে বস্তু ও বস্তু হ'তে উদ্ভূত আইডিয়া দ্বারা চালিত এবং তাকেই বলা হয়েচে ঐতিহাসিক নিয়মানুবর্তিতা—ইংরেজীতে যাকে বলেচে হিষ্টরিক্যাল ডিটারমিনিজম। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাতে এই ঐতিহাসিক নিয়মানুবর্তিতাই পাওয়া যায়: অর্থনৈতিক নিয়মানুবর্তিতা আসে অনুষঙ্গরূপে।

কিন্তু এমনও তো হ'তে পারে যে অর্থনৈতিক বিবর্তন বলতে মার্ক্স বেঁচে থাকার সংগ্রামকেই বোঝাতে চেয়েচেন। সেই আদিযুগে সমাজ হয়তো ছিল না, কিন্তু মানুষ যেভাবে বাঁচবার চেষ্টা ক'রছিল তাতেই সমাজ গঠনের সম্ভাব্যতা উপ্ত ছিল। কাজেই অর্থনৈতিক পারস্পর্যের সম্ভাবনাও প্রথম

থেকেই বিরাজ করছিল। মার্ক্স যে শুধু অর্থনৈতিক বিকাশের কথা ভাবতেন না তার প্রমাণ এই যে তিনি বলতেন—"দার্শনিকেরা দুনিয়াটাকে বিভিন্নভাবে শুধু ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু আসল কথা হ'লো দুনিয়াকে বদলে দেওয়া।" এ' বদলে দেওয়া ব'লতে তিনি শুধু অর্থনৈতিক বদলানো বোঝাতে চাননি: কারণ, সে বদলানো অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী নিয়ম ধ'রে চ'লবে এ' কথাই তিনি বলেছিলেন এবং সে বদলানোর দায়িত্ব দার্শনিকদের উপর চাপাবার কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। তিনি বলেছিলেন, "বহিঃপ্রকৃতির উপর ক্রিয়া দ্বারা তাতে পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষ নিজের প্রকৃতিতেও পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। কারণ, মানুষের নিজের প্রকৃতি বহিঃপ্রকৃতির অঙ্গ—বহিঃপ্রকৃতিদ্বারা মানুষ ঘনিষ্ঠভাবে প্রভাবিত।" এ' কথা যিনি বলেছেন তিনি নিশ্চয়ই জীবনকে নিছক অর্থনীতিরূপে দেখেননি। অবশ্য তিনি ইতিহাসকে অর্থনীতির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াতেই বিবর্তিত দেখেছিলেন; কিন্তু তার অর্থ এ' নয় যে ইতিহাসে শুধু অর্থনীতিরই ক্রিয়া চলেছে: আইডিয়ার কোনো স্বাধীন স্থান নেই। ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিবর্তন থেকেই আইডিয়ার জন্ম এবং সে আইডিয়ার ক্ষমতা বিরাট: বিবর্তনের পরবর্তী অধ্যায়কে সে ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমতা রাখে। বিপ্লবী উদ্যোগ দ্বারা সে বাধা অপসারণ করতে হয়। কাজেই মার্ক্স ইতিহাসের মধ্য দিয়ে জীবনের বিকাশকে অযথা অর্থনীতির গণ্ডীতে আবদ্ধ ক'রে দেখেছিলেন, এ' অভিযোগ সত্য নয়।

কিন্তু এ' কথা তো সত্য যে মার্ক্স বলেছিলেন, জীবন অর্থনীতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত: তার অর্থনৈতিক সত্তা থেকেই আইডিয়ার উদ্ভব। রিয়ালিটি বলতে মুখ্যত তিনি অর্থনৈতিক পারম্পর্যই বোঝাতে চেয়েছিলেন। এ' জন্যই বলা হয়, হেগেলের আইডিয়াভিত্তিক ডায়লেকটিককে তিনি রিয়ালিটির উপর বসিয়ে সোজা ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের চিন্তার ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায়, মার্ক্সবাদের জন্মের অর্থাৎ মার্ক্স তাঁর উপরোক্ত মতবাদ ব্যাখ্যা করার বহু পূর্বেই ভিকো বলেছিলেন যে আইডিয়ার কার্যকারিতা উৎপাদনপদ্ধতি দিয়েই স্থির হয়। এ' জন্যেই ভিকোকে বিনা দ্বিধায় মার্ক্সের পূর্বসূরী বলা যায় এবং বলা হ'য়ে থাকে। কিন্তু মানুষের চিন্তাধারার ইতিহাস এ' কথারও সাক্ষ্য দেয় যে আইডিয়ার বিবর্তন রিয়ালিটিকে অবলম্বন ক'রে ঘটলেও তার স্বকীয় বিকাশধারা

রয়েচে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মার্ক্স যে সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদের উদ্ভব তাঁর যুগের নির্দেশ ব'লে ব'লেছিলেন, তেমনি সমাজতন্ত্রের কথা তাঁর পূর্বতন মনীষীদেরও কেউ কেউ ব'লে গেছেন—ব'লে গেছেন এমনি সময়ে যখন ধনতন্ত্র পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল, তার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অভ্যুদয়ের কোনো নিশানা তখনও জাগেনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মার্ক্সের মতে ধনিকেরা শ্রমিকদের কাজের অতিরিক্ত মূল্য আত্মসাৎ ক'রে যে একচেটিয়া কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি করে—এ' মত প্রতিপন্ন করেছিলেন এ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো এবং তাঁদের শিষ্যবৃন্দেরা—সাম্যবাদী পরিপ্রেক্ষিতে যাঁদেরে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ বলা হ'য়ে থাকে। কিন্তু এ' মতের আদি সন্ধান ক'রতে হ'লে যেতে হয় আরও আগে—লক সম্পত্তির যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তাতে: তিনি বলেছিলেন, প্রকৃতির অবদানের সঙ্গে মানুষের শ্রম মিশেই সম্পত্তির সৃষ্টি হয়। অতএব দেখা যাচ্চে, আইডিয়ার বিকাশ ঘটেচে তার নিজস্ব ধারা অনুসরণ ক'রে—মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিধিবিধানেব প্রকাশে; ইতিহাসের বাস্তব ঘটনাধারার উপর তা' নির্ভরশীল নয়। কোনো আইডিয়াকে ফিউডাল, বুর্জোয়া বা তেমনি কিছু আখ্যা দিয়ে কোনো বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত করাব কোনো সংগতি নেই। বিজ্ঞানের বিকাশ কখনও বিশেষ শ্রেণীর আওতায় হয়নি। অবশ্য তার অর্থ এ' নয় যে বিশেষ যুগেব বা শ্রেণীর পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য নেই। তা' নিশ্চয়ই আছে এবং তার হিসেব রাখাও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসম্মত। কিন্তু আইডিয়ার উদ্ভব কোনো বিশেষ শ্রেণীর 'পব নির্ভর ক'রে নেই। তা' ছাড়া মানুষের চিন্তা অর্থাৎ চেতনা তার অস্তিত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে আসচে এবং আদিযুগ থেকেই চেতনা ও অস্তিত্ব পাশাপাশি রয়েচে, হেগেলের এ মত মার্ক্সও গ্রহণ করেছিলেন; এবং সে মত যদি সত্য হয় তবে আইডিয়াকে নিছক অর্থনৈতিক পারম্পর্যের উপর নির্ভরশীল বলার সংগতি থাকে না। আর যদি বলা হয় যে চিন্তা ও অস্তিত্ব আদিযুগ থেকে একসঙ্গে চ'লে আসেনি, জীববিকাশের একটা স্তরে এসে এমনটা ঘটেচে, তবে উৎপাদনপদ্ধতি দ্বারা চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হয়, এ যুক্তিও অচল হ'য়ে পড়ে—কারণ চিন্তার উদ্ভবকে তবে কালের বক্ষে অযথা সীমান্বিত করা হয়।' মার্ক্স হেগেলের ডায়লেকটিক্‌কে অর্থনৈতিক পারম্পর্যের উপর বসিয়ে দেওয়াতে তা উল্টো থেকে সোজা হ'য়ে গেলো এ দাবীর যাঁরা প্রতিবাদ

করেন, মানবীয় চিন্তা ও মানবীয় সত্তার চিরন্তন মিলনকেই তাঁরা তাঁদের প্রতিবাদের দ্বিতীয় কারণরূপে নির্ধারিত করেচেন।

তা ছাড়াও কথা আছে। রিয়ালিটি বল্‌তে মার্ক্স যদি মানুষের শুধু অর্থনৈতিক সত্তা না বুঝিয়ে বেঁচে থাকবার সামগ্রিক সংগ্রাম ও তাতে উদ্ভূত অভিজ্ঞতা বুঝাতে চেয়ে থাকেন, তা হ'লে হেগেলের ডায়লেকটিক্‌স্‌ থেকে তাঁর ডায়লেকটিকাল মেটিরিয়ালিজমের বাস্তবিক কোনো প্রভেদ আছে কিনা সে বিষয়েও কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেচেন। এঁদের মতে মার্ক্স বৃথাই তাঁর মতবাদকে একটা স্বতন্ত্র মতবাদ ব'লে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেচেন। হেগেলের মতে আইডিয়ার যে ডায়লেকটিকাল ক্রিয়া চলেচে তা মোটেও বস্তুনিরপেক্ষ নয়। প্রকৃতি ও ইতিহাসও সে বিবর্তনের অঙ্গীভূত : সে সামগ্রিক বিবর্তন মানুষকে নিছক অধ্যাত্মচিন্তাপ্রবণতা থেকে মুক্ত ক'রে আদর্শ সামনে রেখে সক্রিয় ক'রে তুলেচে—দুনিয়াকে নূতন ক'রে গ'ড়বার আত্মবিশ্বাস তার মধ্যে জাগিয়ে তাকে পাথিব জীবনে পুরোপুরি যোগ দিতে প্রণোদিত করেচে। বস্তুবাদী দর্শন অনুসারে চেতনা জীবন থেকে উদ্ভূত এবং জীবনের উৎপত্তি বস্তুতে নিহিত। তা' হলে এই দাঁড়ায় যে জীবরূপে মানুষের বিকাশক্রমে চিন্তা এবং মানুষের দৈহিক তথা সামাজিক অস্তিত্ব একই সঙ্গে চলে আস্‌চে। মানুষের সামাজিক বিকাশ ও ইতিহাস অবশ্যই তার সামগ্রিক বিকাশের অন্তর্ভুক্ত। এখানে আইডিয়ালিজম ও মেটিরিয়ালিজমের—ভাববাদ ও বস্তুবাদের মিলন ঘটেচে বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। বরং বলা চলে, নিছক আইডিয়ালিজম আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা বরবাদ হ'য়ে যাওয়ার ফলে এর পর থেকে বস্তুবাদ সমসাময়িক ও ভবিষ্যৎ জগতের দর্শনরূপে স্থান গ্রহণ করলে। এ' জন্যই কেউ কেউ বলেন, হেগেল ও মার্ক্সের তথাকথিত বিরোধ সম্পূর্ণ কাল্পনিক—বাস্তবে তার কোনো ভিত্তি নেই।

কিন্তু এ কথা তো ভোলবার নয় হেগেল এক সর্বাত্মক ভাবসত্তা—ইংরাজীতে যাকে বলে এ্যাবসোলিউট আইডিয়া—থেকে এই জগতের উদ্ভব ধারণা করেছিলেন। অন্যপক্ষে মার্ক্স যে ডায়লেকটিক বা দ্বন্দসমন্বয়ের ধারা অবলম্বন ক'রে তাঁর মতবাদ ব্যাখ্যা করলেন, তার উৎস ভাব নয়—বস্তুতে নিহিত। মার্ক্সের আগে ফিউয়েরবাকই হেগেলের এ্যাবসোলিউট আইডিয়া পরিত্যাগ ক'রে আইডিয়াকে মানুষেরই সৃষ্টি ব'লে ঘোষণা করেন। এ্যাবসোলিউট আইডিয়া বলতে বুঝায়

মানুষের বুদ্ধির অতীত এক বিশ্বব্যাপী ভাবসত্তা যার অন্তর থেকে জগতের সৃষ্টি হয়েচে—অবশেষে রাষ্ট্রে ও সমাজে যা রূপলাভ করেচে। এমনি ক'রেইতো হেগেল শেষ পর্যায়ে জার্মাণ রাষ্ট্রের সার্বভৌম সত্তায় এসে ঠেকেছিলেন। কিন্তু ফিউয়েরবাকের সময়ে জড়পদার্থ থেকে প্রাণের উৎপত্তি নির্ধারিত হয়েচে, জড় জগৎ থেকে চিন্তার উদ্ভব নির্ধারিত হ'য়ে অতিজাগতিক ভাবসত্তার কল্পনাকে অবাস্তব ক'রে দিয়েচে। যা' বাস্তব তাকেই যুক্তিসংগত ব'লে প্রতিপন্ন করা যায় (দি রিয়াল ইজর‍্যাশন্যাল)—হেগেলের এই মতবাদকেই ফিউয়েববাক জড়পদার্থ থেকে জগতের উৎপত্তির সমর্থনে নিয়োজিত করলেন। সমস্ত প্রকৃতিকে নিংড়ে মানুষের সমগ্র অস্তিত্ব গ'ড়ে উঠচে এবং ভাব ভাবনার জন্ম সে অস্তিত্ব থেকে। কাজেই সমস্ত প্রকৃতির ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার মধ্যেই ভাবের উৎপত্তির কারণ নিহিত রয়েচে। এ উৎপত্তি মানুষের আত্মচিন্তা থেকে নয়—সমগ্র বহিপ্রর্কৃতি নিয়ে যে চিন্তা তা' থেকে। তা হ'লে দেখা যাচ্চে, সমগ্র প্রকৃতির অন্তর থেকে মানুষ চিন্তা আহরণ করচে। মানুষই তা হ'লে চিন্তার নায়ক, চিন্তার উদ্গাতা। এবার মানবতাবাদ হ'লো বাস্তব, যুক্তিভিত্তিক। প্রাকৃতিকত্ববাদের উপর করলেন ফিউয়েরবাক তার প্রতিষ্ঠা। —করলেন নৃতত্ব ও শরীরবিজ্ঞানেয় সাহায্য নিয়েঃ আধুনিককালে এ' দুই বিজ্ঞান বিশ্ববিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করেচে, পদার্থবিজ্ঞানে যা হয়নি এদের আবিষ্কারে তা হয়েচে—মানুষ জানতে পেরেচে যে তার প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সে চিন্তাশক্তি লাভ ক'রেছিল, চিন্তার সাহায্যে ধারণা-কল্পনা গ'ড়ে তোলবার ক্ষমতা পেয়েছিল। তাইতে সে তার সহজাত নীতিবোধও লাভ করেচে। নীতিবোধ ব্যতীত মানবতাবাদে কোনো যাথার্থ্য থাকেনাঃ অথচ যদি প্রমাণ করা না যেতো যে মানুষ তার সহজাত প্রকৃতি থেকেই নীতিবোধ লাভ করে, তবে স্বীকার করতে হ'তো যে সে কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তি থেকেই তার নীতিবোধ লাভ করেচে। সেক্ষেত্রে মানবতাবাদের ভিত্তি ধ্বসে পড়তোঃ কারণ, তবে আর দাবী করা চলতো না যে মানবীয় সব কিছুর উৎপত্তি মানুষ থেকেই হয়েচে। বস্তুত কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায়, কোনটা পাপ কোনটা পুণ্য, এর নির্ধারণ এক হয়েচে ধর্মের—নামে, অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকল্পনার ভিত্তিতে। কিন্তু বস্তুবাদী ভিত্তিতে এর নির্ধারণ করতে না পারলে পর মানবতাবাদ অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। যে নির্ধারণ হয়েচে তা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, সম্পূর্ণ একটি নীতিবাদে পূর্ণতালাভ করেনি।

কিন্তু তার সূত্র পাওয়া গেছে এবং ফিউয়েরবাকই প্রথম সে সূত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। মানুষ তার জীবসত্তা থেকেই নীতিবোধ লাভ করেচে—কোনো অতিপ্রাকৃতিক বা অতীন্দ্রিয় শক্তি থেকে নয়। তবে কি তার জীবসত্তা গ'ড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে তার চিন্তাশক্তি—তথা নীতিবোধ গ'ড়ে উঠেচে? —তা নয়ঃ ফিউয়েরবাকের মতে চিন্তাতে সে প্রথম থেকেই স্বরাট, প্রথম থেকেই সব কিছুর মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা লাভ করেছিল। প্রোটাগোরাসের মত এতদিনে বস্তুবাদী ভিত্তি লাভ করলো। মানুষ তার পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যা' সত্য ব'লে বুঝেচে তাই তার পক্ষে সত্য। শুধু তার পক্ষে সত্য নয়—তাইই সত্য। কাজেই সে যা বুঝেচে তা নিছক তার নৃতাত্ত্বিক বা চিন্তাশক্তির বিকাশের দ্যোতক নয়, তার দৈহিক বা মানসিক বোধই সব কিছুর সত্যতা ও বাস্তবতার প্রমাণ। অবশ্য মানুষ বলতে একেলা মানুষ বুঝায় না—অন্য মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে যে মানুষ গ'ড়ে উঠেচে তাকে বুঝায়। মানুষের বোধশক্তি থেকে আইডিয়ার জন্ম হয়, কিন্তু সে মানুষ একলা মানুষ নয়ঃ সে সামাজিক মানুষ—অন্য মানুষের সঙ্গে যার সর্বদা আদান প্রদান চলচে।

এখানে বোঝা দরকার, মানুষ যে দৈহিক বা মানবিক বোধ দ্বারা সত্য নির্ধারণ করচে—সে যে তার জীবসত্তা থেকেই বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, নীতিবোধ, লাভ করেচে এর অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়াটি কীঃ কোন কার্যকারণে এ' সম্ভব হ'লো। সম্ভব হ'লো এ'ভাবে যে মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বাঁচতে চেয়েচে, বাঁচবার জন্যে সংগ্রাম করেচে। সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতায় সে বাঁচবার জন্যে যা' প্রয়োজন ব'লে বুঝেচে তাকে আয়ত্ত করার সংগ্রামই তার স্বরাজ্যের সংগ্রাম, তার বাঁচবার বাধা দূর করাই হ'লো স্বাধীনতা। তা' করতে গিয়ে সে বুঝেচে কী তার স্বাধীনতার পরিপন্থী আর কী তা' নয়ঃ তা' বুঝে সে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তা'ও জানতে পেরেচে। আর যেহেতু সে একাকী নয়—অন্যের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধে বাঁধা, সেহেতু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই তাকে ভালোমন্দ, ন্যায়ান্যায়, পাপপুণ্য বিচার করতে হয়েচেঃ সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি তার বিচার বিকৃত বা একপেশে ক'রে দিতে পারেনি। অবশ্য পরে তার সামাজিক সম্বন্ধেই জটিলতা এসে গেছেঃ ন্যায়ান্যায়বোধ নির্বিকার বা সন্দেহাতীত থাকেনিঃ পরিবর্তনশীল পরিবেশে ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সম্বন্ধই গভীর ঐতিহাসিক সমস্যা সৃষ্টি করেচে। ন্যায়ান্যায়বোধকে সমসাময়িক সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে নির্দিষ্ট ও কার্যকরী রাখার জন্যেই ধর্মের অনুশাসন

প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়লো: নয়তো তার উৎপত্তি মানুষের সহজাত সামাজিক বিচারবুদ্ধি থেকেই হয়েছিল।

কিন্তু ফিউয়েরবাক যে অন্য মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের কথা বলেছিলেন তার প্রকার কী, কী তার ফলাফল, সে সম্বন্ধের মাধ্যমে মানুষ কীভাবে আত্মবিচার করে: মার্ক্স এ প্রশ্ন তুলেছিলেন—মানুষ বল্‌তে যে কিছুটা অনির্দিষ্ট, কিছুটা রহস্যময় সংজ্ঞা বুঝায় তার ব্যাখ্যা দাবী করেছিলেন। তিনি বললেন, ফিউয়েরবাক মানুষের যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তাতে কার্যত মানুষ বিচ্ছিন্ন রূপেই প্রকাশ পাচ্চে। তিনি বললেন, আসলে মানুষে: রূপ তা' নয়—সে সামাজিক পরিবেশের নিয়ন্ত্রনাধীন এবং অর্থনৈতিক সংস্থাই সে পরিবেশ সৃষ্টি করচে। এইভাবে তিনি মানুষকে অর্থনৈতিক সমষ্টির নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে ফেললেন। ফিউয়েরবাক অর্থনৈতিক সমষ্টির প্রাধান্য স্বীকার করেননি, সেহেতু মার্ক্স তার মতবাদের কঠোর সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন যে ফিউয়েরবাক ধর্মভিত্তিক প্রাণধর্মের পরিবর্তে মনুষ্যভিত্তিক প্রাণধর্ম প্রতিষ্ঠা করেচেন বটে, কিন্তু প্রাণধর্ম তো আলাদা আলাদা মানুষের ব্যাপার নয়—তা' তাদের সামাজিক সম্বন্ধের সমবায়ে গঠিত বস্তু মাত্র। এর উত্তরে কেউ কেউ বলেচেন, সমাজ তো ব্যক্তিরই সমবায়ে গঠিত: তা' আগে থেকে নির্ধারিত ও গঠিত হ'য়ে থাকেনি। মানুষই সমাজ গঠন করেচে; বিশেষ সমাজে মানুষের যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্নীত হয়েচে, মানুষ তা' বদলাতেও পারে। মানুষের ইচ্ছা ও কর্ম দ্বারাই তো তার সামাজিক অস্তিত্ব নির্ণীত হয়।

মার্ক্স যে অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছিলেন তাই যদি চরম হয়, সমাজ যদি তারই অধীন হয় এবং ব্যক্তিসত্তাও যদি নিরূপিত হয় তারই দ্বারা, তবে তো দেখা যাচ্চে অতিপ্রাকৃতিক শক্তির বদলে মানুষ এক মানবীয় শক্তি দ্বারাই আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা রয়েচে: তা হ'লে সে নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণ ক'রে কী করে? অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠেচে এই যে, তা' এসেচে অনেক পরে, মানুষের বাঁচবার চেষ্টা শুরু হয়েচে প্রথম থেকেই এবং তখন থেকেই সে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা নিজের জীবন গ'ড়ে আস্‌চে। এ প্রশ্নের আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেচি। এখন শুধু এ' কথা মেনে নেওয়া যেতে পারে যে মানুষ কালক্রমে সামাজিক অবস্থার অধীন হ'য়ে পড়েচে। কিন্তু তা'ও যদি হ'য়ে থাকে তবে সেতো সমাজের বিবর্তনের অধীন: বিপ্লবাত্মক চিন্তা ও কর্ম দ্বারা সমাজকে পুনর্গঠিত করার রাস্তা'সে কেমন ক'রে

পায়? মার্ক্স বলেছিলেন, মানুষ যখন নিজের জীবিকার জন্য উৎপাদন করার স্তরে এসে পৌঁছুলো, তখনই অন্য জীব থেকে তার সত্তা পৃথক হ'য়ে গেলো। কিন্তু তার আগেই কি সে নিজের চিন্তাশক্তির দ্বারা অন্য জীব থেকে পৃথক হয়নি? চিন্তাদ্বারাই কি সে বেঁচে থাকবার উপায় উদ্ভাবন ক'রেনি? তার মস্তিষ্ক অবশ্য জড় পদার্থের দ্বারাই গঠিত: বোধ ও অনুভূতিকেও নিছক শরীরবিজ্ঞানের ক্রিয়া বলা যেতে পারে। কিন্তু যখন সে চিন্তা করতে আরম্ভ করে, তখন বুঝতে হবে তার মন সক্রিয় হয়েচে। কিন্তু মন কি তার প্রথম থেকেই সক্রিয় ছিল না? মার্ক্স বলেচেন, মানুষের আইডিয়া, চিন্তা, ধারণা সব কিছুর সম্বন্ধ রয়েচে তার 'হ্ বা শারীরিক ক্রিয়ার সঙ্গে: শারীরিক প্রক্রিয়া থেকেই তাদের উদ্ভব। সম্বন্ধ রয়েচে সন্দেহ নেই, কিন্তু চিন্তা থেকেও কি অনেক শারীরিক ক্রিয়ার উদ্ভব নয়? সাধারণভাবে দেখতে গেলে এ' অবশ্য সত্য যে মানুষের পরিবেশ থেকে মনের উপর যে প্রতিক্রিয়া জাগে তাতে তার চিন্তার উদ্ভব হয়। কিন্তু সে চিন্তা গাছ থেকে ফল পড়ার মতো তার শারীরিক ক্রিয়ার ফল নয়: তার নিজস্ব সত্তা, স্বকীয়তা ও ক্রিয়া রয়েচে। কাজেই এ কথা সত্য নয় যে মানুষের চেতনা তার দৈহিক ক্রিয়া দ্বারা গঠিত। বরং সত্য এই যে তা' উদ্ভূত তার সমস্ত অস্তিত্ব হ'তে এবং মার্ক্সও পরে তাই ব'লে গেছেন। বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের তাই মূল কথা। চেতনার জন্ম জড় পদার্থের সমবায়ে: দেহের অস্তিত্ব থেকে তার উদ্ভব: দেহের ক্রিয়া দ্বারা তা' নিরূপিত নয়।

এই চেতনার ধারা বেয়ে মানুষ অগ্রসর হয়েচে, বুদ্ধির সাহায্যে চিন্তা দ্বারা নিজের ভাল মন্দ নির্ধারণ করেচে। মার্ক্স এইক্ষণে হেগেলের ডায়লেকটিককে নিয়ে এলেন: অর্থনৈতিক দ্বন্দসমন্বয়ের মাধ্যমে সমাজবিবর্তনের সংজ্ঞা উপস্থাপিত করলেন। তার মধ্যে প্রশ্ন উঠলো দুটো: (১) সমাজের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে মানুষ কীভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ করে: তার আত্মসৃষ্টি কিভাবে কতটা অবশিষ্ট থাকে? (২) মার্ক্স কোনো স্থায়ী নৈতিক মূল্যমান স্বীকার করলেন না: মূল্যমানকেও সমাজবিবর্তনের অধীন ক'রে দেখলেন। স্থায়ী মূল্যমান না থাকলে মানুষের আত্মসৃষ্টি তথা মানবতাবাদ কী অবলম্বন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে? ভালোমন্দ, ন্যায়ান্যায়, পাপপুণ্যের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা কি তবে কিছুই থাকবে না? তবে কি সামাজিক প্রয়োজনমতো মানুষ সে সংজ্ঞা বদলিয়ে চলবে? মার্ক্সবাদের প্রসঙ্গে আমাদের এ' দু' প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

মার্ক্স বলেছিলেন, ভেবে চিন্তে পরিকল্পনা ক'রে বিপ্লব অর্থাৎ সমাজসংস্থার আমূল পরিবর্তন আনা যায় না; বিপ্লব আসে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে অর্থাৎ তা কার্যকারণে পূর্বনির্ধারিত। তবে তা'তে মানুষের কী ভূমিকা? আর মানুষের মন যে দৈহিক ও মানসিক বোধ এবং অনুভূতির সাহায্যে সত্য নির্ণয় করে ব'লে বলা হচ্ছিল, সে নির্ণয়ও তো শুদ্ধ নির্ণয় হ'তে পারে না: কারণ যে বিষয় সম্বন্ধে সত্য নির্ণীত হচ্চে তার সঙ্গে মানুষের অঙ্গাঙ্গিগত সম্বন্ধ রয়েচে: সেখানে নির্লিপ্ত নিরাসক্ত থেকে সত্য নির্ণয় তো তার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই দেখা যাচ্চে যে মানুষের মনে যে সত্য ধরা দিচ্চে তা', যাকে বলে এ্যাবসোলিউট বা অন্যনিরপেক্ষ সত্য তা' নয়—যে বিষয়ে মানুষ সত্যসন্ধান করচে তার সঙ্গে তার সম্বন্ধ,—অর্থাৎ তার সম্পর্কে সে যে পরিস্থিতিতে রয়েচে তা' দ্বারা সত্য যে রূপে প্রতিভাত হচ্চে তাই তার মনের নিকট ধরা দিচ্চে। তাই সত্যমাত্রই আপেক্ষিক। আইনষ্টাইনের থিয়োরী অব রিলেটিভিটী থেকে জানা গেলো যে অন্যনিরপেক্ষ স্থান বা কাল ব'লে কিছু নেই: স্থান ও কাল ঘটনা দ্বারা নিরূপিত—বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধ দ্বারা নির্ধারিত। কাজেই সত্য নির্ণয়ে মনের সক্রিয় ভূমিকা কী এবং নির্ণীত সত্য হ'তে আহৃত জ্ঞান কার্যকরী করাতে মানুষের মনের কতটা ক্ষমতা রয়েচে, বিপ্লবী মার্ক্সবাদ অনুশীলনে তারও নির্ধারণ প্রয়োজন: কারণ, তা ছাড়া জানা যাবে না বিপ্লবে মানুষের কী ভাবে কতটা হাত রয়েচে। এ' প্রসঙ্গে এ'ও মনে রাখা দরকার যে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মনুষ্যপ্রকৃতির সংজ্ঞা ছিল এই যে তা প্রকৃতির স্থায়ী অঙ্গ ও অংশ—প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত এবং সে নিয়ম অনুসারেই তার বুদ্ধি, চিন্তা, বোধ ও অনুভূতির উদ্ভব। ডারউইন যখন বললেন যে সৃষ্টির আদি থেকেই মানুষ স্বতন্ত্র সংজ্ঞারূপে বিদ্যমান ছিল এমন নয়—জীবের বিকাশক্রমে তার উদ্ভব হয়েচে, তখন তার প্রকৃতি তথা বুদ্ধি, চিন্তা, বোধ ও অনুভূতির বিকাশের ইতিহাসকেও বিবর্তনবাদের সঙ্গে সুসমঞ্জস করার প্রয়োজন দেখা দিলো। মার্ক্স কিন্তু মানুষের সমষ্টিসত্তাতে বিবর্তনবাদকে আমল দিলেন না: বিপ্লবের মাধ্যমে মানবসমাজের বিবর্তনের সংজ্ঞাকেই দ্বন্দসমন্বয়ের প্রয়োজনে বজায় রাখলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রকৃতিভিত্তিক বস্তুবাদ এবং ফিউয়েরবাকের মনুষ্যভিত্তিক বস্তুবাদ উভয়ই তাঁর নিকট অগ্রাহ্য হ'লো।

কিন্তু ফিউয়েরবাক মানুষকে যেভাবে দেখেছিলেন তা' না হয় দুর্বোধ্য

ছিল, মানুষের সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ তিনি করেননি, তাকে এক ও অদ্বিতীয় ব'লে ধ'রে নিয়েচেন, তার চেতনা তার অস্তিত্ব দ্বারা গঠিত বলেছিলেন অথচ সে অস্তিত্ব কী নিয়মে ক্রিয়া করে তার ব্যাখ্যা করেননি; তবে মার্ক্সওতো মানুষের ক্রমবিকাশ হিসাবে আনেননি—অন্য মানুষের সঙ্গে তার সামাজিক সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠবার পূর্বে তার প্রকৃতি কীভাবে ক্রিয়া করেচে তার সন্ধান নেননি, সে প্রকৃতিই যে তাকে অন্যের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ মানতে প্রবৃত্ত ক'রে থাকতে পারে তা ভেবে দেখেননি, হয় তো মানুষের প্রকৃতি শুধুই পরিবর্তনশীল নয়—তার মধ্যে স্থায়ী পদার্থও রয়েচে: মানুষ একই সঙ্গে মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়ার সাহায্যে নিজের অস্তিত্ব গ'ড়ে তুলেচে—এক থেকে অন্য হয়েচে এমন নয়—তবে অবশ্যই মানতে হবে যে মন জড়পদার্থে গঠিত জীবদেহেই ক্রিয়া করচে, অতএব তা সর্বাগ্রে জড়-পদার্থেই অস্তিত্ব লাভ করেচে: মার্ক্স মানুষের সামাজিক ইতিহাস গ'ড়ে উঠবার আগে তার মনের প্রক্রিয়া কী ছিল তার বিশ্লেষণ করেননি—সেহেতু তিনি বাস্তববাদকে যেভাবে দেখেচেন তা খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ; তিনি কোনো স্থায়ী নৈতিক মূল্যমান আছে ব'লে স্বীকার করেননি অথচ তা' না স্বীকার করলে তার নীতিরক্ষার জন্য অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অস্তিত্ব মানতে হয়—নতুবা নৈতিক মূল্যবোধের অস্তিত্বই অস্বীকার করতে হয় এবং মার্ক্স তাই করেছিলেন, অথচ কার্যক্ষেত্রে তাঁর মতবাদেও ধর্মসুলভ গোঁড়ামির ছাপ পড়েচে—মার্ক্সবাদপ্রসঙ্গে আমাদের এ সব প্রশ্নের মোকাবিলা করার প্রয়োজন হ'লো। প্রয়োজন হ'লো এ কারণে যে মানবতাবাদকে মার্ক্সবাদ কোন্ দিক দিয়ে পুষ্ট করেচে বা না ক'রেচে তা আলোচনা প্রসঙ্গে এ সব প্রশ্ন বিচারের প্রয়োজন রয়েচে। তা' করতে হ'লে মার্ক্সবাদের গোড়ার কথাটাও একটু আলোচনা ক'রে দেখতে হয়।

বিশেষ ক'রে তাঁদের কথা যাঁরা মার্ক্সবাদের মূল থিয়োরীর বৈজ্ঞানিক সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেচেন—বলেচেন যে, অর্থনৈতিক কার্যকারণ সম্বন্ধীয় যে ব্যাখ্যা সে মতবাদের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তার মধ্যেও এমন কিছু নূতন যুগান্তকারী ব্যাপার নেই যাতে মানুষকে বিরাট সৃষ্টির বা ধ্বংসের ক্ষমতা দিতে পারে। সেকথা যদি সত্যও হয় তবু মার্ক্সবাদ কী ক'রে বিরাট বৈপ্লবিক ভূমিকা লাভ ক'রলো এবং দুনিয়াজোড়া এক বিরাট আন্দোলনের প্রেরণা সৃষ্টি করলো তা' বুঝতে হবে এবং তাতে মানবতাবাদকে

এগিয়ে নিয়ে গেলো অথবা গেলোনা তার সন্ধান নিতে হবে। এ কথা অবশ্য সত্য যে মার্ক্সবাদ মাটি ফুঁড়ে বেরোয়নি—পূর্বতন দর্শন, বিপ্লবাত্মক রাজনৈতিক মতবাদ এবং অর্থনৈতিক মতবাদকে অবলম্বন ক'রেই গ'ড়ে উঠেচে। মার্ক্স ও অন্য কোনো রকম দাবী করেননি। কিন্তু তিনি বলেচেন যে ইতিহাসের গতিপথে যে শ্রেণী যখন সামনে আসে তখনই তার প্রয়োজনীয় মতবাদের উদ্ভব ঘটে, অতএব আইডিয়া বা মতবাদের উদ্ভবকে অর্থনৈতিক বিবর্তনের অনুসারী বলা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, প্রোলিটেরিয়েট বা সর্বহারাশ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এবং তারই প্রয়োজনে কম্যুনিজম বা সাম্যবাদের আবির্ভাব ঘটেচে। এরই উত্তরে বলা হ'য়েচে, আইডিয়া হিসাবে সাম্যবাদ অথবা সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেচে সর্বহারাশ্রেণীর আবির্ভাবের বহু পূর্বে: বস্তুতঃ এর পূর্বে যাঁরা সমাজতন্ত্রকে আদর্শরূপে উপস্থাপিত করেছিলেন মার্ক্স ও তাঁর সহকর্মী এঙ্গেলস তাঁদেরে বিদ্রূপ করেছিলেন এই ব'লে যে, তাঁরা উটোপিয়ান বা আকাশচারী-সমাজতন্ত্রী—সর্বহারাশ্রেণীর জন্ম না হ'তেই তাঁরা নিজেদের মস্তিষ্ক থেকে সমাজতন্ত্রবাদ পয়দা করেচেন। কিন্তু এতেই কি প্রমাণ হ'লো না যে আইডিয়ার বিবর্তন অর্থনৈতিক বিবর্তনের অপেক্ষা রাখেনা? তা ছাড়া মার্ক্স যে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন অর্থাৎ বলেছিলেন যে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস তার অর্থনৈতিক বিবর্তনের আকারে ও পরিপ্রেক্ষিতে রূপ লাভ করে, সে কথাও নূতন নয়,—ইতিহাস সম্বন্ধে পূর্বতন কল্পনা থেকেই মার্ক্স যুক্তিসংগতভাবে তাঁর মত গ'ড়ে তুলেছিলেন। অবশ্য সে মতও বিচারসাপেক্ষ।

ভিকো বলেছিলেন, মানুষ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে নিজেকে নিজে সৃষ্টি ক'রে চলে। সে কথা পূর্বে উল্লেখ করেচি। হার্ডার যে বলেছিলেন যে মানুষ মুখে ভাষা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, সে কথাও বলেচি। হেগেল আইডিয়ার দ্বন্দ্বসমন্বয়ী ধারা বেয়ে মানুষের অগ্রগতি নিরীক্ষণ করেছিলেন। তারপরই এলো আইডিয়ার মূলে বাস্তবের ক্রিয়ার স্বীকৃতি: গুইজো ও অন্যান্য ফরাসী ঐতিহাসিকেরা মানুষে মানুষে যে সামাজিক সম্বন্ধ রয়েচে তা' বিশ্লেষণ ক'রে দেখালেন যে সম্পত্তির মালিকানা কোন শ্রেণীতে বর্তাচ্চে এবং অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে তার কী সম্পর্ক, তা' দ্বারাই সামাজিক ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত হচ্চে এবং তারই মধ্যে রাষ্ট্রিক বিপ্লবের বীজও উপ্ত রয়েচে। তাঁরা বলেছিলেন, যে শ্রেণী সমাজে

আধিপত্য করছে তার মতই জনমত ব'লে চ'লে যায়। অর্থনৈতিক কার্যকারণের মধ্যে সমাজ বিবর্তনের মূল্য নির্ধারণে মিচেলেতের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সপ্তদশ শতাব্দীর এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের চিন্তানায়কগণ সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং তার ফলে শ্রমিকশ্রেণী যেভাবে শোষিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, সম্পত্তি জনসাধারণের মালিকানাতে না এলে পর স্বাধীনতা, সাম্য বা ন্যায়বিচার কিছুতেই প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত মালিকানা সমাজে যে স্বার্থবুদ্ধি ও অসাম্য সৃষ্টি করেছে, রুশো তার ক্ষুরধার বিশ্লেষণ ক...ছিলেন। তাঁরা সব এ' করেছিলেন ফরাসী বিপ্লববাদের আওতায়: মার্ক্স ও এঙ্গেলসের সাম্যবাদী ইস্তাহারের বহু পূর্বে। মার্ক্স যাকে আকাশচারী-সমাজতন্ত্রবাদ বলেছিলেন, মানুষের নৈতিক সুবুদ্ধি থেকেই তার উদ্ভব হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবেরও বহুযুগ পূর্বে টমাস মোর ও অন্যান্য অনেকে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার ক'রে গিছলেন। ম্যাব্‌লি ও মোরেলি ছিলেন পাদ্রী: ম্যাব্‌লি বলেছিলেন, ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার মানেই সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করা এবং একদিকে ধন ও অন্যদিকে দারিদ্র্য যত কিছু অনর্থের মূল সেসব ডেকে আনা, মানুষের পশুত্বে পরিণতিপ্রাপ্তি, সামাজিক আচরণে দুর্নীতির উৎপত্তি এবং পরিণামে যুদ্ধ। মোরেলির মত ছিল এই যে মানুষ আদতে খারাপ নয়, সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা যে সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে তাই মানুষকে খারাপ করেছে: ব্যক্তিগত মালিকানা তুলে দেওয়া মাত্র সমাজে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও সুনীতির প্রতিষ্ঠা হ'তে পারবে। এদেরই সূত্র ধ'রে ব্যাবুফ বিপ্লবের নীতি ব্যাখ্যা করলেন; লুই ব্লাঙ্কি বললেন, সমাজের সমবেত সত্তার কার্যকরী শক্তিরূপে একচ্ছত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার। এই মতে ছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বাভাষ। ব্লাঙ্কি অবশ্য নৈতিক বা সামাজিক কোনো তোয়াক্কা রাখেননি: সোজাসুজি ও বিশদরূপে সশস্ত্র বিপ্লবের কার্যসূচী বাৎলে দিয়েছিলেন। মার্ক্সেরও পূর্বে তিনি সাম্যবাদী বিপ্লবের সক্রিয় রূপ নির্ধারণ করেছেন।

এইভাবে সমাজতন্ত্রী বা সাম্যবাদী মতবাদ বিস্তার লাভ করছিল। ভিক্টর হুগো প্রভৃতি লেখকগণ এর প্রচারে সাহায্য করলেন—এমন কি ক্যাথোলিকদের মধ্যে যাঁরা উদারনৈতিক ছিলেন তাঁরা খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ নাম দিয়ে সমাজতন্ত্রবাদকে গ্রহণ ও প্রচার করতে লাগলেন। অতঃপর এ্যারি দ্য সেইণ্ট সাইমন

সমাজতন্ত্রবাদকে বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাসের সঙ্গে সুসম্বদ্ধ রূপ দান করেন। তাঁর সময়ে যন্ত্রশিল্পের যুগ প্রবর্তিত হয়েচে, তিনি তার অর্থনৈতিক মূল বিশ্লেষণ ক'রে তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব উদ্ঘাটন করলেন। তাঁর মত ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ের—তথা সর্বহারাশ্রেণীর বিলোপ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সূচনারূপে প্রতিভাত হ'লো। এমন কি, দর্শনবিদ্যাতেও তার প্রভাব পড়লো: অগষ্ট কোমৎ যে পজিটিভিজম অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকরূপে যা' নিশ্চিত—তাকে ভিত্তি ক'রে জীবনদর্শন গ'ড়ে তুলেছিলেন, তার মূলেও সেইণ্ট সাইমনের একাধারে বিজ্ঞানসম্মত ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সুসমঞ্জস মতের প্রভাব ছিল ব'লে বলা হয়েচে। অর্থনৈতিক কার্যকারণে মানুষের সমষ্টিগত জীবন নিয়ন্ত্রণ এ'ভাবে উদ্ঘাটিত হ'লো ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নিশানা রেখে গেলো।

এইভাবে দেখা যাচ্চে, আইডিয়ারই ক্রমবিকাশে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রে পরিণতি যাচ্ঞা করলে: সে পরিণতি বাস্তবক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব বা তার সমন্বয়ের অপেক্ষা রাখেনি। সমাজতন্ত্র গণতন্ত্রের এ্যান্টি-থিসীস অর্থাৎ বিপরীত নয়—তার পূর্ণতা মাত্র। গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে অগ্রগতি হয়েছে গতিপথে—দ্বন্দ্বসমন্বয়ে নয়। মার্কস্ একেই ব'লেছিলেন আকাশচারী-সমাজতন্ত্র,—বলেছিলেন এ' যুক্তিতে যে, সর্বহারাশ্রেণীর প্রয়োজনে পূর্ণ যে সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজমের উদ্ভব হবে তার আবির্ভাবের পূর্বেই সমাজতন্ত্রের উপরোক্ত কল্পনা জেগেছিল। কিন্তু মার্ক্স যে সময়ে সর্বহারা-শ্রেণীর প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন তখনওতো সে শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেনি। না ঘটুক, তিনি ডায়লিকটিকের সাহায্যে সমাজতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চেয়েছিলেন। তা' হ'লে তখন তো তিনি তা' করতে পেরেছিলেন আইডিয়ারই মাধ্যমে: কারণ, তখন তিনি সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় দেখতে পেয়েছিলেন আইডিয়ারই ক্ষেত্রে—ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের নৈতিক বিদ্রোহে। এঙ্গেলস বলেছিলেন, "জনগণের নৈতিক চেতনাতে যে অর্থনৈতিক প্রথা অন্যায় ব'লে ধার্য হয়েচে, তার মৃত্যু হ'য়ে গেছে বলা চলে।" কিন্তু সে তো হ'য়েচে আইডিয়ারই ক্ষেত্রে: নৈতিক চেতনা তো অর্থনৈতিক বস্তু নয়। স্বাধীনতার জন্যে মানুষের চিরন্তন সংগ্রাম থেকে এ' চেতনার জন্ম: মার্ক্সও প্রথমে একেই কবুল ক'রেচেন।

কাজেই বলা হ'য়েচে যে মার্ক্স যাঁদেরে আকাশচারী-সমাজতন্ত্রী ব'লে বিদ্রূপ ক'রেচেন তা'রা গভীর মনন ও নৈতিক বুদ্ধির সাহায্যে এই সত্যেরই প্রতিষ্ঠা

ক'র্তে চেয়েছিলেন যে সমাজতন্ত্র ব্যতীত গণতন্ত্র পূর্ণ এবং সত্য হ'তে পারেনা। সে উদ্দেশ্যে বিপ্লবের এমন কি সশস্ত্র বিপ্লবের নিশানাও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দিয়েছিলেন। সে বিপ্লব ঘটাবার দায়িত্ব ও অধিকার তাঁরা মানুষেতেই অর্পণ করেছিলেন: তার জন্যে কোনো অতি প্রাকৃতিক বা অতিমানবীয় শক্তির অপেক্ষা রাখেন নি। তাঁদের সে বিরাট কৃতিত্বকে মার্ক্স যথেষ্ট মর্যাদা দেন্‌নি ব'লে সমলোচনা হ'য়েচে। অবশ্য এ' কথা ঠিক যে মার্ক্সের ডায়লেকটিকস্ শুধু আইডিয়াতে সীমাবদ্ধ ছিল না এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি শুধু মানুষের ইচ্ছা বা শক্তির উপর নির্ভর করেননি। তিনি বলেছিলেন যে, উৎপাদনের প্রচলিত পদ্ধতি অকেজো হ'য়ে যাওয়াতে এবং তারই অন্তর থেকে নূতন পদ্ধতির উদ্ভব হওয়াতে, নূতন পদ্ধতিরই প্রয়োজনে পূর্ণ সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের অভ্যুত্থান হ'বে। উৎপাদন পদ্ধতির পূর্বানুক্রমিক ইতিহাস বিশ্লেষণ ক'রে তবে এ' সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন ব'লেই তিনি একে ডায়লেক্‌টিকাল বস্তুবাদ অনুসারী সিদ্ধান্ত ব'লে অভিহিত ক'রে গেছেন। এরও সমালোচনা হ'য়েচে এই ব'লে যে মার্ক্স তবে অতিপ্রাকৃতিক শক্তির স্থলে এক পার্থিব শক্তির প্রতিষ্ঠা মাত্র ক'রে গেছেন: মানুষ কিন্তু আগে যেমন লোকাতীত নিয়তিতে বাঁধা ছিল এখন তেম্‌নি লৌকিক নিয়তিতে বাঁধা পড়্‌লো—নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পূর্বে সে যেমন পায়নি তেম্‌নি এখনও পেলোনা।

অথচ ফিউয়েরবাক ও তাঁর জার্মান শিষ্যেরা যখন বল্‌লেন যে মানুষ তার সহজ প্রকৃতিজাত বুদ্ধি ও যুক্তি অনুযায়ী সমাজ গ'ড়ে তুল্‌বে, তখন মার্ক্স তাঁদের তীব্র সমালোচনা ক'রেছিলেন এই ব'লে যে, তাঁরা যে মানুষের কথা বল্‌চেন সে এক ধোঁয়াটে বস্তু—সে যে কী ভাবে কোন্ নিয়মানুসারে সমাজ গঠন করবে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। ফরাসী দেশের তথাকথিত আকাশচারী-সমাজতন্ত্রীরা কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে ব'লেছিলেন যে মানুষকে বিপ্লবাত্মক পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র স্থাপন করতে হবে। ফিউয়েরবাকও হেগেলের সূত্র অনুসরণ ক'রে বলেছিলেন যে সমাজ এমনি সুসংবদ্ধ সংস্থা যে তার অভ্যন্তরে মানুষ যদি নিজের মঙ্গল অনুসরণ করে, তবে তা'ই সমাজের মঙ্গলের সাথে মিশে গিয়ে সমন্বয় সৃষ্টি ক'রে থাকে; এবং সমাজসমন্বয় হ'লেই বুঝতে হবে, সার্বজনীন সমন্বয়ও বিদ্যমান রয়েচে। মার্ক্স এ সব মত অগ্রাহ্য ক'রে ডায়লেকটিকসের সূত্র ধ'রে ধনতান্ত্রিক সমাজের ধ্বংসপথ আবিষ্কার করলেন। মানুষের ইতিহাস ধ্বংস থেকে সৃষ্টিতে,

আবার সৃষ্টি থেকে ধ্বংসের অভিমুখে চলচে—অর্থনৈতিক শক্তি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেচে। এই সৃষ্টি ও ধ্বংস চক্রেই ঐতিহাসিক প্রয়োজন নিহিত রয়েচে। মানুষ এই প্রয়োজনের অধীন : জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে সে যে উৎপাদনপদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল, জীবিকার্জনের সুষ্ঠুতার জন্যে তার চেয়ে নূতন ও নূতনতর পদ্ধতি গ্রহণ করাই ঐতিহাসিক প্রয়োজনের রূপ নিলে। মানুষ যখন সে প্রয়োজন উপলব্ধি করে, তখনই তার সে প্রয়োজন পূর্ণ করার ইচ্ছা জাগে এবং সে ইচ্ছার বশে কর্মে প্রবৃত্ত হ'য়ে নূতন উৎপাদন পদ্ধতি সৃষ্টি করে। সে প্রয়োজন উপলব্ধির অর্থই স্বাধীনতা—নিজের বাঁচার পরিসর বৃদ্ধি করা। মার্ক্স যে অর্থনৈতিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা বলেচেন তাতে মানুষের স্থান এ ভাবেই নির্দিষ্ট হ'লো, তার সৃষ্টিমূলক ভূমিকা স্বীকৃতি পেলো। আইডিয়া গতি লাভ করলো : সমাজের নিগূঢ় অভিপ্রায়—যে অভিপ্রায় তার ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, যার সম্বন্ধে সে এখনও সচেতন নয়—তাই মানুষের চিন্তাতে ধরা প'ড়ে তাকে নূতন সমাজ গঠনে প্রবৃত্ত করালে। ভিকো ইতিহাসকে মানুষের আত্মসৃষ্টি ব'লে অভিহিত করেছিলেন ; ইতিহাস অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা গঠিত এবং মানুষ তার ধারক ও বাহক—ভিকোর মতের সঙ্গে মার্ক্সের এই মতের সমন্বয় ঘটলো।

তারপরও মার্ক্সের মতের সমালোচনা হয়েচে এই ব'লে যে তিনি সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা পুরাতন রাষ্ট্রের পতন ঘটিয়ে নূতন রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা ব'লে গেছেন ; অথচ ধনিক সমাজের পতন ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যদি অর্থনৈতিক শক্তির স্বয়ংক্রিয় নিয়মানুসারে অবশ্যম্ভাবী হয়, তবে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজন বা অবকাশ থাকে না। আর যদি সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজনই থাকে, তা হ'লে বুঝতে হবে পুরাতন রাষ্ট্রের পতন অবশ্যম্ভাবী নয়। বৃহত্তর শক্তির সাহায্যে তা নিবারিত করা যায়। এখানেই বুঝতে হবে যে অবশ্যম্ভাবী মানে এ নয় যে তা আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে। "অবশ্যম্ভাবীর" অর্থ এই যে পুরাতন রাষ্ট্র ও সমাজের ভিতরে ঘুণ ধরেচে, নূতন দিনের প্রয়োজনে ও পরিপ্রেক্ষিতে তার পতনের সব রকম আয়োজন সম্পূর্ণ : অথচ সে আপনা থেকে পথ ছেড়ে দেবে না। সশস্ত্র বিপ্লবের সাহায্যে তার পতন ঘটাতে হবে এবং তাতেই মানুষের ইচ্ছা ও শক্তি কার্যকরী হবে। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মানে এ নয় যে তাতে আইডিয়ার

কোনো স্থান নেই : আইডিয়াও সেখানে প্রাকৃতিক ক্রিয়ার অন্তর্গত। মানুষের দেহে মনে—তার ইচ্ছা ও শক্তিতে এই আইডিয়া কার্যকরী হ'য়ে তাকেও ইতিহাসের ক্রিয়ার অঙ্গে পরিণত করেচে। মানুষের মস্তিষ্কও উৎপাদনের অন্যতম যন্ত্র—তাতে আইডিয়া রূপলাভ করে এবং মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত ক'রে ইতিহাসসৃষ্টি সম্ভব ক'রে তোলে।

এখানেই মার্ক্স মহামানবতাবাদী– দর্শনের সাহায্যে শুধু জগতের ব্যাখ্যা ক'রে সন্তুষ্ট নন, জগতের মানবীয় পরিবর্তনের দিশারী। রেনেসাঁর যুগ থেকেই মানুষ বুঝেছিল, চিন্তাসবস্ব দর্শন যথেষ্ট নয়, ইতিহাসের মাধ্যমে তাকে কর্মে রূপলাভ করতে হবে। মানুষ তখন সজ্ঞানে ইতিহাসসৃষ্টির প্রেরণা পেলো। সেই প্রেরণাই মার্ক্সবাদে, মানুষের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে, অর্থনৈতিক ক্রিয়ার ভিত্তি-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হ'লো। তাতে মানুষের সক্রিয় ভূমিকা কি আকারে প্রকাশ পেলে তারই খোঁজ আমাদের নিতে হবে। এ কথা তো, এখন বোঝা যাচ্চে যে সমাজতন্ত্র প্রচারে যদিও অনেকে মার্ক্সের পূর্বসূরী ছিলেন—তবু তিনি যে অর্থ নৈতিক সোজা পথে তার ভিত্তি রচনা করলেন, তার মূল্য কম নয়। সশস্ত্রবিপ্লবের সাহায্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা তাঁর পূর্বে ব্যাবুফ, ব্ল্যাঙ্কি এঁরা ব'লে গেছেন। হয়তো তিনি তাঁদেরেই আকাশচারী বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র আপনা থেকে আসবে এ বিশ্বাসে যাঁরা বিপ্লবের বিরোধিতা করেছিলেন। ইতিহাসের অর্থনৈতিক নিয়মানুবর্তিতার কথাও তাঁর পূর্বে কেউ কেউ বলেছিলেন, শ্রম ও তার মূল্যে যে বিষম পারস্পরিক বৈষম্যের দরুণ ধনতান্ত্রিক সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়েচে, তার আবিষ্কারও তার পূর্বেই কেউ কেউ ক'রে গেছেন। সর্বহারাশ্রেণীর পরিপ্রেক্ষিতে তা তাঁরা করেননি—উদারনৈতিক চিন্তাধারার অনুসরণ-ক্রমেই তাঁরা এ সত্যে পৌছেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিহাসের নিছক অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা করেছিলেন বটে ; কিন্তু তা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছুতে চাননি। এ প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ প্রেসিডেণ্ট জেম্‌স ম্যাডিসনের নাম করা যেতে পারে। তাঁকে মার্কিন রাষ্ট্রতন্ত্রের জনক বলা হয়ে থাকে, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই তিনি সমাজের অর্থ নৈতিক গঠন বিচার করেছিলেন। তিনি অবশ্য সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার ন্যায্য ব'লেই বিশ্বাস করতেন ও শ্রেণীসমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে বিভিন্ন গুণ ও প্রবৃত্তিসম্পন্ন লোকেরা বিভিন্ন ভাবে

ও পরিমাণে সম্পত্তি অর্জন করে এবং এই বিভিন্নতায়ই সমাজে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। মতামত ও মতিগতিতেও বিভিন্নতা আসে এবং এই বৈচিত্র্য রক্ষা করাই গভর্ণমেন্টের কাজ। অবশ্য মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বলতে যা বুঝাতে চেয়েছিলেন তা আরও অনেক ব্যাপক ও গভীর। সমগ্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন তার অন্তর্ভুক্ত। অর্থনৈতিক বিকাশ বলতে তাঁরা শুধু উৎপাদনের প্রকরণ ও পদ্ধতি বোঝাতে চাননি—উৎপাদন উপলক্ষ ক'রে যে সব সামাজিক সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে—মায় সমাজের পুরোপুরি অর্থনৈতিক গঠন বোঝাতে চেয়েছিলেন। তাঁদের মতে ইতিহাসের গতি অর্থনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামে : পরিণতি শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখল ও নূতন শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে। এ মতের পূর্বাভাষ মেলে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে : সমসাময়িক ফ্রান্সেও এহেন চিন্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি দ্বারাই রাষ্ট্রের গঠন ও কার্যকরী রূপ নির্ধারিত হয় এবং সে শক্তিরই ক্রিয়াতে যুদ্ধবিপ্লব ঘটে, যুক্তি সহকাবে এহেন মত সেকালেও কেউ কেউ পোষণ করতেন। ফরাসী অর্থনীতিক কদোঁবসেৎ বলেছিলেন, খাদ্যোৎপাদন ও তার আনুষঙ্গিক প্রয়োজনই মানুষকে এগিয়ে চলাব প্রেবণা দান করেচে। প্রখ্যাত পণ্ডিত সিসমণ্ডি ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ রূপ উদ্ঘাটিত ক'রে দেখিয়েছিলেন। লক সম্পত্তিব এই সংজ্ঞা নিরূপণ করেছিলেন যে প্রকৃতির অবদানের সঙ্গে মানুষের শ্রমের মিশ্রণে সম্পত্তিব সৃষ্টি হয়েচে। তারই পরে এ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো শ্রমের দ্বারা কীভাবে মূল্য সৃষ্টি হয় তা প্রতিপন্ন করেন। এ কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেচি। মার্ক্স তাঁদেরই সিদ্ধান্তকে এগিয়ে নিয়ে গিছলেন। সমাজে একাধিক শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং তাদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাতের বিষয় তথাকথিত বুর্জোয়া অর্থনীতিকেরাও জানতেন ; কারণ, যে সমাজে এক শ্রেণী পুঁজি খাটাচ্চে ও মুনাফা অর্জন করচে এবং অন্যান্য শ্রেণী শ্রম দিয়ে মজুরী পাচ্চে, তাতে যে একাধিক শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে এবং তাদের মধ্যে পরস্পর সংঘাত রয়েচে তা' আর কাউকে 'বলে দিতে হয় না। শ্রমিক যে শ্রম দিয়ে শুধু মূল্য (অর্থাৎ সম্পদ) নয়—অতিরিক্ত মূল্যও সৃষ্টি করচে অর্থাৎ সে যে মূল্য পাচ্চে তার চেয়ে বেশী মূল্য সৃষ্টি করচে এবং মালিক সে অতিরিক্ত মূল্য আত্মসাৎ করচে—এ.সত্য ও রিকার্ডোর অনুসারী অর্থনীতিবিদগণ ব্যাখ্যা ক'রে বলেছিলেন। কাজেই দেখা যাচ্চে, শ্রমিক—তথা সর্বহারাশ্রেণীর স্বার্থে এবং তারই দৃষ্টিকোণ

থেকে অর্থনৈতিক সত্যের আবিষ্কার সর্বহারাশ্রেণীর উদ্ভবের অপেক্ষা রাখেনি : বুর্জোয়া উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদরাই তা' ক'রে গেছেন। এমন কি, অর্থনীতির পণ্ডিত না হওয়া সত্বেও এবং নিছক মানবিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার ক'রেও কেউ কেউ বুঝতে পেরেছিলেন যে অধিকাংশ লোক তাদের শ্রমার্জিত মূল্যের অত্যল্প অংশই ভোগ করতে পেয়ে থাকে। বহু উদারনৈতিক মনীষী অনুরূপ মত প্রচার ক'রে গেছেন এবং উদারনৈতিক চিন্তাধারা অনুসরণ ক'রেই মার্ক্সীয় অর্থনীতির সৃষ্টি হয়েচে। যে অর্থনীতি যে শ্রেণীর পরিচায়ক অর্থাৎ পরিচালনাধীন সে অর্থনীতির উদ্ভব সে শ্রেণীর আবির্ভাবের উপর নির্ভর করে, এমন প্রমাণ মেলেনি। তা' না মিলুক : একথা তো অস্বীকার করবার যো নেই, যে পুঁজিবাদী শ্রেণী কর্তৃক শ্রমিকের শ্রমের অতিরিক্ত মূল্য আত্মসাৎ হবার ফলে যে সর্বহারা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েচে, মার্ক্স সারা জাহানের অর্থনীতিতে তার ঘাতপ্রতিঘাতের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেচেন এবং তা' তাঁর যুগান্তকারী অবদান হয়ে রয়েচে। সে অগ্নিগর্ভ বিশ্লেষণ নিখিল মানবজাতির মনে দাবদাহ সৃষ্টি করেচে, এ সত্য অস্বীকার করতে পারে এমন কেউ নেই।

তবু এ মর্মে সমালোচনা হয়েচে যে মার্ক্স মানুষকে অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অধীন ক'রে দেখিয়েচেন, তার নিজের ভাগ্যসৃষ্টির অবকাশ রাখেননি। এ সমালোচনার মোটামুটি বিচার আমরা ইতিপূর্বে করেচি। বস্তুত এ সমালোচনা যদি সত্য হ'তো, তবে মানবতাবাদ প্রতিহত হ'য়ে থাকতো—অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কাল্পনিক অধীনতা হ'তে মুক্ত হ'য়ে পার্থিব শক্তির দ্বারা পরাভূত হ'তো। অন্য পক্ষে আবার এমনও সমালোচনা হয়েচে যে মার্ক্স সশস্ত্র বিপ্লবের সাহায্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ব'লে গেছেন এবং ডায়লেক-টিকাল বস্তুবাদী নির্দেশ অনুযায়ী সমাজতন্ত্রই এখন দুনিয়ার বিধেয় হয়েচে, মানুষ বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ে দুনিয়ার রূপান্তর ঘটাবে; কিন্তু এও তো সত্য যে দুনিয়ার মোকাবিলায় মানুষের শক্তির সীমা আছে : সে যদি সে সীমা অতিক্রম ক'রে প্রকৃতির বিধান ও নিজের প্রকৃতিও লঙ্ঘন করে, তবে বিপর্যয় ঘটবে। সোজা কথায় এ সমালোচনার অর্থ এই যে, অতিরিক্ত বলপ্রয়োগে মানুষের স্বাভাবিক প্রগতি বিঘ্নিত হবে—যেমন হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে। মাত্রাহীন বলপ্রয়োগজনিত বিপদের সম্ভাবনা মার্ক্সবাদে অন্তর্নিহিত রয়েচে কিনা তা আমরা পরে আলোচনা করবো। এখন আমরা দেখচি এই যে, এ কথা যদি সত্য হয় যে মার্ক্স মানুষকে এক পার্থিব নিয়তির

অধীন ক'রে দেখিয়েছেন, তার নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অবকাশ রাখেননি, তা'হলে তিনি নিশ্চয়ই এ'কথা বলতে চাননি যে, মানুষ হিংস্র বিপ্লব দ্বারা দুনিয়ার রূপান্তর এবং তার নিজেরও পরিবর্তন ঘটাবে এবং তাতে বাড়াবাড়ি হ'লে পর বিপদের সম্ভাবনা আছে। মানুষ একাধারে বলহীন এবং অযথা বলপ্রয়োগের শক্তির অধিকারী, এ' পরস্পরবিরোধী কথা এবং এ' সত্য হ'তে পারে না। এ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা সত্য অথবা উভয়ই আংশিক সত্য এবং তাদের কোনো সমন্বয় সম্ভব কি না, তা আমরা পরে দেখবো। হয়তো তখনই আমরা মার্ক্সীয় মানবতাবাদের নিশানা পাবো : নৈতিক মূল্যবোধকে তা কীভাবে অবলম্বন ক'রে আছে তা'ও উপলব্ধি করতে পারবো।

কথা উঠেচে যে মার্ক্স স্থায়ী নৈতিক মূল্যবোধ কিছু আছে ব'লে মানতেন না : তাই তাঁর মতবাদে বিভ্রম বা বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা রয়েচে। কিন্তু বুর্জোয়া চিন্তাবিদদের মধ্যেও এমন কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে নৈতিক মূল্যবোধে পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা স্বীকার করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ধনিক বা অভিজাত সমাজে বৈরাগ্যবাদের মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু সমাজতন্ত্রী সমাজে কেউ হয়তো এমন মনে করবার অবকাশই পাবে না যে বৈরাগ্যবাদের কোনো বিশেষত্ব বা মহিমা আছে। ফিউয়ের-বাকপন্থীরা বলতেন, নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষা করা সমষ্টির কর্তব্য : বিভিন্ন স্বার্থের সুসমন্বয় হ'লে পর সমাজে নৈতিক সামঞ্জস্য আপনা থেকেই আসবে : ব্যক্তির তাতে কোনো দায় বা দায়িত্ব নেই। মার্ক্স অবশ্য এ ধরণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা কবুল করতেন না : সমষ্টির প্রয়োজনে মূল্যবোধ নির্ধারিত হবে এবং ব্যক্তিও হবে তারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এই ছিল তাঁর মত।

তবে কি তিনি মানুষের ইতিহাসে যে সব মূল্যবোধ—যথা, দয়ামায়া, করুণা, ন্যায়ান্যায়বোধ ইত্যাদি গ'ড়ে উঠেচে, সে সবের কোনো মূল্য দিতেন না? তাই বা কেমন ক'রে হতে পারে? মার্ক্স তো তাঁর পূর্বতন চিন্তা ও কর্মের ভাণ্ডার সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ক'রেই গভীর মনন ও অনুশীলনের সাহায্যে নিজ কর্ম ও চিন্তা সংযোজন করেছিলেন। ডেকার্টের সময়েও জানা যায়নি মন ও জড় পদার্থের মধ্যে কী সম্বন্ধ, তাদের সত্তা ও গতি স্বতন্ত্র ব'লেই গণ্য ছিল এবং তার ফলে দার্শনিক চিন্তাও ব্যাহত হয়েছিল—কারণ উভয়েরই মূলে অতিপ্রাকৃতিক শক্তি রয়েচে এবং তারই দ্বারা তারা চালিত হচ্চে, এ বিশ্বাস ডেকার্টই শিথিল ক'রে দিয়েছিলেন। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি—বিশেষ ক'রে জীবতত্ত্ব ও শরীরতত্ত্বের বিকাশের ফলে জানা গেলো যে মানুষের নৈতিক চেতনা তাঁর জীবনবিকাশেরই অঙ্গীভূত : তার কোনো স্বতন্ত্র ইতিহাস নেই। ফিউয়েরবাকের মতপ্রসঙ্গে আমরা এ' বিষয় আলোচনা করেচি। মার্ক্স এসে প্রতিপন্ন করলেন যে মানুষের চেতনা তার অস্তিত্বদ্বারাই নিরূপিত—অর্থাৎ জড়পদার্থ থেকেই মনের সৃষ্টি। বিজ্ঞান আবিষ্কার করলে যে, যে জড়পদার্থঘটিত অবস্থার সমবায়ে প্রাণের জন্ম, আদিকাল থেকেই তার অস্তিত্ব ছিল এমন নয় : অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই তা ঘটেচে। মানুষের চেতনা প্রাণেরই অঙ্গ : অতএব তার দৈহিক অস্তিত্বদ্বারাই তা নিরূপিত, এ'তে কোনো সন্দেহ নেই। তা' যদি হয় তবে মন ও পদার্থজগৎ স্বতন্ত্র নয়—এক থেকেই অপরের উদ্ভব। পদার্থই আদি সত্য : চেতনা, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, মন, ধারণা সবই জীববিকাশের ফল। যে জগৎকে আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানি তাই সত্য, অতিজাগতিক যে সত্য আমরা কল্পনা ক'রে থাকি তা' মিথ্যা। বস্তু ও মন, বাস্তবজগৎ ও ভাবজগৎ উভয়ই সত্য। তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের উদ্ঘাটন করাই দর্শনের কাজ। আধ্যাত্মিক জগতের অস্তিত্ব কল্পনা ক'রে মনকে আত্মার সৃষ্টি ব'লে বলা যেতে পারে : কিন্তু তার মধ্যে যুক্তি নেই, মানুষের অভিজ্ঞতায়ও তেমন কিছু ধরা পড়ে না। জীববিদ্যার বিকাশক্রমেই জানা গেছে যে এ' বিশ্বজগতের কোনো দ্বৈত অস্তিত্ব নেই : মানুষ ও অপর প্রাণীর অস্তিত্ব একই ধারা হ'তে উদ্ভূত। এইই জগতের যান্ত্রিক বস্তুবাদী রূপ। মানুষ তার ইন্দ্রিয়ের উপর বহিপ্রকৃতির যে ক্রিয়া হচ্চে তা' অনুধাবন করে, সত্য নির্ধারণ করতে সক্ষম হয় এবং তারই জোরে ধর্মের আবরণে যে সব কুসংস্কার তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেচে তার ঐতিহ্য চূর্ণ ক'রে এগিয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বস্তুবাদী চিন্তাকে মার্ক্স আমল দেননি : তিনি দ্বন্দ্ব ও তার সমন্বয়ের উপরই জোর দিয়েছিলেন। তথাকথিত আকাশচারী-সমাজতন্ত্রীদেরে তিনি উপহাস করতেন—যদিও তাঁরা সমাজে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তবু তিনি আধুনিক বিজ্ঞানকে অবলম্বন ক'রে নিজে যা কাজ করেচেন তা তাঁকে ডেমোক্রিটস থেকে শুরু ক'রে যে ক'জন মহামনীষী মানবজাতির চিন্তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁদের সমপর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করেচে। মানুষের চেতনা তার দৈহিক সত্তাদ্বারাই নিরূপিত হয়—মার্ক্সের এই সিদ্ধান্তে বিশ্বজগৎ

এক অখণ্ড, অদ্বৈত সত্তারূপে আত্মপ্রকাশ করলো : মনকে বস্তু থেকে স্বতন্ত্র ক'রে এক রহস্যময় অধ্যাত্মলোক সৃষ্টির অবকাশ আর রইলো না। অবশ্য অখণ্ড সত্তার অর্থ এ' নয় যে তার বিকাশ একই ধারা অনুসরণ ক'রে চলবে। পাত্রভেদে তা' বিচিত্র পবিবেশেব মধ্য দিয়ে বিচিত্রভাবে পরিস্ফুট হবে।

সেই বিকাশের দায়িত্ব মানুষের নিজের এবং সেখানেই তার নিজ ভাগ্য-গঠনের অবকাশ। আদিকাল থেকেই মানুষ বাঁচবার জন্যে সংগ্রাম ক'রে আসচে। সে সংগ্রামই যে মনুষ্যসত্তার মূল প্রেরণা, জীববিদ্যায় এ' সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েচে। মার্ক্স বলেচেন যে জীবিকা অর্জনেব প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে মানুষের জীবন অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রনাধীন হয়েচে। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেচি যে মার্ক্সেব এ' মতকে কেউ কেউ ভুল বলেন এ' যুক্তিতে যে মানুষের অর্থনৈতিক সত্তা গ'ড়ে উঠেচে অনেক পরে, কিন্তু তাঁর বেঁচে থাকাব সংগ্রামেব শুরু আদিকাল থেকে এবং তখন ও তা' থেকেই তার মন সক্রিয় হয়েচে ও চেতনা জন্ম নিয়েচে। তাবপব অবশ্য যে দৈহিক অবস্থাতে তার অস্তিত্ব ও বিকাশ ঘটেচে তাতে তার সামগ্রিক বিবর্তন প্রভাবিত হয়েচে : কিন্তু তার দরুণ এ' কথা বলা যায় না যে মানুষ সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক নিযন্ত্রণাধীন, ইতিহাসেব বস্তুবাদী ব্যাখ্যা থেকে তেমন কোনো সিদ্ধান্ত আসে না। আব তা' যদি হ'তো তবে মানুষের নিজের ভাগ্য গঠনে তাব কোনো হাত থাকতো না : সে নিজে উৎপাদক না হ'য়ে উৎপাদনেব অন্যতম যন্ত্র মাত্রে পবিণত হ'তো। এ' স·'লোচনা প্রসঙ্গে আগেই বলেচি যে মার্ক্স হয়তো মানুষেব আ'দিম জীবনসংগ্রামকেই কালক্রমে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণে পরিণত হ'তে দেখেছিলেন। বস্তুবাদী দ্বন্দ্বসমন্বয়ের মধ্য দিয়ে মানুষেব সৃজনী প্রতিভার কার্যকারিতা মার্ক্সীয় চিন্তাতে কীভাবে প্রতিভাত হ'য়েচে তা' পূর্বে আলোচনা করেচি। মার্ক্স যে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বকে বিপ্লবে সার্থক করার ভূমিকা মানুষের সৃজনী প্রতিভারই উপর ন্যস্ত ব'লে বলেছিলেন তা' কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বিপ্লবের সাহায্যে জগতের পরিবর্তন ঘটানোতে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী, বিপ্লবের পুরোধারূপে তিনি ছিলেন ষোলো-আনা মানবতাবাদী। যাঁরা তার দার্শনিক বা অর্থনৈতিক মতবাদ গ্রহণ করেননি তাঁরাও অস্বীকার করতে পারেননি যে মার্ক্স যে বিপ্লবের প্রয়োজন ও সম্ভাব্যতা বিবৃত ক'রেছিলেন, তার বিরাট নৈতিক অবদান রয়েচে—জলন্ত

সত্যনিষ্ঠা ও যুক্তিনিষ্ঠ সত্তাতে তা' উদ্দীপ্ত হয়েচে। তা' হলে এমন কথাই বা বলা যায় কি ক'রে যে নৈতিক মূল্যবোধকে মার্ক্স কোনো দাম দেননি? সামাজিক অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি গর্জে উঠেচেন, শোষিত অত্যাচারিত জনগণের মুক্তির জন্যে একাকী দুর্জয় সংগ্রাম করেচেন। গভীরতম নৈতিক শক্তির অধিকারী না হ'লে এ' সম্ভব হ'তো না। বস্তুত তাঁর সমস্ত রচনাই অনৈতিকতা, অসাম্যের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদ। নীতির বুলি মুখে নিয়ে যেভাবে নীতি-বিরুদ্ধ রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রথার সমর্থন করা হয়ে থাকে, হয়তো তাই দেখে শুনে মার্ক্স নিজে আর নীতিকথা উচ্চারণ করেননি। তবু ইতিহাসে তাঁর নৈতিক প্রভাব বিরাট ও সুদূরপ্রসারী হ'লো। তিনি বলেছিলেন: সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লে পর মানুষের বুদ্ধি মুক্তিলাভ করবে; বহুযুগসঞ্চিত অবুদ্ধি দুর্বুদ্ধির প্রভাব তার জীবন থেকে বিদায় নেবে: মানুষ নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের শক্তিলাভ করবে। এই বাণী মানবতাবাদের বাণী, মুক্তিদায়িনী বাণী, মহত্তম নৈতিকতাতে উদ্বুদ্ধ বাণী। এই বাণী সঞ্চিত হয়েচে নিখিল মানবজাতির নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারে; এতে রয়েচে শ্রেণীনির্বিশেষে সব মানুষের পথনির্দেশ, মানবের ভবিষ্যৎ পথযাত্রার পাথেয়।

যেদিন জানা গেলো, জড়পদার্থ একটা বিশেষ স্তরে পৌছুলেই প্রাণের সৃষ্টি হয় সেদিনই জীববিকাশের মধ্য দিয়ে মানুষের আবির্ভাবের সূত্র আবিষ্কৃত হলো। জীববিকাশের সর্বোত্তম প্রকাশ হিসেবে মানুষ প্রতিষ্ঠা পেলো। মানবতাবাদও দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি লাভ করলো। বস্তুবাদী দর্শনের পশ্চাদভূমিতে মানবতাবাদই মানুষের শ্রেষ্ঠ জীবনদর্শন; প্রাকৃতিক বিধি-বিধানকে মেনে নিয়েও মানুষের নিজস্ব স্বাধীনতা ও সৃষ্টিপ্রতিভা প্রয়োগের বিরাট অবকাশ এ'তে রয়েচে। এ'তে মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধির সমন্বয় ঘটেচে; মানুষের স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক সহযোগিতা ও সংগঠনের সামঞ্জস্য হয়েচে। এতে প্রতিপন্ন হয়েচে যে মানুষের ভেতরে ন্যায়ান্যায়বোধ, উচিত-অনুচিত জ্ঞান জাগিয়ে রাখার জন্যে তার অন্তরের সহজাত যুক্তি-সংগতির উপর নির্ভর করলেই চলতে পারে। সমষ্টিবোধের সঙ্গে সহজাত ন্যায়বুদ্ধির মিলনই বস্তুবাদী নীতিবিজ্ঞানের একমাত্র উৎস।

কিন্তু কী তার নিরিখ ও পরীক্ষা? কীসে বোঝা যাবে যে ন্যায়ান্যায়-জ্ঞান কার্যকরী রইলো? ন্যায়বিচারের দুরন্ত আগ্রহে উদ্দীপ্ত ছিলেন

মার্ক্স—বিরাট জনগণের বাঁচবার দাবীকে সার্থক করবার ব্যাকুলতায় উন্মত্ত-প্রায়। মানবজাতির ইতিহাস মন্থন ক'রে তিনি রাষ্ট্র ও সমাজের শ্রেণীরূপ উদ্‌ঘাটিত করেচেন, দেখিয়েচেন কীভাবে শাসকশ্রেণী অপর শ্রেণীর বাঁচবার দাবী অগ্রাহ্য বা অবহেলা করে: সে দাবী আদায় করবার জন্যে বিদ্রোহ করা ছাড়া উপায় থাকে না। ন্যায্য অধিকারেব জন্যে সেই যে সংগ্রাম তার অন্তর্নিহিত রূপই ন্যায়রূপ—মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে ন্যায় ও সাম্যবিধানের প্রয়াসে অনুপ্রাণিত রূপ। সে সংগ্রাম আপনাআপনি নিজ নৈতিক মান সৃষ্টি ও কার্যকরী করে: অন্যায়ের অবকাশ তাতে নেই। কিন্তু অমোঘ, নির্মম, নির্বিকার তার বিধান: তাতে দয়া নেই, ক্ষমা নেই, অত্যাচারী শাসক ও শোষকের সঙ্গে কোনো আপোষ নেই। দয়া, ক্ষমা, তিতিক্ষাকে তো শাসকশ্রেণীই ধূলায় লুটিয়ে দিয়েচে: ন্যায়চক্রের আবর্তনে তাদেরে আর কোথায়, কেমন ক'রে ফিরিয়ে পাওয়া যাবে? তবু এমন কোনো প্রমাণ নেই যে মার্ক্স চাইতেন যে প্রতিশোধের অনলে সব জ্বলে পুড়ে যাক্, উন্মার্গগামিতা সমাজকে আচ্ছন্ন করুক। তিনি বলেছিলেন, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দ্বন্দসমন্বয় হবে, সমাজ আবার নূতন রাষ্ট্রকে আশ্রয় ক'রে মানুষের সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপকরণ উৎপাদনের কাজে এগিয়ে নিয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য সংস্কৃতিরও বিকাশ ঘটবে: সমাজ আত্মভ্রষ্ট হ'য়ে নিজ সৃষ্টিমূলক পথাগ্রগতিকে ব্যাহত করবে, এ' তিনি কখনও চাননি। ন্যায়েব তুলাদণ্ড হাতে নিয়ে মানুষ বিপ্লবের সাহায্যে, হারানো ভারসাম্য ফিরিয়ে এনে নিজের চলার পথ সৃষ্টি করবে, মার্ক্সীয় মানবতাবাদের এই মর্মকথা।

কিন্তু তিনি যে হিংস্র বিপ্লবের পথ বাৎলে দিলেন, তাতে কি উন্মার্গগামিতার প্রবল সম্ভাবনা নিহিত রইলোনা? এমনি উন্মার্গগামিতায় তো বার বার বিপ্লব আত্মবিচ্যুত হয়েচে—এমন কি প্রতিবিপ্লব ডেকে এনেচে। মানব-জাতির অগ্রগতিতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ঘটেছিল যে মহান ফরাসীবিপ্লবে তাতেওতো পরে বুদ্ধিভ্রষ্টতা দেখা দিয়েছিল, বিপ্লবাধিনায়কদের প্রাণহরণ করেছিল, প্রতিক্রিয়া ডেকে এনেছিল, এবং হিংসা উন্মত্ততায় পৌছেছিল ব'লেই এমন ঘটেছিল। তাই কথা উঠেচে, হিংসার অনুসরণ করলে বুদ্ধি তো আর মুক্ত থাকে না: তবে কি বলতে হয় যে মার্ক্স হিংসার কথা ব'লে মানুষের বুদ্ধিভ্রষ্টতার প্রশ্রয় দিয়েচেন এবং তাতেই মানবতাবাদের ব্যত্যয়

ঘটেচে? কিন্তু মার্ক্স তো আর হিংসার প্রবর্তন করেন নি, তার অনেক আগে থেকেই রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্মীয় সংস্থায় হিংসার উদ্দাম তাণ্ডব চ'লে আসচে। হিংসায় প্রতিষ্ঠিত যে রাষ্ট্র ও সমাজ, শুধু হিংসা দ্বারা যে আত্মরক্ষা করচে, তাকে অপসারিত করবার উপলক্ষে যে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, তার দায়িত্ব বিপ্লবী জনগণের নয়—সে দায়িত্ব সেই মরণাহত রাষ্ট্রের ও সমাজের—জনগণমনে যার আর সমর্থন নেই, জনজীবনে যার সার্থকতা নিঃশেষে ফুরিয়েচে, দ্বন্দ-সমন্বয়ী নির্দেশে কার্য্যত যার বিলোপ ঘটেচে অথচ সে রাষ্ট্র ও সমাজ আত্মরক্ষার হিংস্র আয়োজনে—যথা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে এবং অন্যবিধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে, নিজেকে টি'কিয়ে রাখতে চাইচে। তা' ছাড়া, বাঁচবার বাধা দূর করবার জন্যে যে হিংসার প্রয়োগ সে'তো হিংসারই প্রতিবাদ, হিংসার প্রতিষেধক মাত্র এবং সে হিংসা কি প্রকৃতিরই বিধান নয়? অবশ্য এখানে এসে যায় এক সনাতন প্রশ্ন: উদ্দেশ্য যদি সৎ থাকে, তবে তা পূর্ণ করার জন্যে যে কোনো উপায় গ্রহণ করা কি বিধেয়? সে প্রশ্নের উত্তর অবশ্য আমাদেরেও খুঁজতে হবে; কিন্তু উপায়ের ঔচিত্য অনৌচিত্যের দায় কি শুধু সেই জনসাধারণের উপর চাপাতে হবে যাকে দাবিয়ে রাখার জন্যে শাসকশ্রেণী যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে কসুর করে না? যে বিপ্লব মানবজাতির অগ্রগতির ধারক ও বাহক, যা' ভিন্ন এগিয়ে যাবার সব পথ রুদ্ধ হ'য়ে গেছে, তার শুরু হয় বিপ্লবী জনগণের দাবী পেশ করাতে: হিংস্র উপায়ে সে দাবী দমনের আয়োজনই সেখানে প্রতিহিংসা টেনে আনে। আরেক কথা উঠেচে এই যে বিপ্লবের জোয়ার বেয়ে যে শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতার ঘাটে গিয়ে ওঠে, ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য সে একনায়কত্ব—ইংরেজীতে যাকে বলে ডিক্টেটরশিপ—প্রতিষ্ঠা করে: কাজেই দেখা যাচ্চে, মার্ক্সীয় বিপ্লবদর্শনেও একচ্ছত্রতার বীজ উপ্ত ছিল। এর উত্তর এই যে বিপ্লবীরা ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্যে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে কিনা তা' স্বতন্ত্র প্রশ্ন এবং পাছে তা' করে সেহেতু বিপ্লবে বাধা দিতে হবে এ' হেন যুক্তি বিজ্ঞানসম্মত নয়। ট্রট্স্কী বলেছিলেন, বিপ্লব হ'লো গিয়ে ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ইঞ্জিন। তা' যদি হয় তবে তাকে বাধা দেবার কোনো প্রশ্ন নেই: বিপ্লবোত্তর ঘটনার গতিপ্রকৃতি কী হবে, তা পরে বিবেচ্য। ইতিহাস চলচে তার আপন নিয়মে, কারু ইচ্ছায় সে চলচে না: মানুষের দায় শুধু তার নির্দেশ সত্য করা, সেখানেই তার নিজ

ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অবকাশ: বিপ্লব তার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার ছাড়া কিছু নয়: সংক্ষেপে এই মার্ক্সীয় বিপ্লববাদ।

এখানে আবার প্রশ্ন উঠেচে এই যে হিংস্র বিপ্লবের সাহায্যে যদি ইতিহাসের যুগ পরিবর্তনের নির্দেশকে সত্য করতে হয়, তবে তো হিংস্র-তর শক্তির বা প্রতিবিপ্লবের সাহায্যে সে নির্দেশ ব্যর্থ ক'রে দেওয়া সম্ভব হ'তে পারে এবং তা' যদি পারে, তবে ইতিহাসের নির্দেশ সত্য হবেই এমন নিশ্চয়তা রইলো কোথায়? এর উত্তর পূর্বেই মোটামুটি দেওয়া হয়েচে। ইতিহাসের দ্বন্দ্বসমন্বয়ী নির্দেশ আইডিয়ার ও বাস্তবের দিক দিয়ে গতিপ্রকৃতির সম্ভাবনা ও প্রয়োজনমাত্র বহন করে: তাকে সার্থক করবার দায়িত্ব মানু-ষের, এবং সেখানেই তার আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক অর্থাৎ মানবতাবাদী ভূমিকা। ইতিহাসে এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যে ক্ষেত্রে সে ভূমিকা ব্যর্থ হয়েচে, প্রতিক্রিয়া জয়ী হ'য়ে ইতিহাসের গতি পিছিয়ে দিয়েচে। তবে এখন দাঁড়ালো এই যে হিংস্র বিপ্লবের সাহায্যে পুরাতন রাষ্ট্র ও সমাজের অবসান এবং নূতন রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য কিনা আসল প্রশ্ন তা' নয়। পুরাতন রাষ্ট্র ও সমাজ যখন মানুষের অগ্রগতিতে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় তখন তার অপসারণ বৈপ্লবিক কর্তব্য: যদি সে বিপ্লবে হিংসাত্মক পদ্ধতি অপরিহার্য হয় তবে তা' ন্যায়সংগত: বিরুদ্ধ পক্ষীয় প্রতিহিংসার দ্বারা তার পরাস্ত হবার সম্ভাবনা আছে কিনা তা' বিচারের ভারও মানুষের নিজেরই উপর। পুরাতন রাষ্ট্রে ও সমাজে যতটা ঘুণ ধরে—যতটা অকেজো তাকে ক'রে ফেলে, ততই প্রতি-বিপ্লবের সম্ভাবনা ক'মে আসে: কেমন ক'রে পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্রই বিপ্লবের আয়ত্তে এসে যায় তা আমরা এক্ষুনি আলোচনা করবো। তারই পরি-প্রেক্ষিতে মানুষ বিপ্লবী কার্যক্রম স্থির করবে: সফল হবে বা হবেনা তা' নির্ভর করচে তার নিজের উপর—তার বিচারবুদ্ধি ও কার্যকৌশলের উপর। সেখানেই তার মানবতাবাদী ভূমিকা সত্য হ'লো—ইতিহাসের ইংগিত অনুসরণ ক'রে নূতন রাষ্ট্র ও সমাজগঠনের অবকাশ রাখলো। মার্ক্সকথিত বিপ্লবী কার্যক্রম মুক্ত বুদ্ধিরই অনুসারী—তাতে উন্মার্গগামিতার স্থান নেই।

তা' যে নেই তা আরও প্রমাণ হ'লো তখনই যখন মার্ক্স আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনপ্রচেষ্টায়, মাইকেল বাকুনিনের সঙ্গে সহযোগিতা ও তাঁকে বন্ধু ব'লে স্বীকার ক'রেও তাঁর রাজনৈতিক দর্শন সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করলেন: সে দর্শন নৈরাজ্যবাদ নামে অভিহিত। মাইকেল বাকুনিন

ছিলেন রুশ অভিজাতবংশীয়ঃ দেশ থেকে চ'লে এসেও তিনি রুশ সম্রাটের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন ব'লে কথা উঠেছিল; কিন্তু এ' কথা সত্য যে শ্রমিকশ্রেণীর কাজে আত্মনিয়োগের দরুণ একান্ত দারিদ্র্যে তাঁর জীবন কাটে এবং বিষম দারিদ্র্যের মধ্যেই তাঁর জীবন অবসিত হয়। ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার ক'রে তিনি বলতেন, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এক শয়তান রয়েচে এবং তার দ্বারাই মানুষ তাড়িত হচ্চে। সে-ই তার সকল কর্মপ্রেরণার মূল। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ দ্বারা তাকে বাধা দিলে মানুষের ব্যক্তিসত্তা খর্ব করা হয়ঃ অতএব সে সব একান্ত অবাঞ্ছনীয়। এখানে এ' রাজনৈতিক দর্শনের বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেইঃ তবে এ' টুকু স্বীকার করা দরকার যে এহেন অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতার একটা দুর্মদ আকর্ষণ রয়েচে—বিশেষ ক'রে সামাজিক অবস্থা যখন ব্যক্তিত্বস্ফুরণের প্রতিকূল হয় তখনও আবার ব্যক্তিত্বের এহেন স্বাধীনতার প্রবৃত্তি উদগ্র হ'য়ে ওঠে। বাকুনিনের নিজের দুর্দম আবেগের ও কর্মপ্রেরণারও তাই ছিল উৎস। কিন্তু মার্ক্স তার রাশ টেনে ধরলেন এই ব'লে যে তাতে সমাজের মঙ্গলের সঙ্গে সামঞ্জস্যের অভাব রয়েচে—বস্তুত তা সমাজচেতনার বিরোধী। এ' কারণ দেখিয়ে তিনি বাকুনিনের মতবাদকে বিষম ক্ষতিকর ও পাগলামীর পর্যায়ভুক্ত ব'লে অগ্রাহ্য করলেন। প্রুধো ও মার্ক্সের মধ্যে যে বিতর্ক হয় তা' আমরা পরে আলোচনা করবো। বাকুনিন সে প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে প্রুধোর দৃষ্টি ভঙ্গীতে স্বাধীনতার মূল্যোপলব্ধি মার্ক্সের দৃষ্টি-ভঙ্গীর চাইতে বেশী আছে; কিন্তু মার্ক্সের যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দৃষ্টি-ভঙ্গী আছে প্রুধোর তা' নেই। বাকুনিনের এ' মতপ্রসঙ্গেই আবার অনেকে বলেচেন যে যেহেতু বাকুনিনের অর্থনৈতিক জ্ঞান ছিল না সেহেতু তিনি মানুষে মানুষে পরস্পর বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না—তাই মানুষের বল্গাহারা ব্যক্তিত্বকে সম্বল ক'রে রাজনৈতিক দর্শন বাৎলিয়েছিলেন। তাঁর ভাবধারণার মানুষ স্বরাট বটে—কিন্তু অবাস্তব। মার্ক্সের ভাবধারণার মানুষ সমাজকেন্দ্রিক—তাতে বল্গাহারা স্বাধীনতার স্থান ছিল না।

মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে তবে আমরা এই বুঝলুম যে দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদের ক্রিয়াতে যখন দূরপ্রসারী রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়, তখন মানুষের মনে তারই আইডিয়া সঞ্চারিত হ'য়ে তাকে সে পরিবর্তন ঘটবার চেষ্টায় প্রনোদিত করে। বস্তুত আইডিয়া তখন হয় বজ্রগর্ভঃ মনে হয়, যেন পুরাতন

দুনিয়াকে ধ্বংস ক'রে নূতন দুনিয়া গড়্‌বার শক্তি তার মধ্যে রয়েচে। সে আইডিয়া রূপ ধরে মানুষের দেহে মনে, তারই ফলে পার্টির সৃষ্টি হয় এবং পার্টির নেতৃত্ব বিপ্লবকে সত্য ক'রে তোলে। বিপ্লবের প্রয়োজন ও সম্ভাব্যতা মানুষের মন আক্‌ড়ে ধ'রে যুগান্তকারী শক্তিলাভ করে ব'লেই দ্বন্দসমন্বয়ী বস্তুবাদে নির্দিষ্ট পরিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী বলা হয়েচে। বস্তুত এমনই অপ্রতিরোধ্য সে শক্তি যে, মরণাহত রাষ্ট্র ও সমাজ যে হিংসার আয়োজনে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে তাকেও সে দুর্বল ক'রে ফেলে, যাদের দ্বারা সে রাষ্ট্র ও সমাজ বিপ্লবকে প্রতিরোধ কর্‌বে তাদেরেও সে আকর্ষণ ক'রে টেনে নেয়—ফলে সে রাষ্ট্র ও সমাজ আপ্‌না থেকেই ধ্বসে যায়। পুলিশ, সেনাবাহিনী ও পুরাতন রাষ্ট্র যে শ্রেণীর শাসনক্ষমতার আধার ও অবলম্বন, তারও এক, যুগসচেতন অংশকে বারে বারে এই ভাবে বিপ্লবেরই যোগান দিতে দেখা গেছে। যেখানে তা' হয়নি অথবা বিপ্লবী নেতৃত্ব সঠিক ও সুসমঞ্জস পথনির্দেশ দিতে পারেনি সেখানেই বিপ্লব নিবারিত হয়েচে—এমন কি প্রতিবিপ্লবের জয় ঘটেচে। প্রমাণ হয়েচে যে প্রাকৃতিক কার্যকারণ, ঐতিহাসিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্যেও মানুষই তার নিজের ভাগ্যসৃষ্টি করচে। মার্ক্সবাদেও মানবতাবাদেরই জয় ঘোষিত হয়েচে।

এখানে মনে রাখা দরকার যে মার্ক্সবাদ বাঁধাধরা মতবাদ নয়: কী করা উচিত বা না উচিত তা' ব'লে দেবার দায় তার নেই: তা' ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার একটা সূত্রমাত্র। অবশ্য সেই সূত্রেই ধরা পড়েচে যে ইতিহাসের নির্দেশকে পূর্ণ করার দায় মানুষের উপরই নির্দিষ্ট রয়েচে। মার্ক্সবাদ তাই মানবীয় কর্মের নির্দেশক এবং সে নির্দেশে রয়েচে মানুষের মহাস্রষ্টার ভূমিকা, যুগ-প্রবর্তকের ভূমিকা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভূমিকা। এমনি ক'রে মার্ক্সবাদে ঘটেচে মানবতাবাদের একাধারে রূপায়ণ ও স্বীকৃতি।

কিন্তু যেহেতু মার্ক্সবাদ বাঁধাধরা মতবাদ—ইংরেজীতে যাকে বলে ডগমা—তা' নয়, যেহেতু তা' শুধু সেই সূত্র যাকে অনুসরণ ক'রে কাজের নির্দেশ লাভ করা যায়, সেহেতু মার্ক্স তাঁর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যা' বলে গেছেন, ভবিষ্যৎ তাকে অনায়াসে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে ও যাচ্চে। বস্তুত তিনি বলেছিলেন যে যদি কোনোদিন দেখা যায় তাঁর মত আর বিজ্ঞানসম্মত থাকচেনা তবে সে মত ত্যাগ করাই হবে মার্ক্সবাদীর কর্তব্য—এমনও

নাকি বলেছিলেন যে তিনি মার্ক্সবাদী নন্ অর্থাৎ নিজের মতবাদকে গোঁড়ামিতে পরিণত ক'রে আঁকড়ে থাক্তে তিনি রাজী নন্। কম্যুনিজমের প্রসঙ্গে আমরা মার্ক্সবাদের বিবর্তন লক্ষ্য ক'রবার সুযোগ পাবো। এখন আমাদের মনে রাখা দরকার যে পদার্থবিজ্ঞানের যে যুগান্তকারী বিকাশ ঘটেচে ও মানুষের হাতে একাধারে অন্তহীন শক্তির সম্ভাবনা ও সর্বাত্মক ধ্বংসের উপকরণ এনে দিয়েচে, তারই ফলে মানবজাতি ভয়ে বিস্ময়ে থম্‌কে দাঁড়ালো এবং নিজেকে বাঁচাবার জন্যে পারস্পরিক সন্দেহ অবিশ্বাসে বিভক্ত রাষ্ট্রপ্রধানদেরে শান্তিরক্ষায় উদ্যোগী করলো। সর্বনাশা নিয়তির উপর জয়লাভ করবার জন্য মানুষের সেই সংকল্পে মানবতাবাদের একাধারে মহাপরীক্ষার ও মহাসার্থকতার কাল সমাগত। তা' হলে দেখা যাচ্চে যে বিজ্ঞান এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেচে যেখানে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ নিঃশেষে সবাইর মৃত্যু ডেকে আন্‌বে, এবং সেকারণে জাতিতে জাতিতে মোকাবিলায় হিংসা পরিহার কর্‌বার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েচে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আওতায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যে নিশ্চিত সম্ভাবনার কথা মার্ক্স ব'লে গেছেন, তার উপর আধুনিক বিজ্ঞান প্রতিষেধক প্রভাব বিস্তার কর্‌লো এবং পুঁজিবাদী ও তার বিরোধী সাম্যবাদী শক্তির মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা নিবারণেও সে প্রভাব বিস্তৃত হ'লো। শুধু আন্তর্জাতীয় সম্পর্কে নয়—শ্রেণীসংগ্রামেও সে প্রভাব এসে পড়লো: হিংসাত্মক বিপ্লবের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধেও প্রশ্ন এসে গেছে এবং ইতিমধ্যে জনগণের ন্যায়াধিকারের দাবী যেমন জোরদার হয়েচে তাতে হিংসার আশ্রয় না নিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সে অধিকার প্রতিষ্ঠার পথও অনেকটা উন্মুক্ত হয়েচে বলা চলে। এখানেও মানুষের—তথা মানবতাবাদের পরীক্ষা হ'তে চলেচে এবং সে পরীক্ষার সাফল্যের উপর তার মহান সার্থকতার সম্ভাবনা নির্ভরশীল রয়েচে। অবশ্য মার্ক্স তাঁর মতবাদকে যে রাষ্ট্রিক রূপ দিয়েছিলেন তা' সম্পূর্ণ অনুধাবন করার পর সে মতবাদের বিবর্তন উপলব্ধি করা যেতে পারে, তার পূর্বে নয়। তবে তা'ও উপলব্ধি করতে হবে এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সে বিবর্তনের সামঞ্জস্যেরও সন্ধান নিতে হবে। কারণ, প্রাণবন্ত গতিশীলতাই মার্ক্সবাদের প্রধান দাবী এবং সে দাবী সত্য ব'লে প্রমাণিত হওয়ার উপরই নির্ভর করচে তার অব্যাহত সার্থকতা।

মার্ক্সবাদের রাষ্ট্রিক রূপায়ণ: কম্যুনিজম ও মানবতাবাদ।

সেই যে মার্ক্স বলেছিলেন, রিয়ালিটি বা বাস্তবাবস্থা থেকেই ভাব বা আইডিয়ার উদ্ভব হয় এবং আইডিয়া তার আপন বলে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপ্লবসাধনে কার্যকরী হ'য়ে থাকে—সে কথার প্রমাণ তো মেলে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়: দেশের পর দেশে কম্যুনিষ্ট বা সাম্যবাদী, রাষ্ট্রস্থাপনেও সে সত্যের প্রমাণ মিলেচে। বিশেষ ক'রে এ' সত্যও প্রমাণিত হয়েচে যে আইডিয়ার কার্যকারিতাই বিপ্লবের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রয়োজন, রিয়ালিটিই যে আপনা থেকে আইডিয়াকে কার্যকরী করতে পারবে তা' নয়: মানুষের মনে যদি সে আইডিয়া মজবুত রূপ ধরে এবং পার্টির মাধ্যমে বা অন্য কোনো সঙ্ঘবদ্ধরূপে সক্রিয় হয়, তবেই তা কার্যকরী হতে পারবে। তা' ছাড়া দেখা গেছে যে আইডিয়ার কার্যকারিতাও সোজাসুজি ঘটেনা—অর্থাৎ বিশেষ কোনো রিয়ালিটি থেকে বিশেষ কোনো আইডিয়া কার্যকরী হবেই, এমন নয়; অন্যপক্ষে ঠিক্ সে রিয়ালিটি না ঘটলেও আইডিয়া তাকে অতিক্রম ক'রেই কার্যকরী হ'তে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে মার্ক্স বলেছিলেন যে পুঁজিবাদ নিজস্ব নিয়মেই একচেটিয়া মালিকানায় পরিণত হবে এবং যখন তা' হবে তখনই সাম্যবাদী রাষ্ট্রে তার রূপান্তরের সময় আস্‌বে, এবং সে-কারণে ইংলণ্ডপ্রমুখ পুঁজিবাদী দেশেই সাম্যবাদের প্রথম প্রতিষ্ঠা হবে ব'লে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কিন্তু কার্যত তা' হয়নি: রাশিয়া, চীন প্রভৃতি যে সব দেশ রাজতন্ত্র তথা সামন্ততন্ত্রের অধীনে অনগ্রসর ছিলো তারাই বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কর্‌লো এবং তা'তেও সন্তুষ্ট না থেকে অচিরে সাম্যবাদে উত্তীর্ণ হ'লো। অথচ রুশবিপ্লবের মাত্র এক বৎসর পর জার্মানী প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাজতন্ত্রের বিলোপ ঘটিয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্র গ্রহণ করলো বটে; কিন্তু যদিও সেখানে কম্যুনিষ্ট সংগঠন খুব পরিণত হয়েছিল এবং পরিস্থিতি আপাতত বিপ্লবের অনুকূলই ছিল, তবুও সেই একান্ত শিল্পোন্নত দেশে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবপ্রচেষ্টা পরাস্ত হ'লো। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে রিয়ালিটির বিচিত্র রূপ ও তাৎপর্য রয়েচে: আইডিয়া তা' থেকে সমগ্রভাবে—অর্থাৎ রিয়ালিটির আভ্যন্তরীণ ঘাতপ্রতিঘাতে উদ্ভূত

হ'য়ে আপন প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে কার্যকরী হয়। সেজন্যই সামন্ততান্ত্রিক, একান্ত অনগ্রসর রাশিয়াতেই পর পর দুটো বিপ্লব সংঘটিত হ'য়ে সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলে। রুশ বিপ্লবের অন্যতম নায়ক লিও টুট্স্কী একেই বলেচেন 'কম্বাইণ্ড ডেভেলপমেণ্ট'—সম্মিলিত অগ্রগতি। চীনের রাজতন্ত্র ও ওয়ার লর্ডদের দ্বারা জর্জরিত জনগণও কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের কমে সন্তুষ্ট হ'লোনা। অর্থাৎ এ' সব দেশে যে রিয়ালিটির সৃষ্টি হয়েছিল তা' সামন্ততন্ত্রের আওতায় ঘট্লেও এমন ভয়াবহ, সুদূরপ্রসারী ও গভীর অর্থপূর্ণ ছিল যে সাক্ষাৎ এন্টিথিসীস বুর্জোয়া গণতন্ত্রে তাকে ঠেকানো গেলোনা: তাকে অতিক্রম ক'রে সে রিয়ালিটি সাম্যবাদে আশ্রয় লাভ করলো। অথচ শ্রেষ্ঠ পুঁজিবাদী দেশগুলোতে এখনও সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটেনি। রিয়ালিটি থেকে আইডিয়ার উদ্ভবের নিজস্ব গতি এবং আইডিয়ার স্বয়ংক্রিয়তা এতেই উপলব্ধি করা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতার সীমা ও স্বরূপেরও একটা হদিশ পাওয়া গেলো। বোঝা গেলো যে বিপ্লবের আইডিয়া যদি ও যখন রাষ্ট্রে এবং সমাজে ফাটল ধরাবার মতো শক্তি সঞ্চয় করে, শুধু তবে এবং তখনই তা' সম্পূর্ণ কার্যকরী হয়—যে বলাধাবের উপর রাষ্ট্র ও সমাজ টিকে আছে তাকেও ভেঙ্গে নিজের দিকে টেনে আন্‌তে পারে: অর্থাৎ যে সেনাবাহিনী ও পুলিশ রাষ্ট্র ও সমাজকে রক্ষা কর্‌চে তাকেও আকর্ষণ ক'রে আনে: হিংস্র বিপ্লব এ' ভাবেই সত্য হয়। আর, আইডিয়া যতক্ষণ সে রকম শক্তিশালী না হচ্চে এবং সমাজের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে না পড়চে ততক্ষণ তার বৈপ্লবিক সার্থকতা ঘটেনা। নেতৃত্বের ভুল ইত্যাদি গলদও তখন আনুষঙ্গিক ভাবেই এসে পড়ে। জার্মানীতে তাই ঘটেছিল, ফ্রান্সেও কম্যুনিষ্ট পার্টি বিরাট শক্তিসঞ্চয় ক'রে পুনরায় হীনবল হ'য়ে পড়্লো: ইতালীতেও অনেকটা সেরকম ঘটেচে। কাজেই দেখা যাচ্চে, আইডিয়া ও রিয়ালিটির সম্বন্ধকে সহজ, বাঁধাধরা ছকে ফেলা যায় না: পারস্পরিক ও আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় তা' বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মার্ক্স ও অবশ্য কার্যত তাই বলেছিলেন; তিনি শুধু সূত্র বাৎলে দিয়ে গেছেন: তাকে একটা গোঁড়া মতবাদে পরিণত করা যে কখনো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, সে কথা পূর্বেও স্মরণ করেচি।

তিনি আরও বলেছিলেন: কম্যুনিজম রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের শেষ পরিণতি: সে পরিণতিতে যখন মানুষ পৌঁছুবে তখন আর রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না:

রাষ্ট্র ক্রমে ক্ষয়লাভ করবে। কিন্তু বাস্তবে তো দেখা যাচ্চে, কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ক্ষয় হওয়া দূরে থাকুক—সর্বশক্তিমান এক সংস্থায় পরিণত হয়েচে, রাষ্ট্রের সব লোকের উপর তার আধিপত্য সর্বাত্মক হ'য়ে দাঁড়িয়েচে। এমন হবার একটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এই যে, সারা দুনিয়া যেদিন কম্যুনিষ্ট হ'য়ে যাবে সেদিনের কথা ভেবেই মার্ক্স রাষ্ট্রের ক্রম-বিলোপ হবে ব'লে ভবিষ্যদ্বাণী ক'রেছিলেন: একটি, দুটি, তিনটি বা কয়েকটি রাষ্ট্র কম্যুনিজমের মাধ্যমে বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে—সেখানে কোনো রাষ্ট্রই থাকবে না অথচ অবশিষ্ট দুনিয়াতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বিরাজ করতে থাকবে, এমন উদ্ভট কল্পনা তিনি নিশ্চয়ই করেননি। বরং ভিতর বাইরের শত্রু থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সবদিক দিয়ে নিজেকে সংহত করাই স্বাভাবিক ছিল এবং কার্যত তাই হয়েচে। সেই সঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধের বিধ্বংসকারী লীলার পর সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যখন নিখিল জনগণের মনে পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী পরিণতি থেকে মুক্তির আশা জাগিয়ে তুললে, তখন বহু জ্ঞানীগুণী শিল্পীর সোৎসাহ অভিনন্দনে কম্যুনিজম দুর্বার আকর্ষণের বস্তু হ'য়ে উঠলো; বহু সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য ও শুভাকাঙ্ক্ষী হ'লেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার মহা-গৌরবময় আত্মরক্ষা,—স্বাধীনতা ও প্রগতিকামী মানুষকে অসীম উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভ'রে তুললে। দীর্ঘ দিনের দুঃখযাত্রাশেষে মহাচীনও যখন কম্যুনিজমে আশ্রয় নিলে, নিখিল মানবজাতি তখন তারও দিকে বিস্মিত নয়নে তাকালো। এই ক'রে কম্যুনিজম এখন আর এমন সত্তা নয় যে রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত ক'রে আপনি বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে। বরং তাকে আশ্রয় ক'রে বিরাট ও জবরদস্ত এক শাসকশ্রেণী গ'ড়ে উঠেচে—সর্বহারার একনায়কত্বের ধারক ও বাহকরূপে জাতীয় জীবনের সব অঙ্গ, সব প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করচে। যেইক্ষণে তা' হ'লো সেইক্ষণে কম্যুনিজমও মানুষের একচ্ছত্র নিয়ামক হ'বার দাবী করলে—কম্যুনিজম মানুষের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ বলতে রাষ্ট্র ও সমাজের অঙ্গীভূত হওয়াই বোঝালে, ব্যক্তিসত্তা রক্ষা করবার ইচ্ছাকে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব'লে অভিহিত করলে। এই ক'রে কম্যুনিজম আপনি অন্তর বাইরে আঁটসাঁট এক বাঁধাধরা মতবাদ বা ডগমাতে পরিণত হ'লো। এমনটা হ'বে বলেই ফিউয়েরবাক ও প্রুধো আশঙ্কা করেছিলেন।

ফিউয়েরবাক এ প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তাঁর শিষ্যেরা তা' এ'ভাবে লিপিবদ্ধ

ক'রে গেছেন এবং "জার্মাণ আইডিওলজী" নামক বইয়ে মার্ক্স ও তা' উধৃত করেচেন: "সাম্যবাদের আওতায় এলে পর মানুষ আর নিজের প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে সচেতন থাকে না; রাষ্ট্র ও সমাজের উপর সে এ'ভাবে নির্ভরশীল হ'য়ে পড়ে যে তাদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ যতদূর সম্ভব নীচু স্তরে যেয়ে দাঁড়ায়, সম্পূর্ণ মানবিকতাবর্জিত সে সম্বন্ধ শুধু জৈবিক প্রয়োজনে নিবদ্ধ থাকে: মনের সঙ্গে তার আর কোনো সম্বন্ধ থাকে না: সে যে পরিশ্রম করে তাতে কোনো আনন্দ পায় না। স্বাধীনভাবে ন্যায়ান্যায় বিচার ক'রে যে কিছু করা তা' আর তখন মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না।"

তারপর বলা হয়েচে: "কম্যুনিজম ও ব্যবসাবাণিজ্যের জগতের মধ্যে পরস্পর মিল রয়েচে: পার্থক্য শুধু এখানে যে সত্যিকার যে সব মানবিক গুণ রয়েচে ব্যবসাবাণিজ্যের জগতে আপনা থেকেই সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়, কেউ যে ইচ্ছা ক'রে সেগুলো নষ্ট করে তা নয়, আর কম্যুনিজমে সেগুলো শুধু যে বর্জন করা হয় তা' নয়: বর্জন করাই আদর্শ ব'লে পরিগণিত ও প্রচারিত হ'য়ে থাকে।"

আরও বলা হয়েচে: "কম্যুনিষ্টদের বিশেষত্বই এই যে তাঁরা বাঁধাধরা পদ্ধতি তৈয়ের করে বা আগে থেকেই একটা বিশেষ ধরণের সামাজিক কাঠামো বানিয়ে রেখে দেয়। কিন্তু এ'ও তো সত্য যে বাঁধাধরা পদ্ধতি বানালেই সেটা একটা গোঁড়ামীর বস্তুতে পরিণত হয় এবং একচ্ছত্র প্রভুত্ব ফলাতে চায়।"

প্রুধো সবরকম সমষ্টিবাদের বিরোধী ছিলেন, সমষ্টির প্রভুত্ব তিনি পছন্দ করতেন না এবং সেকারণেই কম্যুনিজমের প্রতিকূল সমালোচনা করেছিলেন—যদিও তিনিই করেছিলেন এই বুককাঁপানো উক্তি:—"সম্পত্তি মানেই হচ্চে চুরি করা জিনিষ।" কম্যুনিজমের প্রতি মার্ক্সের পক্ষপাতিত্বও গোঁড়ামির পর্যায়ে পড়েচে ব'লে তিনি মনে করতেন। নতুন ক'রে আবার এক বিশেষ পদ্ধতি ও মতবাদ গ'ড়ে তোলা তিনি সমর্থন করেন নি। মার্ক্সের নিকট লেখা এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—"আগে-থেকেই-সত্য-ব'লে-ধ'রে-নেওয়া যত মতবাদ ছিল সে সবই তো আমরা ধুয়ে মুছে ফেলেচি; এখন ভগবানের দোহাই, আমরা যেন নিজেরাই আবার লোককে নতুন মতবাদের জালে জড়াবার মতলব না করি। আমাদের স্বদেশবাসী মার্টিন লুথার নিজেকে যে অসামঞ্জস্যে জড়িয়ে ফেলেছিলেন আমরা যেন তেমন ভুল না করি: তিনি তো ক্যাথলিক মতবাদকে নস্যাৎ ক'রে তখনই আবার তার নিজস্ব এক প্রোটেষ্টাণ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে লেগে

গিছলেন। আমরা নূতন এক ভাবান্দোলনের পুরোভাগে রয়েচি; এমন কিছু যাতে না প্রচার করি—যা অপরের প্রতি অত্যাচারের ও সহনশীলহীনতার নূতন এক উপায়রূপে ব্যবহৃত হ'তে পারে: পুরোনো ধর্মের স্থলে নূতন এক ধর্মের প্রচারক যেন না হই—তা হোক্ না কেন সে ধর্ম ন্যায়বাদী ধর্ম, যুক্তিবাদী ধর্ম।"

ডায়লেকটিকাল-বস্তুবাদী মার্ক্স, ফিউয়েরবাক ও প্রুধোর বিরাট অবদান স্বীকার ক'রেও তাঁদের উপর খড়্গহস্ত হ'লেন এই ব'লে যে, তাঁরা মানুষকে সমাজ থেকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখচেন—অথচ মানুষ মূলে সামাজিক জীব, সমাজদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কম্যুনিজমে তাই মানুষের সমাজনিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই এবং এখানেই প্রশ্ন ওঠে, কম্যুনিজমে মানুষের যে সমাজসর্বস্ব সত্তা নির্দিষ্ট হয়েচে তাতে তার নিজস্ব সত্তা কতটা বজায় রইলো, মানবতাবাদ কী মর্যাদা বা স্বীকৃতি পেলো। এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হ'লে, আগে বিচার করতে হবে সামাজিক সত্তায় মানুষের ব্যক্তিসত্তার হাল কী হ'লো। মানুষের যে নিজস্ব একটা ব্যক্তিসত্তা আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই; তার সুখদুঃখ, আশানিরাশা, বিকাশপ্রকাশ, উন্নতি অগ্রগতি দিয়ে সে সত্তা গঠিত। সমাজসত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার সামঞ্জস্য হ'তে পারে, কিন্তু ব্যক্তিসত্তার বিলোপ কখনও সম্ভব নয়। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের পক্ষে এই দাবী অবশ্য করা হয়ে থাকে যে ব্যক্তিসত্তা তাতে মিশে যায়—মিশিয়ে দেওয়ার মতো ক্ষমতা ও সম্পদ তার আছে। সে কারণে দেখা যায়, কম্যুনিষ্ট পার্টিও তার সভ্যদের ব্যক্তিজীবন নিয়ন্ত্রিত করবার দাবী করে। কিন্তু মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কখনও সমাজসত্তায় মানুষের ব্যক্তিসত্তার সম্পূর্ণ বিলোপের সম্ভাব্যতা স্বীকার করা সম্ভব নয়: সেরকম বিলোপের চেষ্টাকেও মানবতাবিরোধী ব'লে গণ্য করা ছাড়া উপায় নেই। কারণ, মানুষের স্বাধীনতার অর্থই হচ্চে নিজের বাঁচবার প্রয়োজনের উপলব্ধি ও সে উপলব্ধির ক্রমপূর্ণতা। সে প্রয়োজনকে নিঃশেষে সমাজের নিকট বলি দিতে হ'লে স্বাধীনতা কখনও অক্ষুণ্ণ থাকতে পারেনা। কম্যুনিষ্ট সমাজের অন্তর্নিহিত মানবতাবাদ—অর্থাৎ মনুষ্যকেন্দ্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণ সমষ্টির নিকট ব্যষ্টির বিসর্জনে বরবাদ হয়ে যাবার প্রবল সম্ভাবনা রয়েচে। সে সম্ভাবনা যে সত্যে পরিণত হয়েচে তার প্রমাণ এই যে—রাজনীতিতে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের হাত বাড়িয়ে দিয়েচে এবং তার নির্দেশ থেকে কারও কিছুমাত্র বিচ্যুতি

সহ্য করচেনা। এমন কি, পূর্বের ঐতিহ্যও যাচাই বাছাই ক'রে নিয়েচে: মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা অনুসারে সে ঐতিহ্য যে সেযুগে ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিতেই উদ্ভুত হয়েছিল, সে স্বীকৃতিও তাকে সব সময়ে নিরস্ত রাখতে পারেনি। শুধু কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র নয়: কম্যুনিষ্ট পার্টিকেও অনেক সময়ে সমসাময়িক বা পূর্বতন সাহিত্য সংস্কৃতিকে কাঠগড়ায় দাঁড় কবাতে দেখা যায়;—আমাদের দেশেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সেরকম আচরণের ইতিহাস রয়েচে। অবশ্য আবার পার্টির সুবিধার্থে পূর্বতন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সম্পদ কাজে লাগাবার নীতিও কার্যকরী হয়েচে। সোভিয়েট রাশিয়ায় ডষ্টয়েভস্কীর মানবিক করুণাঘন প্রখর আবেদনশীল লেখাও কিছুদিন প্রতিক্রিয়াশীল বলে' গণ্য ছিল এবং তার পাঠ ও প্রচার নিষিদ্ধ ছিল ব'লে জানা গিয়েছিল। বোরিস প্যাষ্টারনেক—"ডক্টর জিভাগো" লেখার ফলে সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কৃত হ'লেন এবং নোবেল পুরষ্কার পাওয়াতে অধিকতর বিব্রত ও বিপন্ন হয়েছিলেন; সে পুরস্কার গ্রহণ করলে তিনি আর দেশে থাকতে পারবেন না, এ' কথাই তাঁকে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছিলেন। বইটি রাশিয়ায় আদৌ প্রচারাধিকার পায়নি। বই লিখে পাঠক-সাধারণেব হাতে পৌঁছিয়ে দেবার স্বাধীনতা লেখকেব ন্যূনতম অধিকারের পর্যায়ভুক্ত: সাধারণই তার গুণাগুণ বিচার করবে, সৃজনশীল সাহিত্যের আমদরবারে তার স্থান নির্ধারণ করবে—এই সাংস্কৃতিক রীতি। কোনো রচনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বন করতে হ'লে সাধারণের স্বার্থে ও সম্মতিতেই তা' করতে হবে, এ' নির্ধারণ সভ্যতার প্রগতিপথে হয়েচে ব'লেই আমরা বিশ্বাস ক'রে আসচি। অথচ আমাদের দেশের কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী ও কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ—"ডক্টর জিভাগো" সম্বন্ধে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের মতের নির্বিচারে প্রতিধ্বনি করলেন। জনৈক অধ্যাপক তাতেও সন্তুষ্ট না থেকে সে বই সর্বত্র নিষিদ্ধ করার দাবী জানিয়ে ছিলেন.। কম্যুনিজমের আওতায় ব্যক্তিসত্তার দুর্গতির অসংখ্য দৃষ্টান্তের সঙ্গে এই ঘটনাটিও অনুল্লেখযোগ্য নয়। রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক বিচ্যুতিব শাস্তিস্বরূপ পার্টি কর্তৃক সভ্যের সাহিত্যকর্ম প্রকাশ ও প্রচার বন্ধ ক'রে দেওয়ার ঘটনা এই বাংলাদেশেও ঘটেচে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাবের তুলনা এখানে টেনে আনা অপ্রাসঙ্গিক: কারণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র মানবতার দাবীদার নয়: মানুষের সমষ্টিগত বা ব্যক্তিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের অবকাশ সেখানে একান্ত সীমায়িত। প্রশ্ন হচ্চে এই: সভ্যতা ও সংস্কৃতির

অগ্রগতির মাধ্যমে স্বাধীনতার বিকাশে মানুষ যে সব মূল্যবোধ সঞ্চয় করেচে, সেগুলো রক্ষা ক'রে তাদেরই জোরে সে এগিয়ে যাবে,—অথবা সমাজের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবার নামে সে সব বিসর্জন দিলেও তার মানবতা রক্ষা পাবে? কার্লমার্ক্সই বলেচেন যে, মানুষ যুগনির্দেশানুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন ক'রে এগিয়ে এসেচে: সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তার দ্বারা যা' সঞ্চিত হয়েচে তারই উত্তরাধিকার নিয়ে তাকে পূর্ণতর করার অভিমুখে এগিয়ে গেছে: বর্জন করেচে শুধু তাই, বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধানে যা অসত্য ব'লে বিবেচিত হয়েচে: অবশ্য সে অসত্যও যে সত্যাবিষ্কারে সাহায্য করেচে তা' সে বিস্মৃত হয়নি। কিন্তু রাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের অগ্রগতিতে সে যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বীকৃতি পেয়েচে তা' বর্জন ক'রে ইতিহাসের গতি ঘুরিয়ে দেওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই। তাই মানুষ যে স্বাধীনতার অধিকার অর্জন করেচে তা' তার নিকট থেকে কেড়ে নিলে পর আর মানবতার মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব নয়।

এখানেই প্রশ্ন ওঠে: মানুষের অর্জিত পুরোনো মূল্যবোধকে কম্যুনিজমে বর্জন করার প্রয়োজন হয় কেন? এর একমাত্র উত্তর যা পাওয়া যায় তা' এই যে, কম্যুনিজমে মানুষের জীবন সমাজকেন্দ্রিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়: অতএব একমাত্র সমাজের ভালোমন্দ দ্বারাই ব্যক্তির ভালোমন্দ নির্ধারিত হ'তে পারে। এখানে দেখা যাচ্চে, ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা একেবারে অস্বীকৃত হচ্চে এবং সমাজের ভালোমন্দ তথা ব্যক্তির ভাগ্যনির্ধারণের ভার নিচ্চেন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ও সমাজের আপাতনায়কগণ—যাদের এতটা ভারবহনের যোগ্যতা আছে কিনা তা' জানবার মতো কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই, যাদের অদূর ভবিষ্যতেই নায়ক না থাকবার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েচে এবং যাঁদের নিজেদেরই ভাগ্যবিপর্যয় ঘটবার প্রচুর নজীরও আছে। অথচ তাঁরা শুধু ব্যক্তিরই ভাগ্য নির্ণয় করেননা, মার্ক্সবাদী প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে শেষ কথা বলবার দাবী রাখেন এবং সে দাবী চূড়ান্ত ব'লে মানা হয়। "পথের দাবী"র সব্যসাচী প্রয়োজনে সত্যসৃষ্টি করতেন—কিন্তু তা' করতেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে: কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রনায়কগণ থিয়োরীর প্রয়োগও করেন নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আজ যিনি কম্যুনিষ্ট-ব্যবহারবিধি বাৎলে দিলেন কাল যখন তিনি ক্ষমতাচ্যুত হ'লেন, তখন যিনি তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করলেন—তাঁর দেওয়া আচরণবিধি সব দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি নির্বিচারে মেনে নিলো। কম্যুনিষ্ট পার্টি শুধু নয়—কম্যুনিষ্ট রাজনীতির নিয়ন্ত্রণাধীন বা কম্যুনিষ্ট ভাব-

ধারায় প্রভাবান্বিত ব্যক্তিও কম্যুনিষ্ট ভাবগত বা কর্মপদ্ধতি সংক্রান্ত প্রতিটি ব্যাখ্যা বা নির্দেশ নির্বিচারে মেনে নেয়, তার নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি সেখানে আর আপনা থেকে সক্রিয় থাকেনা। ইংরেজীতে একেই বলে অটোমেটন হওয়া অর্থাৎ বুদ্ধি না চালিয়ে নিজেকে কলের মতো কার্য্যকারী করা। ধর্মীয় সংস্কারের নিকট মানুষের আত্মসমর্পণ থেকে এর পার্থক্য শুধু এখানে যে, এর উৎপত্তি বুদ্ধির স্বেচ্ছাকৃত জড়তায় ও বিকৃতিতে, আর ধর্মীয়সংস্কারের মূলে আছে খানিকটা অস্পষ্ট উপলব্ধি ও শ্রুতিতে অন্ধ বিশ্বাস। কম্যুনিষ্ট ব্যক্তির ও সমষ্টির বুদ্ধি যে মুক্ত থাকে না ও তার সক্রিয়তাও যে নষ্ট হ'য়ে যায় তার আর একটা [illegible] এই যে, বারবার দেখা গেছে যে তার সিদ্ধান্ত সমগ্র কম্যুনিষ্ট সংগঠনের উপর একান্ত নির্ভরশীল; নিজস্ব সিদ্ধান্ত করার শক্তিও তার থাকেনা এবং আপাতপ্রয়োজনে কোনো সিদ্ধান্ত করলেও অনেক সময়ে সামঞ্জস্য বিসর্জন দিয়েই তা' বদলাতে হয়। তবু লোকচক্ষুগোচরে সংহতির প্রয়োজনে নিখিল জাগতিক কম্যুনিষ্ট সংগঠন এ' ধরণের অসামঞ্জস্যকেও আশ্রয় দিয়ে থাকে—যদিও সব সময়ে প্রশ্রয় দিতে পারেনা। এ' জন্যেই আমাদের দেশেও বারবার দেখা গেছে যে, কম্যুনিষ্ট নীতি যখন আমুল পরিবর্তিত হয় তখনও পূর্বেকার নীতি ভুল ছিল বলে' স্বীকার করা হয়না : আগেকার পরিপ্রেক্ষিতে তাই ঠিক ছিল বলে' দাবী করা হয়ে থাকে। কম্যুনিষ্ট নিয়ন্ত্রণাধীন সমষ্টিসত্তা তখন এ' ভাবে সক্রিয় হয় এবং ব্যক্তির উপর একচ্ছত্র ক্ষমতা দাবী করে। তখন তাতে আর ব্যক্তিমানুষের মনুষ্যত্বের নিশ্চয়ই মর্যাদা থাকতে পারেনা এবং মানবতা সেখানে ধূলায় ভূলুণ্ঠিত হয়। মানবতা দূরে থাকুক—সাধারণ মানবিকতাও সেখানে মর্যাদা পায়না : কম্যুনিষ্ট রোষ-জর্জরিত বহু দেশের ও ব্যক্তির কথা এ' প্রসঙ্গে সহজেই সকলের মনে পড়বে। কম্যুনিষ্ট পার্টির অভ্যুত্থান ঘটে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর সহায়তায় : সে শ্রেণীর মুখপাত্ররূপেই তার অভ্যুত্থান,—এই তার দাবী। সেহেতু সে নিজেকে সে শ্রেণীর একান্ত স্বাভাবিক নেতা ব'লে দাবী করে। ডিক্টেটরশিপ অব দি প্রলিটেরিয়েট বা সর্বহারাদের একনায়কত্বকে ইতিহাসের বিধান ব'লে মেনে, কম্যুনিষ্ট পার্টি তারই ধারক ও বাহকরূপে সক্রিয় হয়। সর্বহারাদের একনায়কত্বের তথাকথিত ঐতিহাসিক ক্রিয়াতে সেখানে ব্যক্তি ও সমষ্টি পিষ্ট, পদদলিত : এমন কি, তারই সমর্থনে জাতীয় সত্তাকে লঙ্ঘন ক'রে

বাইরের কম্যুনিষ্ট শক্তির রূঢ় হস্তক্ষেপেরও দৃষ্টান্ত রয়েচে। কম্যুনিষ্ট পার্টি'ও জাতীয়তাকে অপমান ও অগ্রাহ্য ক'রে বাইরের কম্যুনিষ্ট শক্তির সাহায্য চায় ও জাতীয় সত্তার উপর সে শক্তির আক্রমণ সমর্থন করে। এরও মূলে আছে এই যে, সে সর্বহারাদের একনায়কত্বের ঐতিহাসিক সংগতিতে বিশ্বাস করে এবং তার প্রয়োজনে যে কোনো উপায় অবলম্বিত হয় বা যে কোনে আচরণ করা হয় তাই নায্য ব'লে মানে। সেই সঙ্গে থাকে এই বিশ্বাস ও আস্থা যে এমনি ক'রেই পার্টিনেতৃত্ব কালক্রমে ক্ষমতা লাভ করবে। সে প্রসঙ্গ এখানে বিশেষরূপে আলোচনার দরকার নেই; তবে এ' টুকু বলা যায় যে কম্যুনিষ্ট পার্টি সামগ্রিক রাষ্ট্রিক ক্ষমতা লাভ করলে পর আর জাতীয়তাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেনা—বরং জাতীয়তার উপলব্ধি ও স্বার্থবোধের সাহায্যেই যথাসম্ভব নিজের শক্তিবৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। সে যাই হোক, সর্বহারাদের একনায়কত্বের জয়রথতলে মানবিক মূল্যবোধ সব গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে গেছে এবং মানুষের ব্যক্তিসত্তা ধ্বংস ক'রে একনায়কত্বে মিশিয়ে দেওয়া হয়েচে—এরূপ দৃষ্টান্ত সহজেই সকলের মনে পড়্‌বে, এবং তার সঙ্গে মনে পড়্‌বে, এহেন একনায়কত্বের সমর্থনে যে যুক্তি দেওয়া হয়ে' থাকে।—সে যুক্তি এই যে সর্বহারাদের বহুযুগব্যাপী লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার প্রতিকার ও পরিণতি একমাত্র এই একনায়কত্বেই সম্ভব এবং এর নিকট আত্মসত্তা বিসর্জনেই ব্যক্তির নিঃশেষ আশ্রয় ও মুক্তি। এ' যুক্তিতে ব্যক্তিসত্তা স্পষ্টরূপেই বর্জন করা হয়েচে। এ'তে এ' সত্য স্পষ্ট হ'লো যে মানবিকতার ক্ষেত্রেও ব্যবহারিক কম্যুনিজম পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে গুণগত শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারলোনা এবং যে সব প্রগতিকামী মানুষ এ' ক্ষেত্রে কম্যুনিজমের শ্রেষ্ঠত্ব আশা করেছিলেন, অসীম বেদনার সঙ্গে তাঁদেরে নৈরাশ্য কবুল করতে হয়েচে। স্বীকার করতে হয়েচে যে, কম্যুনিজম মানবজীবনের নৈতিক ও সামাজিক মানোন্নয়নের যে বিরাট প্রতিশ্রুতি বহন ক'রে এনেছিল, তা' সফল হ'লো না: আদর্শ হিসেবে যা' ছিল প্রগাঢ় আশাব্যঞ্জক, বাস্তব রূপায়নে তাতেই ফাটল দেখা দিলে—ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা' ক্ষমতার আধারে পরিণত হলো। তাই তেমনই নৈরাশ্যজনক হ'লো কম্যুনিষ্ট পার্টির ব্যবহার বিধি: আপাতপ্রয়োজনে সত্যমিথ্যার তারতম্য না রাখতে—সুনীতি দুর্নীতিকেও প্রয়োজনের অধীন করতে তাদের দ্বিধাহীনতা তাদেরে বহুনিন্দিত পুঁজিবাদীদের সমপর্যায়ে এনে ফেলেচে। দ্বন্দ্বসমন্বয়ী

বস্তুবাদের বিবর্তনে ইতিহাসের অগ্রগতিতে কম্যুনিজমের উদ্ভব ; অথচ তাতে মানবতার এহেন অমর্যাদা ঘটলো—এই বিস্ময়কর পরিস্থিতির কারণ খুঁজতে গিয়ে মানুষের চিন্তার ইতিহাসসূত্রে দেখা গেলো, যে অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে ভিত্তি ক'রে ধর্মের অভ্যুত্থান ঘটেছিল—জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার মূল শিথিল হয়েচে ; ফলে ধর্মীয় অধ্যাত্ম নীতি—অর্থাৎ ন্যায়ান্যায়পাপ-পুণ্যবোধ ক্রমশই অকার্যকর হয়ে পড়েচে। অথচ তার জায়গায় কোনো নূতন লোকনীতি গ'ড়ে ওঠেনি। সেই শূন্যতায় সমষ্টিবাদী কম্যুনিজম অতি সহজেই সমষ্টিস্বার্থকেই ব্যক্তির ভাগ্যনির্ধারকরূপে বসিয়ে দিলে, এবং পার্টির সমষ্টিস্বার্থের প্রতীক ও আধাররূপে স্থান গ্রহণ করলে। সেই-ক্ষণে ব্যক্তি তা' মেনে নিয়েছিল—তার কারণ, উদারনৈতিক গণতন্ত্র মানুষকে সত্যিকার সমান মর্যাদা ও স্থান দিতে অক্ষম হলো : তার ভিত্তি ছিল সোস্যাল কন্ট্রাক্ট অর্থাৎ ব্যক্তির সামাজিক চুক্তিবদ্ধতা—সে ভিত্তিও ধ্ব'সে পড়লো। তার ফলে সঙ্ঘবদ্ধতাই একমাত্র সত্যরূপে প্রতিভাত হলো ; কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধতার সঙ্গে স্বাধীনতার সামঞ্জস্য রইলো না। কারণ, উদারনৈতিকতার আমলে অর্থনীতি ছিল ইংরেজীতে যাকে বলে 'লেসে ফেয়ারে'—অর্থাৎ অবাধ, নিয়ন্ত্রণহীন : তার ফলে সমাজে নিদারুণ অসাম্য ঘটলো—আইনের ঘরে সবাইর সাম্য আছে ব'লে যে বাৎলে দেওয়া হয়েছিল তা'ও অবাস্তব হয়ে গেলো। সমষ্টিসত্তা হলো ব্যক্তিস্বাধীনতাবর্জিত : কারণ সে তখন আর ব্যক্তিসত্তার সমাবেশমাত্র নয় : ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তখন সে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সার্বভৌমত্ব লাভ করেচে। সমষ্টিসত্তার আধার যে রাষ্ট্র তাই তখন ব্যক্তির আশা ও আশ্রয় হ'য়ে দাঁড়িয়েচে। এ' পটভূমিতে ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের প্রভুত্ব নীতির ও রাজনৈতিক দর্শনের অনুমোদন লাভ করলো। নিরুপায় মানুষ এমনি ক'রে সমষ্টিতে আশ্রয় নিলে : ভগবানহারা মানুষ সমষ্টির কর্মোদ্যমে একরোখা, উগ্র হ'য়ে উঠলো। তাতে আত্মবিলোপের সম্ভাবনার সম্যক তাৎপর্য উপলব্ধি করা তখন আর তার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। এমনি আত্মবিলোপের মূলে থাকে ভাবাবেগ—জনসমষ্টির সাথে নিজেকে মিশিয়ে দেবার আবেগ : এবং সে সময়টা এমনিতরো আবেগের অনুকূল ছিল এ কারণে যে উদারনৈতিকতা সংকটে এসে ঠেকে গেলো : তার ফলে মানুষ আর বুদ্ধিবৃত্তি খাটিয়ে যুক্তি প্রয়োগ ক'রে জ্ঞান-সন্ধান করতে পারছিল না ; আবেগই বুদ্ধির স্থান গ্রহণ করলো। তার ফলে দর্শনেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও

ভূয়োদর্শন দ্বারা জ্ঞানলাভের সম্ভাব্যতাই কদর পাচ্ছিল ; ভাবাবেগ, অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তরের স্বতস্ফূর্তি উপলব্ধিই শ্রেষ্ঠ ব'লে পরিগণিত হচ্ছিল। উদারনৈতিক মতবাদ ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ; কেন তা মানুষকে আশ্রয় দিতে অসমর্থ হলো তা আমরা উপরে দেখেচি। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে অর্থাৎ পোপের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে যে জাতীয়তার উদ্ভব হয়, উদারনৈতিক মতবাদ এখন নিজেই তার আশ্রয় গ্রহণ করলো ; অর্থাৎ মানুষকে সমষ্টি-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদে প্রণোদিত ক'রে তুললো। জাতি আর শুধু ব্যক্তিসমষ্টি থাকেনা—তাকে অতিক্রম ক'রে আদর্শ, আশা ও আকাঙ্ক্ষার বস্তুবিশেষে পরিণত হয়। এই সমষ্টিবাদ একদিকে ফ্যাসিবাদের ও অন্যদিকে সাম্যবাদের অভ্যুত্থানের মূলে রয়েচে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধ্বংসস্তূপের উপরই এদের একচ্ছত্র শাসনের বুনিয়াদ গ'ড়ে উঠেচে। অবশ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অর্থ সমাজনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব নয় :—সমাজ সমঞ্জস ব্যক্তিত্ব। কম্যুনিজমের ভয়ে ভীত পুঁজিবাদই ফ্যাসিবাদে পরিণত হয়েচে ব'লে সিদ্ধান্ত বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল ; কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দেখা গেলো, পুঁজিবাদী গণতন্ত্রও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লো এবং সে উদ্দেশ্যে সাম্যবাদের সঙ্গেও মৈত্রীস্থাপন করলে। কাজেই ফ্যাসিবাদের স্বতন্ত্র ভাবসত্তাও ছিল ব'লে স্বীকার করতে হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাসে সে ভাবসত্তার উদ্ভবের নিশানা পাওয়া যায় ; তবে এ'ও ঠিক যে কম্যুনিজমকে প্রতিরোধ করবার উপলক্ষেই সে ভাবসত্তা এক সক্রিয় রাষ্ট্রিক মতবাদের রূপ গ্রহণ করে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ হওয়ার পর উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাধিকার, বুদ্ধির মুক্তি ইত্যাদি সব কিছুই অর্থহীন হ'য়ে পড়লো। তারপর সে শূন্যতার মধ্যেই জাত্যাভিমান ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে অবলম্বন ক'রে ফ্যাসিবাদের সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু এই সময়েই আবার বিজ্ঞান, একাধারে প্রকৃতির ও মানুষের পরিচয় এত নিবিড় ও স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে যে, মানুষ তাতে নিজের বিকাশের সম্পূর্ণ নিশানা খুঁজে পায় এবং সত্য, স্বাধীনতা, নীতি ও জ্ঞান প্রভৃতি সব কিছুকেই নূতন ক'রে জানতে পারে,—শুধু জানতে পারে নয়—তাদেরে পূর্ণতর করার মতো আত্মবিশ্বাস লাভ করে। এই আত্মবিশ্বাসকে সম্বল ক'রেই কম্যুনিজম নূতন সভ্যতার পত্তন করার প্রতিশ্রুতি বহন ক'রে আনলো। ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক বিকাশ ও পরিণতি এখানে অনুধাবন করার কোনো প্রয়োজন নেই : কারণ স্বাধীনতার বিস্তার

ও অগ্রগতি রোধ করার উদ্দেশ্য নিয়েই অবাস্তব এক বর্ণগত ও সাংস্কৃতিক আভিজাত্যভিত্তিক সেই ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের উত্থান হয়েছিল: মানবতার বা মানবিকতার কোনো স্বীকৃতিই তার মধ্যে ছিলনা। কিন্তু কম্যুনিজম ছিল মানবতায়—অর্থাৎ মানবের নিবিড় আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বাধুনিক প্রগতিতে ছিল তার বুনিয়াদ। মানুষের মনে সে যে আশার উদ্দীপনা জাগিয়েছিল, জগতের ইতিহাসে বুঝি তার তুলনা নেই।

সে আশা কি আর নেই, কম্যুনিজম আজ যে স্তরে এসে দাঁড়িয়েচে, মানবতাবাদ কি সেখানে প্রতিহত হ'লো? ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী আদালতে ...জের জবানবন্দীতে বলেছিলেন,—"হ্যামলেটের মতো আমি বনে বনে ঘুরিয়াছি; তবুতো পথের সন্ধান পাই নাই।" সে পথ কি ঢাকতে আশার আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে মরীচিকার ন্যায় মিলিয়ে গেছে? কম্যুনিজমের পক্ষ থেকে অবশ্য সে রকম কোনো স্বীকৃতি মিলবেনা। বলা হবে, একমাত্র কম্যুনিজমকে আশ্রয় ক'রেই নিখিলের জনগণ ফের মাথা তুলে দাঁড়াবে। বলা হবে, জনগণের সঙ্গে যাদের একাত্মতা নেই, জনবিরোধী মানসে যাদের ধারণা-ক্ষমতা পঙ্গু হ'য়ে গেছে, যাদের মনের বুর্জোয়াপ্রবণতা বা পাতিবুর্জোয়া হীনমন্যতা জনমন থেকে দুর্ভেদ্য দেয়াল রচনা করেচে—শুধু তারাই শোষিত-পীড়িত জনের নিকট কম্যুনিজমের যে দুর্বার, অপ্রতিহত আবেদন তা' উপলব্ধি করতে অক্ষম। কিন্তু এ' সত্য তো প্রত্যক্ষ যে মার্ক্স যে সব শিল্পোন্নত দেশে কম্যুনিজমের জয় নিশ্চিত সম্ভাবনা ব'লে বলেছিলেন, ঠিক সে সব দেশেই সে সম্ভাবনা এখন সবাইর নিকট সুদূরপরাহত ঠেক্‌চে। নিখিল জগতের বুদ্ধিজীবিদের নিকট কম্যুনিজমের যে আকর্ষণ ছিল ক্রমেই তা' দুর্বল হ'য়ে এসেচে: সর্বজনবিদিত লেখক, শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকদের নাম এ' প্রসঙ্গে মনে আসে। এখানে আবার কথা উঠবে যে তাঁদের মনের বা অবচেতন মনের সংস্কারই তাদের প্রাথমিক সত্যোপলব্ধিকে ক্রমে দুর্বল ক'রে ফেলেচে: তাঁরা নিছক ভাবপ্রবণতায় কম্যুনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নিছক উদারনৈতিকতার শিকড়ে বাঁধা তাঁদের মন কম্যুনিজমের একান্ত বস্তুবাদী, বাস্তববাদী ভাবসত্তার নাগাল না পেয়ে পুনরায় নিজের ঐতিহ্য ও সংস্কারের নির্জীব নিরুপদ্রব বিবরে এসে নিশ্চিন্ত হয়েচে। সোজা কথায়, তাদের সম্বল ছিল শুধু ভালোমানুষী মন,—নিজেদের শ্রেণীগত ভাবগণ্ডী থেকে তাদেরে বের ক'রে আনার পক্ষে সে মন যথেষ্ট ছিলনা। কিন্তু যাঁরা

কম্যুনিষ্ট ভাবসত্তা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যেওতো অনেকে তা' থেকে স'রে আসতে বাধ্য হয়েচেন। বলা হবে, তাঁরাও প্রকৃতপক্ষে তা' গ্রহণ করতে পারেননি, কিন্তু এ' সত্য তো স্বীকার না করে' উপায় নেই যে, কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ও সমাজ বহুক্ষেত্রে বহু জনকে পীড়িত করেচে এবং কোনো কোনো দেশের প্রতি আচবণে জুলুম, জববদস্তীব পরিচয় দিয়েচে। এমনটা ঘটেচে শুধু বিপ্লব প্রতিবিপ্লবের ডামাডোলের ভেতরে নয়—স্বাভাবিক সময়ে সাধারণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও ঘটেচে। তাতে কোনো তর্কের অবকাশ নেই। তা' এ-ান্তই চোখেদেখা কানেশোনা-ত্য। এর একমাত্র উত্তর এই যে, প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষ প্রতিবিপ্লবী ভাব ও কার্যবিধিকে পরাস্ত করার জন্যেই তা' করা হযেচে। কিন্তু লেনিনেব উত্তরাধিকাবী স্ট্যালিনের বিরাট নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তাঁর উত্তরাধিকাবী খ্রুশ্চভ যখন নিজেদের পার্টিরই হাজার হাজার লোককে নিবিচারে হত্যা, নৃশংসতম নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার অভিযোগ আনলেন, তথন কম্যুনিজম মানবিকতার দাবী আপনা হ'তেই পরিহার করলো—পরিবর্তনশীল নেতৃত্বের আপাতবিবেচনায় যা' প্রয়োজন, তারই সিদ্ধি একমাত্র কর্তব্য ব'লে জানলো। সেই মুহূর্তেই অন্যান্য দেশেব প্রতি তার আচরণ উচ্চ নৈতিক স্তরে প'রচালিত হবে ব'লে নির্দিধায় বিশ্বাস করার কারণ রইলোনা ; শুধু তাই নয়, বোঝা গেলো যে বাস্তব তথা বৈপ্লবিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এহেন নীতির প্রশ্নই কম্যুনিজমের নিকট অগ্রাহ্য। ভারতের প্রতি কম্যুনিষ্ট চীনের আচরণ যেমন সুস্পষ্ট নীতিহীনতা প্রকাশ পেয়েচে, কম্যুনিজম তেমনি প্রয়োজনে নীতিহীনতাব আশ্রয় ঘরেবাইরে নিতে পারে ব'লে বোঝা গেলো। দেখা গেলো, মানবিকতার সেখানে স্থান নেই ; মানবতা সেখানে অসম্পূর্ণ, অঙ্গহীন। এখানেই প্রশ্ন উঠচে : দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদের অবিরত ক্রিয়াতে কম্যুনিজমের কি তবে এ্যান্টিথিসীস দেখা দিয়েচে? সার্বিক অধিপতি একচ্ছত্র রাষ্ট্রে ও সমাজে ব্যক্তিসত্তাই কি বৈপরীত্য ও বৈষম্য হ'য়ে দেখা দিল? দেখা দিল কি আইডিয়ার ক্ষেত্রে? আইডিয়ার স্বয়ংক্রিয় বিবর্তনের সম্ভাবনা তো আমরা ইতিপূর্বেই বিচার ক'রেচি। তবু শুধু আইডিয়ার ক্ষেত্রেইবা হবে কেন? ব্যক্তিওতো উৎপাদনের যন্ত্র : তার ভাব ও কর্ম একযোগে উৎপাদনের উপকরণ : কম্যুনিজমে যদি ব্যক্তির সঙ্গে অসামঞ্জস্য ঘটে, তবে সেখানেই কি তার এ্যান্টিথিসীসের উদ্ভব হলোনা? বলা হবে, অগণিত ব্যক্তিতো কম্যুনিজমকে মেনে নিয়েচে, তা'তে নিজেদের সত্তা মিশিয়ে দিয়েচে। অগণিত ব্যক্তি সামন্ততন্ত্র ও

পুঁজিবাদকেও মেনে নিয়েছিল, এখনও মানুচে। কিন্তু কম্যুনিজমই ব্যক্তিসত্তার একান্ত সমন্বয়ের প্রতিশ্রুতি বহন ক'রে এনেছিল এবং সে সমন্বয়ের অভাবই এখন তার বিপরীত সত্তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রচে। তারই কারণে কম্যুনিজম যখন একাধিক দেশে পূর্ণ রাষ্ট্ররূপ নিলে, তখনই তার ভাবাগ্রগতিতে যেন ছেদ পড়লো : মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির পক্ষে কম্যুনিজমের ক্রমপ্রতীয়মান অসমন্বয়ের হিসেব নেবার প্রয়োজন দেখা দিলো। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রনায়কেরা যে, কম্যুনিজমকে একটা বিশেষ সমাজ পদ্ধতি ব'লে বলেচেন এবং অন্য রাজনৈতিক মত ও সমাজ পদ্ধতির সঙ্গে তার সহাবস্থান সম্ভব বলে' স্বীকার করচেন, এ'তেই কম্যুনিজমের বিস্তার সম্বন্ধে [illegible] দৃঢ় প্রত্যয়ের অভাব এবং নিজেদের ভাবগত ও বাস্তব গণ্ডীকে নিরাপদ করবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাচ্চে। বলা হবে, এ' তাঁদের সাময়িক কার্যকৌশল ছাড়া কিছু নয় : কিন্তু কম্যুনিজম যে আপাত বাধাপ্রাপ্ত হয়েচে এ' স্বীকৃতি কি তার মধ্যে নেই? এ' বাধা এসেচে তো প্রতিবিপ্লব থেকে নয় : প্রতিবিপ্লব তো কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে অন্তর বাইরের সমূহ আয়োজন করে পরাস্ত হয়েচে। এ' শুধু রাজনৈতিক বাধা নয়—মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির সমস্যা। রাজনৈতিক বাধা তো একদিকে সহাবস্থাননীতিতে বিলুপ্তি খুঁজচে—অন্যদিকে মারণায়োজনের প্রতিযোগিতায় উদ্যত রয়েচে। কিন্তু মানুষের অগ্রগতিতে যে সমস্যা জেগেচে তার সমাধান তো সহাবস্থান বা জীবনমরণ প্রতিযোগিতাতে হবার নয়। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সহাবস্থান গোঁজামিল ছাড়া কিছু নয়, অন্যদিকে তাকে পরাজয়ও বলা যায়, এবং এ যুগে জীবনমরণ প্রতিযোগিতার শেষ পরিণতি ধ্বংসে। কাজেই এ যুগে মানবতাবাদী চরম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েচে। নূতন ক'রে তার নিজের ভাগ্য জয় করার প্রয়োজন দেখা দিয়েচে। পুনরায় তার পথ কেটে এগিয়ে যাবার সময় এসেচে!

তার অর্থ এ' নয় যে কম্যুনিজম এখনই পথ ছেড়ে দেবে। তার এ্যান্টিথিসীসের হিসেব সে করেনা—যেমন তার পূর্ববর্তী কোনো রাষ্ট্রিক-সামাজিক সংগঠন সে হিসেব করেনি। দেশে দেশে বুভুক্ষু, অর্ধবুভুক্ষু জনগণের বিক্ষোভ হ'তে সে শক্তি আহরণ করে : যে সামাজিক-রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে তারা বঞ্চিত, পীড়িত, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার—তাকে অপসারিত করার সংকল্প সে তাদেরে সরবরাহ করেচে। তা' করতে পেরেচে এ' জন্য যে সে তাদেরে আশা ও আশ্রয় দিয়েচে : সে আশা ও আশ্রয়

অবলম্বন ক'রে তাদের বিক্ষোভ সংকল্পে পরিণত হয়েচে। তাদের কাছে তো আজকের ক্ষুধা, আজকের বঞ্চনাই একমাত্র সত্য : এর সঙ্গে বোঝাপড়া না ক'রে তাদের আর কিছুই ভাববার উপায় নেই, সময় নেই। বিপ্লবের সার্বিক ক্রিয়াতে কবে তাদের ব্যক্তিসত্তা ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে সে চিন্তা তাদের মাথায়ই আসেনা : তাদের নিকট সে প্রশ্ন উত্থাপন করলেও তা' তারা তাদের বিপ্লবী উদ্যোগ হটিয়ে রাখ্‌বার এক নূতন কৌশল ব'লেই জ্ঞান করবে : বর্তমানের জরুরী তাগিদ মেটাবার সংকল্প নিয়েই এগিয়ে যাবে। ভবিষ্যতে কী হবে বা না হবে তা' ভাবা দূরে থাকুক—বর্তমানেও একরোখা একপেশে দৃষ্টি তাদের বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করচে, চলেচে তারা শুধু আবেগ সম্বল ক'রে; আবেগ বুদ্ধিকে অভিভূত ক'রে তার ক্রিয়াতে বাধা জন্মাচ্ছে, বুদ্ধির বিকৃতি ঘটচে। তাদের দৃষ্টি আর পূর্ণ, সত্য ও সর্বাংশে বাস্তব থাকচে না : ফলে অনতিক্রমনীয় বাধার সম্মুখে তার আশু উদ্দেশ্যও যে ব্যর্থ হ'য়ে যেতে পারে—সে অপ্রিয় সম্ভাবনার দিকেও তাদের নজর পড়চে না। অথচ বহুদেশে তাদের সে ধরণের বিপর্যয়কর পরিণতিই ঘটেচে। আশু সংকল্পই তাদের অন্তর বাহির ব্যাপৃত ক'রে রেখেচে। বহুভাবে বঞ্চিত তরুণতরুণীদল পাওনা বুঝে নিতে চায়—তার মূল্য দেওয়ার প্রয়োজন সম্বন্ধে তারা সচেতন নয়। মূল্য দেবার যোগ্যতা অর্জন করার সুযোগও তারা পায়নি। তাই তারা আঘাত করে, আঘাত ফিরে পায় : তবু যা' হোক একটা বোঝাপড়া করার সংকল্প ছাড়েনা। সে সংকল্প দুর্জয়, সে সংকল্প একরোখা : যে দেশে যে প্রকার রাষ্ট্রসংস্থাই থাকুক না কেন, সে সংকল্পের মোকাবিলা তাব না ক'রে উপায় নেই : সে সংকল্পের প্রতিরোধও শুধু তার মূলীভূত কারণ দূর করার ব্যবস্থা ক'রেই করা যেতে পারে—নতুবা নয়। কারণ, সে সংকল্প আপোষহীন, দুর্দমনীয়, দ্বিধাদ্বন্দহীন, এবং সে কারনেই আপাত সত্যমিথ্যা, ন্যায়ান্যায়ের হিসাব তাঁকে বিচলিত করেনা : রাষ্ট্ররূপে কম্যুনিজম যেখানে ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত অবিচারে নিজেকে জড়িত করেচে তাতেও অন্যস্থানের কম্যুনিষ্ট অভিযাত্রীদল বিচলিত হয়না : বহু যুগসঞ্চিত অন্যায়, বহুযুগলালিত অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জয়যাত্রাপথের চোখঝলসানো আলোকে সে অবিচারও অবাস্তব, অবাস্তবরূপে দেখা দেয়। এ' ভাবেই কম্যুনিজম ইংরেজিতে যাকে বলে ডগ্‌মা—অর্থাৎ আত্মনিবদ্ধ মতবাদে পরিণত হয়েচে। ধর্মের গোঁড়ামির চেয়ে এ' গোঁড়ামি কম নয়—বরং আদর্শের উদ্দীপনার

জোরে আরও বেশী দুর্ভেদ্য। জর্জ ওরওয়েল কম্যুনিজমের যে ঘোর বিভীষিকাময় চিত্র এঁকেচেন, সে চিত্র যে কোনো একচ্ছত্র শাসনের প্রতিবিম্ব হতে পারে: কিন্তু জনগণের বিক্ষোভ ও সংকল্পের সমর্থনের জোরে সে যেন আরও সার্বিক, আরও সর্বজয়ী। বিদ্রোহের এই অনন্যমুখিতায়ই বহু বুদ্ধিজীবির মনও কম্যুনিজমে বাঁধা পড়েচে: কম্যুনিষ্ট ব্যষ্টি ও সমষ্টির চিন্তা, আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের সার্বভৌম প্রয়োজনে জাতীয়তা, দেশপ্রেম, ন্যায়ান্যায়, ভালোমন্দকে অতিক্রম ক'রে গেছে,—নির্বিচার আনুগত্য সৃষ্টি করেচে। এমনি ক'রে তাদের নিজস্ব ভাবনার উদ্যমও হারিয়ে গেছে: সে কারণে বহু সময়েই দেখা যাচ্ছে, কম্যুনিষ্ট ব্যক্তি বা পার্টি বা পত্রিকার পক্ষে বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজ দায়িত্বে কর্মধারা নির্ধারণ সম্ভব হয়না: উপরের বা বাইরের নির্দেশে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন ঘটানো হয় এবং তাতে হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। তারা কিন্তু তা' হাস্যকব মনে বা স্বীকার করেনা—আন্তর্জাতিক সংহতি ও বাস্তববাদিতার নির্দেশ সন্তুষ্ট মনে মেনে নেয় ও সমর্থন করে। সে নির্দেশ সংগতি-অসংগতি শোভনতা-অশোভনকে আমল দেয়না: অনন্যমুখিতার মনোভাব ও ভঙ্গীকে একমাত্র সত্য ব'লে জানে। ভাবগম্ভীর, ভ্রূকুঞ্চিত, বজ্রমুষ্টি কম্যুনিষ্ট তারই প্রতীক। সে চালিত বাস্তবাবস্থা দিয়ে: "রিয়ালিটি বিফোর আইডিয়া" অর্থাৎ "ভাব বা ধারণার চেয়ে বাস্তবাবস্থা আগে কার্যকরী হয়, ভাব বা ধারণা বাস্তবাবস্থার চাইতে অধিক প্রভাবশীল নয়'—এই মার্ক্সীয় বাণীর সে সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। রিয়ালিটি যে প্রত্যক্ষ ধারণার সৃষ্টি করচে তাই দিয়ে সে চালিত হচ্চে; তাতে কেমন ক'রে তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হ'লো, কোথায় তার বুদ্ধি খণ্ডিত হ'য়ে রইলো তা' সে ধারণাও করতে পারচেনা: তার আশু সমস্যা না মিটিয়ে তাকে সেদিকে দৃষ্টিপাত করতে বলাও বৃথা। শুধু আইডিয়া দিয়ে এ' রিয়ালিটির মোকাবিলা করা যায়না এ' জন্যে যে, আইডিয়া রিয়ালিটিব জবাব নয়: রিয়ালিটিব এ্যান্টি থিসীস জাগলে পর যে আইডিয়া জাগে তাই দিয়ে সে রিয়ালিটির মোকাবিলা করতে হয়। তা' যতক্ষণ না হচ্চে ততক্ষণ বিয়ালিটি মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্চে—তাকে ভাবে অধীর, কাজে দুর্দম করে তুলচে। ততক্ষণ শুধু আইডিয়ার আবেদন তার অনেক দূরে থাকে: হয়তো বা যেভাবে সে রিয়ালিটি দ্বারা চালিত হচ্ছে বা নেতৃত্বের নির্দেশে নিজেকে চালিত হতে দিচ্ছে, তার অগ্রগতির পথের আভ্যন্তরীণ

কোনো অসংগতি প্রত্যক্ষ হ'য়ে তাকে সহসা চকিত ক'রে তোলে: সে অসংগতি বিপরীত রিয়ালিটিরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু তখনও সে অসংগতি পরিমাণে সামান্য। যতক্ষণ না বর্তমান রিয়ালিটির সঙ্গে পাল্টা রিয়ালিটির শুধু পরিমাণগত নয়—গুণগত প্রভেদ দেখা দেয়, ততক্ষণ আপাতরিয়ালিটির জ্বলন্ত উন্মাদনা প্রতিহত হয়না। এই উন্মাদনাই কম্যুনিজমের আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব করেচে, সন্দেহ নেই।

এ' উন্মাদনার উৎস কি মানবতাবাদ: নিজ ভাগ্যগঠনে মানুষের পূর্ণ আস্থাই কি তার ভিত্তি? নিজ ভাগ্যগঠনে আস্থা এর ভিত্তি বটে, কিন্তু তেমনি আস্থাতো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরও শক্তি যুগিয়েচে: ভগবানকে অস্বীকার করার প্রয়োজন পড়েনি: তবে নিজেদের ভগবানের প্রতিনিধি ব'লে দাবী করতো যে রাজা বা ধর্মযাজক—তারও বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটেচে। তথাপি দেখা গেছে বিপ্লবের উন্মাদনাই পরিণামে বিপ্লবের সর্বনাশের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েচে, বিপ্লবকে মানবিকতা থেকে বিচ্যুত করেচে। অবশ্য মানবসভ্যতা সে প্রতিবিপ্লবকেও অতিক্রম ক'রে এগিয়ে গেছে। কম্যুনিষ্ট বিপ্লবও যে সম্পূর্ণরূপে ও সজ্ঞানে মনুষ্যকেন্দ্রিক জীবনদর্শনদ্বারা প্রণোদিত—তা' নয়: ধর্মকে সেখানে উহ্য রাখা হয়, ধর্মীয় ঐতিহ্যেরও স্পষ্ট অস্বীকৃতি ঘটেনা এবং এহেন গোঁজামিলের দরুণ তার পূর্বগামী বিপ্লবের মতো তাতেও মানবসত্তার পূর্ণ তৃপ্তি হয়না এবং মানবিকতা হ'তে তারও অবিলম্বে বিচ্যুতি ঘ'টে থাকে। মানবকেন্দ্রিক জীবনদর্শন কম্যুনিষ্ট রাজনীতির বৈপ্লবিক সংগঠনের মূলে নেই—আছে শুধু তার ভাবগত পশ্চাদভূমিতে। সংগঠন কে এগিয়ে নিয়ে চলেচে শুধু রিয়ালিটি: কঠোর, অসহনীয় রিয়ালিটি: রিয়ালিটিকে আশ্রয় ক'রে উদ্ভূত বৈপ্লবিক প্রেরণা। তাতে উদ্ভব যে প্রাণোন্মাদনার, তা'ও প্রচণ্ড রিয়ালিটি।

কিন্তু যেক্ষণে তা' রিয়ালিটি সেক্ষণে তার এ্যান্টি-থিসীসের আবির্ভাব: আইডিয়ার মাধ্যমে সে এ্যান্টিথিসীস কার্যকরী: সে আলোচনা ইতিপূর্বে করেচি। মানবতাবাদী বিচারের সম্মুখীন তাকেও হতে হবে: কারণ, বিজ্ঞানসম্মত মানবতাবাদেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে তার ভবিষ্যতের নিশানা। লেনিন বলেছিলেন: দেশকে, জগতকে তিনি ফিরে গড়বেন: বজ্রঘোষ সে মানবতাবাদী বাণী তাঁর বিশ্বজনীন মানবতা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। আজ পার্টি সে কথা বলচে: সে কথাও কি মানবতাবাদসম্মত? উত্তর হবে, নিশ্চয়ই: সমষ্টিমানুষের সে বাণী মানবতাবাদসম্মত না হবে কেন? সমষ্টির সঙ্গে মিলেই তো মানুষ।

সমষ্টির সঙ্গে মিলে মানুষ, সন্দেহ নেই : মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণও পরস্পরের ইচ্ছা ও কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত : তাতেইতো মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্বন্ধ। কিন্তু সমষ্টি যেখানে সে সম্বন্ধকে লঙ্ঘন ক'রে চলে, ব্যক্তিসত্তার আয়ত্তাতীত এক সমষ্টিসত্তাকে সার্বভৌম ক'রে তোলে তখন ব্যক্তি পীড়িত, খণ্ডিত হয়, মানবতাবাদ থেকে বিচ্যুতি ঘটে—বিশেষ ক'রে তখনই যখন পার্টি সমষ্টির স্থান গ্রহণ করে—অবশেষে রাষ্ট্র ও সমাজকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে নিয়ে আসে। মানবিকতাও সেখান থেকে তিরোহিত হয় : এ্যান্টিথিসীসের আবির্ভাব ঘটে। সভ্যতার অগ্রগতির পথে আগে পুনরায় বিরাট জিজ্ঞাসা।

মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রগতির পথেই আবির্ভূত হয়েচে কম্যুনিজম : তার মোকাবিলা না ক'রে আর মানবজাতির এগিয়ে যাবার উপায় নেই। সে শুধু বর্তমানের নয়, অনন্ত ভবিষ্যতেরও দাবীদার। কিন্তু ভবিষ্যৎ আর বর্তমানে আটকা প'ড়ে নেই : তার নিশানা এখনই এসে গেছে, কম্যুনিজমের ক্রমপূর্ণতার ক্ষণেই তার অপূর্ণতাকেও প্রকাশ করেচে। তারই সমন্বয়, তারই সিন্থেসীসের উদ্ভাবন এ' যুগের মানবতাবাদের আকাঙ্ক্ষা ও অভিব্যক্তি॥

কোথায় তবে মানুষের পথের নিশানা : নিজেকে সে যেখানে সম্পূর্ণরূপে পেতে পাবে কোইবা সে ঠিকানা? বারে বারে মানুষ তার গন্তব্যস্থলে এসেচে ব'লে মনে করেচে, বারে বারে তার সে ভরসা ব্যর্থ হয়েচে। ব্যক্তির স্বাধীনতার আশাও কি আজও পূর্ণ হয়েচে? মার্কিন চিন্তানায়ক লুই মামফোর্ড বলেচেন যে, আগে যেটুকু আশার অবকাশ ছিল এখন যেন তা'ও নেই : তা হ'লে আমরা প্রগতির পথে অগ্রসর হয়েচি বল্‌তে পারি কেমন ক'রে? তিনি স্মরণ করেচেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধকালে বেলজিয়াম জার্মানীর পদানত হ'লে পর প্রখ্যাত বেলজিয়ান ঐতিহাসিক এ্যারি পাইরেণকে তাঁর বাসভূমি ও বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে দূরে বন্দীশালায় অন্তরায়িত করা হয়। সমগ্র জগতের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে; কিন্তু তা'তে কোনো ফল হয়না। অবশেষে পোপ ও মার্কিন রাষ্ট্রপতির যুক্ত আবেদনের ফলে তাঁকে জার্মানীর এক গ্রামে নিজের ভাবে থাকতে ও গ্রন্থরচনায় আত্মনিয়োগ করতে দেওয়া হয়। মামফোর্ড অতঃপর দেখিয়েচেন যে প্রথম মহাযুদ্ধের কালে মানবিকতা ও মনীষার পক্ষে আবেদন অতটুকু সাফল্যলাভ করেছিলো; কিন্তু তার পর থেকে ফ্যাসিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট উভয়বিধ একচ্ছত্র রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অধীনে অগণিত বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক—সাংস্কৃতিক কর্মীর দুর্দশার একশেষ ঘটেচে : স্পেনের

প্রজাতন্ত্রী গভর্ণমেণ্টকে একচ্ছত্র শাসনকামীরা উৎখাত করেচে, ফ্যাসিবাদী ইতালী এ্যাবিসিনিয়াতে বিষবাষ্প পর্যন্ত ব্যবহার ক'রে নির্দোষ, নির্ভীক লোকদেরে পদানত করেছিল, চীনে জাপানের হামলায়ও ন্যায় ও মানবিকতার চরম অপমান ঘটেছিল : ফ্যাসিবাদীরা যে অন্যায় করেচে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রীরাও নির্লিপ্ত থেকে ও তাতে কার্যত সায় দিয়ে কম অন্যায় করে'ন। মানবজাতির অগ্রগতির আশা সেদিন পরাস্ত হয়েচে।

তারপর সে আশা কম্যুনিজমকে অবলম্বন ক'রেই প্রবল হয়েছিল। কার্যত কি তবে এই সত্য যে, কম্যুনিজম যে প্রগতির নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারলোনা তার কারণ এই যে, তা' যে দেশে ক্ষমতা লাভ করেচে তার জাতীয় ঐতিহ্যের উর্ধ্বে উঠে নিখিল মানবতা ও মানবিকতায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেনি--জাতীয় সত্তার সঙ্গেই জড়িয়ে গেছে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে তো রাশিয়ায় জাতীয় বীরদের—তথা জারের শাসনকালের সমরনায়কদের স্মৃতিকে সজ্ঞানেই জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনে জাগিয়ে তোলা হয়েছিল। তবে কি এ কথাও সত্য যে, যে কোনো ভাবধারা শুধু প্রথম প্রবর্তনের কালেই অমলিন থাকে, তখনই সে সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয়, তার উদ্গাতার মনের জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত থাকে—সম্পূর্ণরূপে আত্মসমঞ্জস ও সমগ্ররূপে দেখা দেয়? কিন্তু ভাবধারা তো শুধু ভাবলোকে থাকলেই চলবেনা—বিশিষ্ট পরিবেশে তাকে রূপলাভ করতে হবে। ভাবলোকে থাকলে পর তার কোনো ফল নেই—সার্থকতা নেই। অথচ সে যখন বাস্তব পরিবেশকে অবলম্বন করে, তখন সে পরিবেশের যা' কিছু মলিনতা, অপূর্ণতা তা' তাকেও প্রভাবিত করে। অবশ্য বিপ্লবের মাধ্যমে সে নূতন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংস্থা গঠন করবে ; কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে জাতির পুরাতন ঐতিহ্য ও সংস্কারকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে চূরে দিতে পারবে। রাশিয়া সম্বন্ধে তাই বলা হয়েচে যে, সেখানে কম্যুনিজম আইভান দি টেরিবলের নির্মমতাও পীটার দি গ্রেটের দুর্দম জেদের উত্তরাধিকারী হয়েচে : এমন কি জারের আমলে আমলাতন্ত্রের যে নিজেদের ইচ্ছা খাটাবার জোর প্রবৃত্তি ছিল, সে আমলাতান্ত্রিক গঠন ও মনোভাবের উত্তরাধিকারও কম্যুনিজম গ্রহণ করেচে। তার ফলে এক দিকে যেমন তার আদিম অকৃত্রিমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েচে, তেমনই তা' অন্য দিকে জাতির মানসের নিকট অধিকতর গ্রহণীয় হ'তে পেরেচে। তার ফলে রাশিয়াতে যারা স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা করেছিলেন তাঁদের আশা যেমন পূর্ণ হয়নি, তেমনই যাঁরা সেখানে জারের আমলের ও পুঁজিবাদী প্রভুত্বের দিন ফিরে আসবে ভেবেছিলেন তাঁদেরেও

নিরাশ হ'তে হয়েচে। কম্যুনিষ্ট চীনের নীতি ও কার্যকলাপের অভিজ্ঞতা থেকে বলা হচ্ছে যে, কম্যুনিজম মোঙ্গোলিয়ান ঐতিহ্যের আত্মবিস্তারপ্রবণতার অন্যথা ঘটাতে পারেনি: বহুশত বৎসরের ইতিহাসে সে ঐতিহ্যের পরিচয় রয়েচে। এমনতরো বিশ্লেষণ যাঁরা করেচেন তাঁরা আরও বলেন যে, বিশিষ্ট পরিবেশে প'ড়ে ভাবধারার এমনি পরিবর্তন ঘটে: তার ফলে যে কোনো নতুন ভাবধারাকেই একদল তথাকথিত বাস্তববাদী ব্যর্থ ও অবাস্তব ব'লে উড়িয়ে দেন; অন্যদিকে তথা-কথিত আদর্শবাদীরা বলেন যে এ জগতের কোনো আশা নেই: কারণ এর নতুন ভাবধারাকে গ্রহণ করবার শক্তি নেই। প্রকৃত পক্ষে যে মুহূর্তে ভাবধারা বাস্তবে রূপ নেয় সে মুহূর্তেই তার একাধারে পূর্ণতালাভ ও পরিবেশের প্রভাবে খানিকটা আত্মবিচ্যুতি ঘ'টে থাকে। যীশু খ্রীষ্টের "সারমন অন দি মাউণ্ট" যারা নিজ কানে শুনেছিলেন তাঁরা কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে একদা এই উপদেশের ভিত্তিতেই একাধারে পোপের অমানুষিক শাসন ও অত্যাচারবিধি, ক্যাথোলিক ও প্রোটেষ্টান্টদের পারস্পবিক দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং গীর্জা-কেন্দ্রিক স্থাপত্যের অনুপম নিদর্শন সমূহ গ'ড়ে উঠবে? তাই বলা হয়েচে, নতুন ভাবধারাকে যদি সার্থক করতে হয় তবে তার মুল প্রেরণাকে সঞ্জীবিত রাখতে হবে, আবার নতুন অভিজ্ঞতাও আয়ত্ত ক'রে নিয়ে চলতে হবে। কিন্তু মুলপ্রেরণা সঞ্জীবিত রাখা সহজ কথা নয়। রীতিবদ্ধ কর্মের এবং বাহ্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প'ড়ে তার হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে: অথচ কর্মপদ্ধতি ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ব্যতীত তার কার্যকারিতার কোনো পথ নেই। যে সব সঞ্জীবনী ভাবধারার মাধ্যমে সমাজ উন্নতি লাভ করে তাদের ও তার বাস্তব ও কার্যকরী পদ্ধতির পারস্পরিক সংঘাতই ইতিহাসের মর্মকথা। এ দুইয়ের একান্ত প্রয়োজন আছে এবং দুইয়ের মধ্যেই বিপদও আছে। বাস্তব কার্যকারিতা ও আদর্শগত অক্ষুণ্ণতা ইতিহাসের প্রয়োজনের এপিঠ ও ওপিঠ। যে সমাজে এদের সামঞ্জস্য হয়েচে তারই প্রাণসত্তা অক্ষুণ্ণ আছে ব'লে বুঝতে হবে।

কিন্তু এ পরিস্থিতিতে মানবজাতির অব্যাহত অগ্রগতির আশা আছে বা নেই বর্তমানে আমরা সে প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজচি। এ' সমস্যাতে প'ড়ে অনেকে ব'লে থাকেন, জগতের আসলে অগ্রগতি বা পশ্চাদ্গতি ব'লে কিছু নেই: আছে শুধু পরিবর্তন। কিন্তু মানুষকে যদি আমরা স্বরাট ব'লে জানি, সে নিজের ভাগ্যের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বলাভ করতে পারে ও করবে ব'লে বিশ্বাস করি—তবে, জগতে অগ্রগতি ব'লে কিছু নেই—আছে শুধু পরিবর্তন, এ' কথা শুনে সন্তুষ্ট থাকতে

পারিনে। সে কারণে তার যাত্রা অবিরত: যখনই জানা গেলো যে তার পরম পূর্ণতার আশা আজও পূর্ণ হ'য়নি তখনই তার পুনরায় যাত্রা শুরু। কিন্তু সে যাত্রা কি তার ক'খনও শেষ হ'বার?

ইরাণী কবি নাকি বলেচেন:

বাহ বাঙা বা খাস্তাগি যে বাহ নিস্ত।
ইশ্‌ক হাম রাহ আস্ত ও হাম খুদ মনজিল আস্ত।

যারা এ পথে চলে তারা কখনো ক্লান্তি জানেনা, কারণ এ পথ একই সঙ্গে পথ ও গন্তব্য। এইই জীবনের পথ।

পথ ও গন্তব্য স্থান এক: গন্তব্য স্থানে পৌছুলেই দেখা যায় সম্মুখে পথ আরও প্রসারিত রয়েচে, আবার পথই প্রতি পলে গন্তব্য স্থানরূপে প্রতিভাত হচ্চে। আত্মোদ্বুদ্ধ মানুষের পথযাত্রা তবু দিশাহারা পথযাত্রা নয়: সে সজ্ঞানে পথের সন্ধান করচে, পথ কেটে অগ্রসর হচ্চে। কিন্তু তার সে চলাও বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক শক্তির ক্রিয়ার অধীন: সে ক্রিয়ার সঙ্গে পরস্পর প্রতিদ্বন্দী রাষ্ট্রিক শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত চলচে: মানুষ তারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কেমন ক'রে তবে প্রকাশ পাবে স্ববাট মানুষের পরিচয়—সমষ্টিগত মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিমানুষের স্বাধিকার সন্ধান? এ' প্রশ্ন উঠেচে যুগে যুগে: এ' যুগে আবার নতুন ক'রে উঠলো সেই প্রশ্ন। মানবতাবাদ কী ক'রে স্বপ্রতিষ্ঠ হবে তা'ও এ' যুগের মানবতাবাদী প্রশ্ন।

আধুনিক প্রাচীতে মানবতাবাদ

পাশ্চাত্যে মানবতাবাদ বর্তমানে যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সম্মুখীন, তার আলোচনা আমরা করেছি; প্রাচ্যে মানবতাবাদের অগ্রগতির এখন সন্ধান নেওয়া দরকার।

বিশ্ববিখ্যাত মনীষী ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় মানবপ্রেমিক ডাঃ এলবার্ট সোয়েইটজারের মতে ভারতীয় চিন্তাধারায় জীবনের প্রতি যে মনোভাব প্রস্ফুটিত হয়েছে তা নেতিবাচক: মানবজীবনকে তাতে কোনো মূল্য দেওয়া হয়নি, একমাত্র নির্বাণই কামনা করা হয়েছে। ভারতীয় চিন্তাধারার সামগ্রিক ব্যাখ্যা হিসাবে এ' মত শুদ্ধ, কিনা সেবিষয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে। অবশ্য আরও অনেক পাশ্চাত্য চিন্তানায়কই ভারতীয় চিন্তার এহেন ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় বস্তুবাদের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তা' ছেড়ে দিলেও বেদে এ' বিশ্বসম্পর্কে যে পরম বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে, উপনিষদে জীবনসূত্রের যে সূক্ষ্ম ও বিশদ বিশ্লেষণ রয়েছে, রামায়ণ মহাভারতে সভ্যতার ঘাতপ্রতিঘাত তথা রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কর্তব্যের যে পূর্ণ নির্দেশ পাওয়া পাওয়া যায়—সর্বোপরি ভগবদগীতাতে নিষ্কাম কর্মের যে শাশ্বত অনুশাসন উচ্চারিত হয়েছে, তাতে যদি জীবনের পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া না হ'য়ে থাকে তবে আর কেমন ক'রে তা' দেওয়া যেতে পারে তা' ভেবে পাওয়া দুষ্কর। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম তো মানুষের প্রতি বিশ্বজীবনে নিজের জীবন বিলিয়ে দেওয়ার নির্দেশদানে জীবনের পূর্ণ উপলব্ধির নিশানা রেখে গেছে। এ' কথা অবশ্য সত্য যে বৌদ্ধধর্মের বিলোপের পর থেকে এবং পর পর বিদেশী আক্রমণ ও আধিপত্যের পটভূমিতে আমাদের জীবনবোধ বৈরাগ্যবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছে। পরাধীন জাতির ব্যর্থতাবোধ এ' ভাবেই ইহলোকের বাইরে আশ্রয় খুঁজে থাকে। শুধু ভারতে নয়: সারা প্রাচ্যখণ্ডেই মানুষের জীবনবোধ বিদেশী শাসন ও শোষণের চাপে নিস্তেজ হয়েছিল। একমাত্র জাপানই এ' শতাব্দীর প্রথমভাগে রুশ আক্রমণ প্রতিরোধ করার যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে নিজের প্রাণসত্তা অক্ষুণ্ণ রেখেছে বলা যেতে পারে। তারপর ধীরে ধীরে সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে জাগরণের ছোঁয়াচ লাগলো; বিদেশী শাসনের নাগপাশ শিথিল হ'য়ে এলো। এ'ও হলো জীবনবোধের পুনরোদ্বোধনের ফলেই: নতুবা রাজনৈতিক স্বাধীনতা,—তথা জাতীয়তার মূল্যবোধ জেগে ওঠা সম্ভব হতোনা। পাশ্চাত্যের আধিপত্যে থেকেও পাশ্চাত্য

জীবনবোধের যে সংস্পর্শে এ'সব দেশ এসেছিল তাতেও ইহলোকের এ' জীবনের প্রতি মমত্ববোধ ফিরে আসবার সহায়তা হয়েছিল সন্দেহ নেই। তার চরম পরিণতি ঘট্‌লো মহাচীন ও আরও কয়েকটি দেশে কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠায়। তীব্র জীবনবোধ ব্যতীত এ' সম্ভব হতোনা এবং নিজেদের ভাগ্য পুনর্গঠন করবার আশা, বিশ্বাস ও সংকল্প এ' জীবনবোধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিগতভাবে জড়িত ছিল। অবশ্য মানবতাবাদী পরিপ্রেক্ষিতে কম্যুনিজম এখন যে স্তরে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচ্যের কম্যুনিষ্ট ভূমিও তার আওতার বাইরে নয়।

আধুনিক যুগে মানবতাবাদী চিন্তার স্ফুরণ ভারত ছাড়া প্রাচ্যের অন্য কোথাও দেখতে পাওয়া যায়না। এখানেও এ' চিন্তার পুনরাবির্ভাব যে ঘটেচে পাশ্চাত্য চিন্তাধারারই সংস্পর্শে, তা' বলা বাহুল্য। রাজনৈতিক পরাধীনতা সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সংস্পর্শে এসে আমাদের ভাবনার যে ফসল ফললো তাতে শুধু যে জীবনবোধ ফিরে এলো তা' নয়: হারানো জীবনকে ফিরে পাবার, ভাঙ্গা জীবনকে নতুন ক'রে গড়বার উপাদান ও উপকরণ সংগৃহীত হ'লো। একেও সিসীস-আন্টিসিসীসের খেলা বল্‌লে ভুল হবেনা। অবশ্য মূলে এ' ভাবনা মানবকেন্দ্রিক ছিলনা: ভগবানের বিধানেই আমরা পুনরায় আত্মোদ্ধারে ব্রতী হয়েচি, এই অনুভূতিই জাতীয় জাগরণের প্রেরণা যুগিয়েছিল। কিন্তু সে ব্রত ছিল দুঃসাধ্য—রাজনৈতিক পরাধীনতার অবসান ঘটিয়ে জাতি ও সমাজকে স্বরাট, সুসংবদ্ধরূপে গ'ড়ে তোলার ব্রত। সে ব্রত সফল করার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আমাদেরই উপর ন্যস্ত এই চেতনা ও উপলব্ধি আমাদেরে সম্পূর্ণরূপে ইহলোকোন্মুখ, মানবকেন্দ্রিক জীবনের পরিধিতে উপস্থিত ক'রে দিলে। তারই চরম পরিণতি দেখলুম মহাত্মা গান্ধীতে—সে ব্রতের শেষ ও সার্থক হোতা—যিনি ঘোষণা করেছিলেন যে যা' কিছু জীবিত, প্রাণবন্ত, তারই সঙ্গে তাঁর সত্তা মিশে রয়েচে। তিনি ঘোষণা করলেন যে গুহা নবাসী যে লোক সে শুধুই আকাশকুসুম রচনা করে; কিন্তু রাজর্ষি জনকের ন্যায় যিনি প্রাসাদে বাস করেন, তাকে আর আকাশকুসুম রচনা করতে হয়না। আত্মকেন্দ্রিক বৈরাগ্যবাদের বিরুদ্ধে এ' হেন প্রবল প্রতিবাদ, ইহলোকের জীবনের—স্বচ্ছল সম্পূর্ণ জীবনের এ হেন মর্যাদা ঘোষণার জগতের ইতিহাসে খুব বেশী তুলনা নেই। মহাত্মা গান্ধীকে তাই এনে দিল দেশের মানুষের মাঝখানে, সকল জনগণের মনের দুয়ারে। "—হাম যব যাত্রা সুরু করেঙ্গে তামাম হিন্দুস্থান উথল পড়েঙ্গে"—তাঁর জীবনে জীবন

লাভ ক'রে জাগলো সকল দেশ : সেই সর্বজয়ী প্রাণবাণী বিশ্ব মথিত করলে। সেই বাণীরই অনুসরণে মহাত্মাজীর নিঃশেষে আত্মদান বিশ্ব-জীবনের সর্বোচ্চ শিখরে তাঁকে উত্তীর্ণ ক'রে দিলো। মানবিকতা অক্লেশে মানবতাতে উত্তীর্ণ হ'লো। তবু তা' মানবতা নয়—মানুষকে চরম আত্মনিয়ন্তা ব'লে তা' স্বীকার করেনি। কিন্তু আত্মবিমুখ, অসহায় জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ ক'রে মানবধর্মকে জয়যুক্ত ক'রেছিল, ইতিহাসে এ' সত্যের শাশ্বত স্বাক্ষর র'য়ে গেছে।

শ্রীঅরবিন্দের ধ্যানলোকস্থ জগৎ মনুষ্যকেন্দ্রিক নয় : কিন্তু মনুষ্যসত্তাকে সাধনা দ্বারা অসীম উন্নত করার যে সম্ভাবনা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন তাতে মানুষের নিগূঢ় স্বরাটত্ব স্বীকৃতি পেলো।

আর রবীন্দ্রনাথ? রবীন্দ্রনাথ কি হিউম্যানিষ্ট অর্থাৎ মানবতাবাদী ছিলেন? মানবিকতা তাঁর সকল সৃষ্টির প্রাণ, বিশ্বজন তাতে উদ্বুদ্ধ হয়েচে। কিন্তু তাঁর কি এমন বিশ্বাস ছিল যে মানুষ কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অধীন নয়? তিনি কি বিশ্বাস করতেন যে মানুষ সর্বাংশে নিজ ভাগ্য গঠন ক'রে এসেচে এবং করতে সমর্থ? যে ভগবদনির্ভরতা তাঁর শত সহস্র গানে, কবিতায়, বাণীতে ও সমগ্র রচনায় মুখরিত হয়েচে, তা' কি নিঃশেষ আত্ম-নির্ভরতার অভাব সূচিত করচে না? আপাতত মনে হয় তাই করচে : কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ভগবানের অনুসারী, তার সংজ্ঞা কী? সে ভগবান জীবনদেবতা : যে পূর্ণতার সাধনা করচে মানুষ—সে সাধনায় পলে পলে সে নিজেকে অতিক্রম করচে,—তাই ভগবানে সংজ্ঞালাভ ক'রেচে। সে ভগবান বিপদে মানুষকে রক্ষা করে না—বিপদে মানুষকে নির্ভয় ক'রে; সে ভগবান দুঃখে সান্ত্বনা দেয় না—দুঃখ জয় করবার শক্তিদান করে। সে ভগবান মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করচে না : ভগবানই সে সেই ভাগ্য যা' মানুষ গঠন করতে চাইচে। "রিলিজিয়ন অব ম্যান" বা মানবধর্ম নামক হিবার্টবক্তৃতাসমষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ বলেচেন যে, মানুষের দেহের জন্ম ও মৃত্যু আছে; কিন্তু বহুমুখী ব্যক্তিত্বে তার যে মানবতা ফুটে ওঠে, তার মৃত্যু নেই। বলেচেন : এই যে ঐক্যের আদর্শ এতেই মানুষ পায় তার জীবনে অনন্তকে, পায় তার প্রেমে অসীমকে। এই ঐক্য মনের ধারণা মাত্র নয় : এ' এমন এক সত্য যা' মানুষকে প্রাণধর্মে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে। সে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে গভীর ও ব্যাপক সম্বন্ধ উপলব্ধি করে। তার ফলে নৈতিক জীবনে সে নিজের স্বাধীনতার উপলব্ধি লাভ করে

এবং একই সঙ্গে অপরের নিকট নিজের বাধ্যবাধকতা উপলব্ধি ক'রে থাকে। আত্মিক অর্থাৎ অন্তর্জীবনে তার এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও অপরের সঙ্গে ঐক্যোপলব্ধির পারস্পরিক সমন্বয় ঘটে: যে অনুভূতিতে তা' ঘটে তা'কেই বলে প্রেম। তার শক্তি প্রকৃতির শক্তিতে মিলিত হয়—এমনি করে সে প্রকৃতির রাজ্যে নিজের স্বাধীন সুযোগ সৃষ্টি ক'রে নেয়। সমাজের প্রতি নিজের দায়িত্ব কবুল ক'রে সে সামাজিক সম্বন্ধের মধ্যে নিজেব স্বাধীনতা অনুভব করে এবং তাইতে নিজের মঙ্গলের জন্য সমষ্টিবোধকে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়। মুক্ত চেতনাব মধ্যে সে বৃহত্তর সত্তার—যে সত্তা ব্যক্তি থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে সমাজে, সমাজ থেকে দেশে, দেশ থেকে জগতে, জগৎ থেকে বিশ্বে বিস্তারিত হচ্চে, তার সঙ্গে ঐক্যানুভব করে: ক্রমবিকাশমান সত্যে ও ক্রমপূর্ণ প্রেমে নিজের পূর্ণতা অনুভব ক'রে চলে। এইরূপে সে নিজেকে সৃষ্টি ক'রে চলেচে। মানুষই একমাত্র জীব যে শুধু তাব দেহে নয়—সমগ্র শক্তিতে এই বহুমুখী পূর্ণতা লাভ করেচে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে তার বিবর্তনে তাব চেতনারও ক্রমবিবর্তন হ'য়ে ব্যষ্টিসত্তাব গণ্ডী অতিক্রম ক'রে তাকে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সম্বন্ধে যুক্ত করেচে—তাইতে সে মানুষ ব'লে পরিচিত। অন্তরের অনুভূতি দিয়ে সে এ' সম্বন্ধকে জানে, কিন্তু পুরোপুরিভাবেও তাকে উপলব্ধি করতে চায়। দেহের বিবর্তনে সে বহির্জগতেব সঙ্গে পূ সংযোগে নিজেকে বিকশিত ক'রে চলেচে। চেতনার বিবর্তনে সে বিশ্বসত্তার সঙ্গে পূর্ণ সমন্বয় খুঁজেচে এবং তারই মাধ্যমে সত্যের সন্ধান করেচে। এমনি ক'রে সে ইউনিভার্সিলেটি বা সার্বজনীনতার কল্পনাও গ'ড়ে তোলে, সত্যকে তার ছাঁচে ফেলে দেয় ও বিশ্বাষ করে যে তাকে রূপ দিতে পারলে পর সে রূপ অনন্তকাল স্থায়ী হবে। এখানেই সে নিজের জৈব প্রয়োজন অতিক্রম ক'রে যায়; কারণ, সত্যকে কল্পনা ও প্রকাশ করা তার দৈহিক প্রয়োজনের মধ্যে পড়েনা। এ' সাধনা, এ' সংগ্রাম তার দৈহিক প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে দেহাতীতকে আশ্রয় ক'রে চলেচে। দেহাশ্রিত জীবনের ভিত্তি অতীতের স্মৃতিতে, আর দেহাতীত জীবন অনন্ত ভবিষ্যতে অমরত্বের অভিসারী। তাইতো দেখা যায়, অতীত সভ্যতার লিপি ও নিদর্শন সমূহের মধ্যে গাঁথা রয়েচে মানুষের যুগ যুগ ধ'রে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার আকাঙ্ক্ষা। এ' আকাঙ্ক্ষার মূলে রয়েচে মানুষের এই আশা যে, সে যে সত্যকে শাশ্বত ও সার্বজনীন ব'লে জানলো, তার

প্রকাশের মাধ্যমে সে সকল দেশের, সকল কালের মানুষের সঙ্গে যোগস্থাপন করবে। তাই সে সভ্যতার পাদপীঠে জীবনের সর্বোত্তম সম্পদ বহন ক'রে এনেচে: শাশ্বতরূপে তাকে প্রকাশ করেচে। সেই শাশ্বত মানুষকে মানুষ যুগে যুগে অভিনন্দন জানিয়েচে। তাতে তো তাকে নিজের জৈব সত্তা অতিক্রম করতে হয়েচেই: অনেক সময়ে সে সত্তা বিনষ্ট ক'রে দিয়ে—এমন কি জীবন বিসর্জন ক'রে সে তার মৃত্যুঞ্জয়ী সত্তা গ'ড়ে তুলেচে। নিজেরই মধ্যে সেখানে মানুষ ভগবানের নাগাল পেয়ে গেলো। তাই তো রবীন্দ্রনাথ বলেচেন, ভগবানের সঙ্গে মিলিত হ'তে হ'লে আমাদেরে বিশ্বকর্মা হ'তে হবে—অর্থাৎ সৎকর্মের দ্বারা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হ'তে হবে; কারণ, তিনি কর্মরূপে সকল বিশ্বে অধিষ্ঠিত: এইরূপেই তিনি মানুষের হৃদয়ে বাস করচেন। ভগবানকে এইরূপে লাভ করাই ধর্ম: শুধু এই রূপেই মানুষ ধর্মের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি ক'রে থাকে। আর যারা ভগবানকে এ' ভাবে ধারণা করে যে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই বর লাভ করা যাবে, তারা তাঁকে নিজের বা নিজ সম্প্রদায়ের একচেটিয়া করে' রাখবার চেষ্টা তো করেই—তা ছাড়া, তাঁকে নিজের বাইরে স্বতন্ত্র ক'রে দেখে—এমনি স্বতন্ত্র যে, তাকে বিশেষ নজরানা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হয়। এ' ধারণাতে প্রকৃত ধর্মের অভাব রয়েচে। সত্যিকার ভগবদকল্পনা জাতি ও সম্প্রদায়ের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে যায়—এক আত্মিক ঐক্যে সমস্ত মানুষকে গেঁথে তোলে। এই আত্মিক ঐক্যই প্রেম—জীবের পারস্পরিক মিলনের শ্রেষ্ঠ আধাররূপে এই প্রেমেই শ্রেষ্ঠ সত্য নিহিত রয়েচে। তাইতো মানুষ একাধারে সৃষ্টি ও স্রষ্টা—তাই তার জ্ঞানে, তার অনুভূতিতে, তার কল্পনায় এ' জগৎ ধরা পড়েচে—তার ব্যক্তিসত্তায় সার্বজনীন সত্তাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েচে। এমনি ক'রে রবীন্দ্রনাথ এ' সত্যে পৌঁছুলেন যে, মানুষ যে ভাবে ভগবানকে কল্পনা করেচে একমাত্র তাই তার পক্ষে সত্য: কারণ সত্যকে সে নিজের মনের বাইরে ধারণা করতে পারে না। আইনষ্টাইন রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন যে মানুষের ধারণার বাইরে এবং উপরেও সত্যের অস্তিত্ব রয়েচে। সে সত্য ছাড়া আমাদের চলে না; সে সত্য এমনি এক বাস্তব সত্য—এমনি রিয়ালিটি যে আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের মনের উপর তা নির্ভর করেনা। অবশ্য এর অর্থ যে কী তা' আমরা বল্‌তে পারি নে; কিন্তু একে আমাদের বিশ্বাস করতেই হবে—যদিও এর ব্যাখ্যা বা প্রমাণ কিছুই আমরা

দিতে পারিনে। এ' কথার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ আইনষ্টাইনকে বল্লেন যে বিজ্ঞান তো প্রমাণ করেচে যে টেবিল একটা বাহ্যরূপ মাত্র, মানুষের মনেই এর অধিষ্ঠান : মন যদি না থাকতো তো টেবিলেরও কোনো অস্তিত্ব থাকতো না। আবার এ'ও ঠিক যে, যে বাস্তব সত্তাটুকু টেবিলে রূপ নিয়েচে তা' বিভিন্ন প্রাকৃতিক—তথা বৈদ্যুতিক শক্তির সমাবেশ মাত্র; অর্থাৎ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের সুসমন্বিত ক্রিয়াতেই এই টেবিলটি গঠিত হয়েচে। মানুষের মনই সেই ক্রিয়া মায় টেবিলের স্বরূপেরও আধার। রবীন্দ্রনাথ আবও বল্লেন যে সত্য নির্ধারণের ব্যাপারে ব্যষ্টিমানবের মন ও বিশ্বমানবের মনের মধ্যে চিরন্তন সংঘাত রয়েছে,—বিজ্ঞান, দর্শন ও নীতিধর্মের মারফৎ তাদের মধ্যে সমন্বয় আনবার চেষ্টাও চিরকাল চল্চে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন সত্য যদি বা থাকে, আমাদের পক্ষে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। উপমা দিয়ে তাঁর বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছিলেন এই বলে, যে পোকার পক্ষে কাগজ সত্য, কারণ, সে কাগজ খেতে পারে; কিন্তু মানুষের পক্ষে ঢের বেশী সত্য কাগজে লিপিবদ্ধ সাহিত্য। সেই মতো যদি এমন কোন সত্য থাকে মানুষের মনের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই—মানুষের বুদ্ধির আওতায় যা আসেনা, ইন্দ্রিয়ের নাগালেও নয়—তবে আমাদের পক্ষে সে সত্যের কোন অস্তিত্ব নেই—অর্থাৎ এই মানবজীবনের পরিধির মধ্যে সে সত্যের কোন স্থান নেই। এ'কথা শুনে আইনষ্টাইন কৌতুক ক'রে ব'লেছিলেন যে, যেহেতু তিনি স্বীকার করচেন যে এমন রিয়ালিটিও আছে যা' মানুষের নাগালের অর্থাৎ তার মনের বাইরে সেহেতু তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশী র্ধবিশ্বাসী। কারণ, তিনি এহেন বাস্তবসত্তা আছে ব'লে স্বীকার করেন যা' আমরা আমাদের মন দিয়ে ধরতে পারিনে। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ক'রে বললেন যে, ব্যক্তিকে অতিক্রম ক'রে যে মানবিক সত্তা তাকেই বলে বিশ্বমানব : তারই চেতনা বিশ্বজনীন মানবিক চেতনা : রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, ধর্ম বলতে তিনি বোঝেন নিজের ব্যক্তিসত্তায় এই চেতনার প্রতিষ্ঠা। এ' বিষয় নিয়েই তিনি হিবার্ট লেক্‌চার দিয়েচেন এবং তার নাম দিয়েচেন "মানবধর্ম"।

এখানেই রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ প্রকট হ'লো। ভগবদ্ভক্তি তাঁর মানবতাবাদের পর্যায়ে পৌছুলো। বিশ্বমানব যে সভ্যতা সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে, জীবনের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সাধনায়, লৌকিক ও লোকাতীত জীবনসন্ধানে নিজেকে অতিক্রম করার মধ্যে নিজেকে পেতে চাইচে—তার সঙ্গে নিজেকে

যুক্ত করাই ভগবানকে লাভ করা। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা সেই যোগের পানেই তাঁকে অবিরাম আহ্বান করছেন।—তারই দুর্দমনীয় আকর্ষণে তিনি এগিয়ে চলেছেন। মানুষের মনুষ্যত্বকে খুব কম লোকই এত বড়ো মহিমায় মহিমান্বিত করেছেন।

সেই জীবনদেবতার উদ্দেশে তিনি গাইলেন :

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছো নিচে,
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।'

মানুষ ভিন্ন ভগবান মিছে। সেই মানুষের মহিমা রবীন্দ্রসাহিত্যে কীর্তিত হয়েছে। মানুষ গড়েছে মানুষের এ' জগৎ : ব্রত তার কঠিন : কিন্তু তার জন্যে কঠিনই আছে : সহজ আছে মৌমাছির জন্যে, মানুষের জন্যে নয়। সে মানুষ বিশ্বের মানুষ : কোনো বিশেষ দেশের বিশেষ কালের মানুষ নয়। সেই মানুষকে আবাহন করার জন্যে রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করলেন বিশ্বভারতী : তা'ও মানুষের জয়ের প্রতীক, বিশ্বমানবের সাধনার প্রতীক : মানবতাবাদে সেখানে মানবিকতার পূর্ণতা।

আধুনিক মানবতাবাদের আলোচনায় জওহরলাল নেহরু স্বাভাবিক ও স্বতোপ্রণোদিত ভাবে স্থানলাভ করেছেন। যে মানবিকতা তাঁর দেশের ও জগতের শান্তি ও কল্যাণচেষ্টায় অবিরত প্রকাশমান, তাইতে তিনি বর্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিকরূপে শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন। কিন্তু এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে জওহরলাল কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে আস্থাবান নন্ : স্বয়ংবিবর্তিত প্রকৃতি ও জগৎই তাঁর নিকট প্রাণের পূর্ণরূপ দেদীপ্যমান ক'রে তুলেছে। মহাজাগতিক শক্তির ক্রমপরিবর্তনশীল প্রকাশ ঘটচে প্রকৃতিতে, আর সেই আদিকাল থেকে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে মানুষের যে সমষ্টিগত বিকাশ ও প্রকাশ ঘটে আসচে তাই জওহরলালকে বিস্মিত, বিহ্বল, বিমুগ্ধ করেছে। তাই তাঁর অবিরত প্রচেষ্টা দেশের ও জগতের মানুষকে প্রবুদ্ধ করবার : নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে নিয়ে যুদ্ধ ও অশান্তির জাল কেটে বেরিয়ে যাবার আহ্বান নিয়ত তাঁর কণ্ঠে ও লেখনীতে ধ্বনিত হচ্ছে। ভারত আবিষ্কার তাঁর চিরদিনের

ব্রত: স্বদেশের বিপুল জনগণকে তিনি স্বপ্নের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোলবার জন্যে অহরহ অনুপ্রাণিত করচেন, অক্লান্ত প্রয়াসে নিজে তাদেরে নেতৃত্ব দিচ্চেন। তিনি বলেন, নদীর বারিধারা যাতে প্রলয় সৃষ্টি না ক'রে করুনারূপে প্রবাহিত হয় তার জন্যে নির্মিত ড্যাম বা জলাধারই নব ভারতের মন্দির: প্রাচীন ভারতের মন্দিরের ভাবৈশ্বর্য বা স্থাপত্যৈশ্বর্য থেকে সে মন্দিরের গরিমা কিছুমাত্র কম নয়। সকল ভারতীয়কে তিনি মহাভারতকে নতুন ক'রে গড়বার বিরাট সৃষ্টিযজ্ঞে আহ্বান করেচেন।—এ' আহ্বান তাঁর শুধু মানুষের নিকট—দেবতার নিকট নয়।

"ডিস্কভারী অব ইণ্ডিয়া" নামক বইয়ে তিনি জীবনের অনুপ্রাণনাকে এ' ভাবে বর্ণনা করেচেন:

"ভগবানে বিশ্বাস আমরা করি বা না করি, কিছু একটাতে বিশ্বাস না ক'রে চলা অসম্ভব—তা' সে আমরা তাকে যে নামই দিই না কেন: হয়তো তাকে বলবো জীবনদায়িনী সৃষ্টিশক্তি, নয়তো বলবো বস্তুর অন্তর্নিহিত এমন এক সঞ্জীবনী শক্তি যা' তাকে আপনা থেকে গতিলাভ করবার, রূপান্তরিত হ'বার এবং বেড়ে উঠবার ক্ষমতা দেয়; নয়তো দেবো তাকে আর কোনো নাম,——মৃত্যুর তুলনায় যেমন জীবন সত্য তেমনি সত্য সে জিনিষ—যদিও তাকে আমরা ধরতে পারচিনে, ক্রমাগত তা' আমাদেরে এড়িয়ে যাচ্চে। সজ্ঞানে হোক্ বা অজ্ঞানে হোক্, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই কোনো না কোনো অজ্ঞাত দেবতার বেদীতে পূজোপচার দিয়ে থাকে, তার উদ্দেশে বলিদান করে: সে দেবতা হ'লো গিয়ে কোনো এক আদর্শ—তা সে ব্যক্তিগত, জাতীয়, আন্তর্জাতীয়—যাই হোক্ না কেন; সে দেবতা কোনো এক দুরধিগম্য উদ্দেশ্য—যুক্তি দিয়ে দেখতে গেলে যার মধ্যে হয়তো কোনো সারবস্তুই নেই: সে পূর্ণ মানুষ ও বর্তমানের চেয়ে উন্নততর পৃথিবী সম্বন্ধে অস্পষ্ট এক ধারণা মাত্র। সম্পূর্ণতা লাভ করা হয়তো অসম্ভব, কিন্তু আমাদের ভিতরে যে দানব আছে—সে একপ্রকার প্রাণশক্তিই বটে—সে আমাদেরে তাড়িয়ে নিয়ে চলে: বংশানুক্রমে আমরা সে পূর্ণতারই উদ্দেশে পথ চলচি।

"জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের আধিপত্য ক'মে আসে—অবশ্য ধর্ম কথাটা এখানে সংকীর্ণ অর্থেই ধরতে হবে। জীবন ও প্রকৃতি আমরা যতোই বেশী বুঝতে পারি ততোই তাদের পিছনে অতিপ্রাকৃতিক কারণের অস্তিত্ব কম খুঁজি। যা-ই আমরা বুঝতে পারি ও আমাদের

আয়ত্তে আসে তাতেই আর কোনো রহস্য থাকেনা। কৃষিপদ্ধতি সমূহ, আমরা যে খাদ্য খাই, যে কাপড় আমরা পরিধান করি, আমাদের যে সব সামাজিক সম্বন্ধাদি আছে সে সবই একসময়ে ধর্ম ও তার প্রভু পুরোহিতদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ক্রমে ক্রমে তারা ধর্মের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এসে বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের বিষয়ীভূত হয়েচে। তবু এদের উপরও এখনও ধর্মীয় বিশ্বাস ও তার আনুষঙ্গিক কুসংস্কারাদির প্রভাব বিদ্যমান রয়েচে। বিশ্বের চরম রহস্যাদি এখনও মানুষের মনের আয়ত্তের অনেক বাইরে রয়েচে এবং পরেও বাইরে থাকারই সম্ভাবনা। কিন্তু এখন জীবনের এত রহস্যের সমাধান করা যায় এবং এত রহস্য সমাধানের অপেক্ষাও করচে, যে চরম রহস্য নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই, সংগতিও নেই। জীবন আমাদের সামনে শুধু জগতের সৌন্দর্যমাধুর্য তুলে ধরচেনা—নিত্য নূতন ও অবিরত আবিষ্কারের, চোখের সামনে নব নব দৃশ্য উদ্ঘাটনের এবং জীবন যাপনের নব নব প্রণালীর দুঃসাহসিক উদ্দীপনা এনে দিচ্চে। তাতে জীবনের পূর্ণতা বাড়চে, জীবনকে অধিকতর সমৃদ্ধ ও সম্পূর্ণ ক'রে চলেচে।

"অতএব আমাদেরে জীবনের মুখোমুখী হ'তে হবে বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, তার সঙ্গে দার্শনিক মনোভাব মিশিয়ে, এবং এদেরেও অতিক্রম ক'রে যা' কিছু বিদ্যমান রয়েচে তার সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে। তা' হ'লেই আমরা জীবন সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধ ধারণাকল্পনা করতে পারবো, সে ধারণাকল্পনার বিরাট পরিধিতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ই ধরা পড়বে—তাদের শিখরে যা' কিছু রয়েচে বা তাদের তলায় যা তলিয়ে আছে, সে সব কিছুই বাকী থাকবেনা: তখন আমরা প্রশান্তচিত্তে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে পারবো। তলায় অনেক কিছু রয়েচে, সে সব নেই ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যাবেনা; যে মাধুর্য সৌন্দর্য আমাদেরে ঘিরে আছে তার সঙ্গে জগতের দুঃখ দুর্দশাও আছে। মানুষের জীবনযাত্রা সুখদুঃখের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ: তারই মাধ্যমে সে শিক্ষা লাভ করতে ও অগ্রসর হ'তে পারে। মানবাত্মার দুঃখদহন এক শোকাবহ ব্যাপার; তাতে তার কোনো সঙ্গীসাথী নেই। বাইরের সব ঘটনা এবং তাদের ফলাফল আমাদের উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করে; তবু এ'ও সত্য যে আমাদের অন্তরের ভয় ও দ্বন্দ্ব থেকেই আমরা সব চেয়ে বড়ো আঘাত পাই। বেঁচে থাকতে হ'লে বাহ্যত আমাদেরে এগিয়ে যেতেই হবে: যখন আমরা এগিয়ে যাই ঠিক তখনই

আমাদের নিজের মনের এবং নিজের ও পরিবেশের মধ্যে শান্তি খুঁজতে হয়: সে শান্তি খুঁজতে হয়, যাতে শুধু আমাদের দৈহিক ও বাস্তব প্রয়োজনের তৃপ্তি নয়—কল্পনার রাজ্যেব যে সব প্রেরণা ও দুঃসাহসিকতার অনুপ্রাণনা, চিন্তা ও কর্মরাজ্যে মানুষের বিপদসঙ্কুল যাত্রারম্ভের দিন থেকেই তাকে বৈশিষ্ট্য দান করে এসেচে, তাদেরও চরিতার্থতা ঘটে। সে যাত্রার কোনো পরমার্থ আছে বা নেই তা' আমরা জানিনে: কিন্তু এ' কথা ঠিক যে দুঃসাধ্য যাত্রার দুঃখ সইবারও সান্ত্বনা আছে: তাতে নিকটের লক্ষ্যবস্তুর দিগনির্দেশ পাওয়া যায়. সে লক্ষ্যলাভ সম্ভব বোধ হয় এবং তা' থেকেই নূতন করে' অগ্রসর হওয়া যায়।"

আধুনিক কালে ভারতে—তথা এশিয়াতে মানবতাবাদের অভিজ্ঞান রচনায় এবং মানুষেব ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনে তা'ব বাস্তব কার্যক্রম নির্ণয়ের কৃতিত্ব একটি লোকেবই প্রাপ্য, এবং তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বস্তুবাদী দৃষ্টিতে যে সাময়িক বিভ্রম ঘটিয়েছিল তাতে আইডিয়ালিষ্টরা ফের অজ্ঞেয়, অতিপ্রাকৃতিক শক্তিব পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা করেছিলেন। যখন দেখা গেলো অণুও সৃষ্টির মূল নয—মূল খুঁজতে আরও গভীরে, আবও ভিতরে যেতে হবে, তখনই বোধ হ'লো যেন মানুষের জারিজুরী ভেঙ্গে গেছে—সৃষ্টিরহস্য তার নাগালের বাইরে দুর্জ্ঞেয় রয়ে গেলো। মানুষেব মনোলোকে ফের অধ্যাত্ম ধূমজাল নেমে আসার সম্ভাবনা দেখা দিলো এবং মানবতাবাদী বিশ্বাস তাতে বিপন্ন হ'লো। মানবেন্দ্রনাথ রায় এ' সংকটেরও মোকাবিলা করেচেন এবং দেখিয়েচেন যে অচেতন প্রাকৃতিক জগৎ ও প্রাণীজগতের সঠিক যোগসূত্র যদিও এখনও আবিষ্কৃত হয়নি, বিজ্ঞান এখন এ স্তরে পৌছেচে যাতে এ' কথা জোর ক'রে বলা যায় যে দুইয়েরই প্রাণপদার্থ এক: মানুষের দৈহিক ও মানসিক সত্তার প্রাণপদার্থ স্বতন্ত্র নয়: সমগ্র বিবর্তনের এক অখণ্ড সূত্র রয়েচে। এমন কি, আমরা যাকে আত্মা বলি তা' মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাবাবেগের সমষ্টি ছাড়া কিছু নয়। কাজেই উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান বিশ্ব জগতের যে যান্ত্রিক রূপ কল্পনা করেছিল এবং যার উপর এতদিন বস্তুবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, বিংশ শতাব্দীতে তার কতকটা পরিবর্তন ঘটলেও প্রাণের বিবর্তনসম্পর্কিত সিদ্ধান্তের তাতে কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই মানুষের স্বয়ংবিবর্তিত, স্বয়ংক্রিয় সত্তারও কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। মানবেন্দ্রনাথ

বলেছেন, মানুষ যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও সন্ধান করছে, তা' তার জৈব বিবর্তনেরই অবিরত অভিব্যক্তি। তার সামাজিক বিবর্তনও জৈব বিবর্তনেরই ধারা অনুসরণ ক'রে ঘটেছে। মানবজাতির ইতিহাস উদ্ঘাটন ক'রে মানবেন্দ্র নাথ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সে যখন শুধু রোমান্টিসিজমে অনুপ্রাণিত হয়ে অর্থাৎ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে বিপ্লব করতে গেছে, তখনই উন্মার্গগামিতার মধ্যে হারিয়ে গিয়ে বিপ্লবের উদ্দেশ্য অর্থাৎ স্বাধীনতাকে পরাস্ত ক'রে একচ্ছত্র ক্ষমতার আওতায় চলে গেছে; আবার যখন শুধু বুদ্ধি অনুসরণ ক'রে চলতে চেয়েছে তখনই নানা সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে উপর-থেকে-চাপিয়ে-দেওয়া মতবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। অতএব তাঁর মতে বুদ্ধি, সৃষ্টির আবেগ ও বিপ্লবোদ্যোগের সমন্বয়ই মানুষের পক্ষে একমাত্র বিধেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেখছেন যে, যে সব রাজনৈতিক মতবাদে ব্যষ্টিমানুষ সমষ্টির এক ক্ষুদ্র অংশমাত্রে পরিগণিত, সেখানে তার মানবতা অক্ষুণ্ণ নেই: সেখানে তার স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়েছে। কম্যুনিজম, ফ্যাসিজম প্রভৃতি মতবাদের আওতায় মানুষের এই হালই দেখা গেছে ও যাচ্ছে। মানুষের জীবন অর্থনীতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এ' মতও গ্রহণীয় নয়: কারণ, তা' মানতে গেলে মানুষের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও সম্ভাবনা থাকে না। অতি-প্রাকৃতিক শক্তি না হোক—সে এক পার্থিব শক্তিরই অধীন হ'য়ে পড়ে। অন্যদিকে উদারনৈতিক গণতন্ত্রেও মানুষ সমষ্টির অংশরূপেই গণ্য হয় এবং কয়েক বছর পর একবার ভোট দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো সত্তাই তার থাকে না। বস্তুত পার্টিকে অবলম্বন ক'রে যে রাজনীতি চলে তার উদ্দেশ্য থাকে শুধু ক্ষমতা দখল করা। ব্যক্তিমানুষ তাতে নিজের সত্তা এবং তার সঙ্গে স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। মানবেন্দ্রনাথ তাই প্রস্তাব করেছেন যে মানুষের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সংস্থা গ'ড়ে উঠবে স্থানীয় প্রজাতন্ত্রকে ভিত্তি ক'রে: জনগণ সে প্রজাতন্ত্র নির্বাচিত করবে এবং নির্বাচনের পরেও তাদের অধিকার থাকবে কোনো গুরুতর প্রশ্নে নিজেদের মত সরাসরি ব্যক্ত করার এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরে ফিরিয়ে আনার। স্থানীয় প্রজাতন্ত্রই উচ্চতর বিধানসভার সদস্য নির্বাচন করবে। মানবেন্দ্রনাথ এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, এ'হেন কার্যক্রমে ব্যক্তিমানুষের সত্তা অক্ষুণ্ণ ও স্বাধীনতা কার্যকরী থাকবে। আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে মানবতাবাদ যে রূপ নিয়েছে তাকে তিনি নাম দিয়েছেন নব-মানবতাবাদ এবং মানুষের জীবনে তার কার্যকরী রূপকে

তিনি র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম বা মৌলিক ক্রিয়াশীল মানবতাবাদ ব'লে অভিহিত করেছেন। যে বাস্তব, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তিনি তাঁর মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন তা' এই যে, জৈব বিবর্তনক্রমেই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উদ্ভব হয়ে থাকে : অতএব তার উপর নির্ভর ক'রেই সে সত্যমিথ্যা, ন্যায়অন্যায় বিচার করতে পারে। স্বাধীনতার সন্ধানপথে মানুষ জ্ঞানের নাগাল পায় এবং তার দ্বারা সত্যলাভ করে। অতএব অসদুপায়ে স্বাধীনতা লাভ করা যায় না : কারণ, উপায়ের অসততায় স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। যে প্রকৃত জ্ঞানী সে কখনও মিথ্যাচার করতে পারে না। স্বাধীনতা, জ্ঞান ও সত্যের সম্পদে সমৃদ্ধ মানুষ মহীয়ান, গরীয়ান—কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভর ক'রে নয়, নিজেরই প্রকৃতিলব্ধ বুদ্ধি ও বিবেকের দৌলতে। র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমের মাধ্যমে মানবেন্দ্রনাথ মানুষকে স্বয়ংনিয়ন্তা করতে চেয়েছেন : সমষ্টিসত্তায় হারিয়ে যাওয়ার বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করার, পার্টি ও ক্ষমতাসর্বস্ব রাজনীতির কবল হ'তে বাঁচিয়ে তার মানবতা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস পেয়েছেন। এ' প্রয়াসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে, সন্দেহ নেই।

এ প্রয়াসের বাস্তব কার্য্যকারিতা কতটা আছে এবং কীভাবে আছে তার সন্ধান নেওয়া দরকার। মানবেন্দ্রনাথ বলেছেন, নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত গণসমিতি বা পঞ্চায়েৎসমূহ সর্বাংশে নির্বাচন দ্বারা গঠিত হ'তে পারবে না : আংশিক মনোনয়ন দ্বারা পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু নির্বাচনের ব্যবস্থা ও মনোনয়ন কে করবে, তা' বলা হয়নি। বর্তমান কোনো রাষ্ট্র বা সমাজকে যদি সে দায়িত্ব দিতে হয়, তবে আর এমন বলা যাবে না যে ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে জনগণের মধ্য হ'তে প্রসারিত হ'লো। তা' ছাড়া তিনি বলেছেন, যতদিন না পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করা যায়, ততদিন অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য এক রাষ্ট্রপরিষদ থাকবে এবং সে পরিষদ বিদ্বান, বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যারা যোগ্যতম, তাদেরে নিয়ে গঠিত হবে। এ' যেন অনেকটা প্লেটোকল্পিত দার্শনিকদের দ্বারা শাসনের ব্যবস্থা; কিন্তু এ ব্যবস্থা কার্যকরী করবে কে, তার কোনো নির্দেশ পাওয়া যায়নি। যা' হোক, শিক্ষার প্রচলন করতে হবে, এ'কথা বলতে গিয়ে মানবেন্দ্রনাথ যা' বোঝাতে চেয়েছেন তা' এই যে, মৌলিক ক্রিয়াশীল মানবতাবাদের বোদ্ধা যাঁরা তাঁরাই জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ভার গ্রহণ করবেন : তাঁরা কোনো পার্টি গঠন করবেন না, ক্ষমতা যাচ্ঞা করবেন না : জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণে প্রণোদিত করাই হ'বে তাঁদের ব্রত।

কিন্তু এখানে বলা দরকার : জনগণ যদি ও যখন আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তবে ও তখন তাঁদেরে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে তদনুযায়ী কর্মনীতি গ্রহণ ও কার্যকরী করতে হবে ; এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে যদি বা তাঁরা একমত হন, তবুও সবাই যে এক মূল নীতি ও কর্মনীতি একবাক্যে অনুমোদন করবে, এমন কখনও হ'তে পারে না। মানবেন্দ্রনাথ নিজেই বলেচেন যে তাঁর প্রস্তাবিত অন্তবর্তীকালীন রাষ্ট্রপরিষদ যাতে কায়েমী স্বার্থের প্রভাবের অধীন না হ'য়ে পড়ে সেজন্য এ' রকম নিয়ম থাকবে যে, যে সব বিরাট বৃত্তি বা ব্যবসায় রয়েচে তাদের কোনো লোক রাষ্ট্রপরিষদের সদস্য হ'তে পারবে না—তবে যারা সে সব ব্যবসায়ে শুধু বেতনভোগীরূপে সংশ্লিষ্ট তাদের উপর এ' বাধা খাটবে না। তিনি আরও বলেচেন যে সমাজ, অর্থনীতি প্রভৃতি সব কিছুই ন্যায়ের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে হ'বে : যেমন চলে আসচে তেমনি চলুক, এ' নীতির ব্যর্থতা সম্যক প্রতিপন্ন হয়েচে। তার অর্থই এই যে জনপঞ্চায়েৎকে এ' সব বিষয়ে সুস্পষ্ট কার্যনীতি গ্রহণ করতে হবে। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারেই কাজ হ'বে এবং তা' করবার প্রয়োজনে তারা যে সঙ্ঘবদ্ধতা অবলম্বন করবেন, তাকে পার্টি নাম দেওয়া হোক বা না হোক্ কার্যত তা' পার্টিরই আকার ধারণ করবে এবং তাতে ব্যক্তিসত্তা কীভাবে অক্ষুণ্ণ থাকবে তা' ঠিক বোঝা যাচ্চে না। যদি বলা হয় যে হিউম্যানিজম—তথা মানুষের স্বরাটত্বে ও সার্বভৌমত্বে শিক্ষিত দীক্ষিত মানুষ আর কিছুতে কোনোরূপ সমষ্টি সংগঠনে নিজেকে বিসর্জন দেবে না, তবে বুঝতে হ'বে যে, শুধু সে রকম শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ মানুষই সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কর্তব্য পালন করতে গিয়ে সমষ্টি সংগঠনে নিজের সত্তার বিলোপ পরিহার ক'রে চলতে পারবে। বলা বাহুল্য, সাধারণভাবে শিক্ষা বলতে যা' বুঝা যায়, শুধু তার বলে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যক্তিসত্তার সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কিন্তু মানবতাবাদী শিক্ষায় মানবসত্তার উদ্বোধন—সে তো বহু দূরের কথা ; এবং তা যতক্ষণ সম্ভব না হচ্চে, ততক্ষণ মানবেন্দ্রনাথপ্রস্তাবিত স্বরাট গণপঞ্চায়েৎ এবং পঞ্চায়েৎভিত্তিক উচ্চতর রাষ্ট্রসংস্থাকে পার্টি, নায়ক ও রাজনীতির আওতা থেকে দূরে রাখবার উপায় কি? উপায় দেখা যাচ্ছে একমাত্র কোনো প্রকারের একচ্ছত্র শাসন বা ডিক্টেটরশিপ—যা' পার্টি, নায়ক ও রাজনীতির অভ্যুত্থান নিবারিত করবে। কিন্তু ডিক্টেটরশিপ মানেই যে শুধু ব্যক্তিসত্তা নয়—সাধারণ ব্যক্তিস্বাধীনতার বিলোপ, তা তো অতি সাধারণ সত্য।

কাজেই মৌলিক ক্রিয়াশীল মানবতাবাদ বাস্তবে কীভাবে কার্যকরী হবে তা' স্পষ্ট হলোনা। যাঁরা নিজেদেরে এ' মতের অনুসারী ও প্রচারক ব'লে দাবী করেন তারাও নিজেদেরে লোকশিক্ষক মনে ক'রে সন্তুষ্ট: ইংরেজীতে যাকে বলে মেথডলজী—অর্থাৎ মতবাদের বাস্তব কার্যবিধি—তা' তাঁদের নিকট থেকে পাওয়া যায়নি। তা' হ'লে এ সিদ্ধান্তই করতে হয় যে মানুষ যতদিন না মানবতাবাদী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে নিজেকে স্বরাট ও সার্বভৌম বলে জানবে, ততদিন সমাজ ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে মানবতাবাদ কার্যকরী হ'তে পারবে না। বর্তমানে যে সব হিউ-ম্যানিষ্ট বা মানবতাবাদী রয়েচেন তাঁরা সে শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন ও সে উদ্দেশ্যে তাঁদেরে কোনো না কোনোরূপ সঙ্ঘবদ্ধ কর্মোদ্যম গ্রহণ করতে হবে। তা' ছাড়া তাঁরা এ' দাবীও করবেন যে মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞান এখন যে স্তরে এসে পৌছেচে, দেশে দেশে জনগণের শিক্ষাকে তার অনুসারী করতে হবে; কোনো সংস্কারবশে বা কায়েমী স্বার্থের খাতিরেই তাকে চেপে রাখা,—অসত্য ও অর্ধসত্যে শিক্ষাকে ভারাক্রান্ত করা—চলবে না। সকল দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজের নিকট এই সত্যের আহ্বান জানিয়ে মানবসমাজকে সম্যক আত্মপরিচয়ে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসেই মানবতাবাদের জয়যাত্রা রূপ ধরবে। কায়েমী স্বার্থের প্রয়োজনে বা সংস্কারবশে শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও সংকোচনের বহুদৃষ্টান্ত বর্তমান জগৎ থেকেও দেওয়া যায়। কোনো কোনো সভ্য সমুন্নত দেশে এমন বিশ্ব-বিদ্যালয়ও আছে যেখানে ডারউইনের বিবর্তনবাদ পড়ানো হয় না, মার্ক্সবাদকে সযত্নে দূরে রাখা হয়। মানবতাবাদী শিক্ষায় আত্মোদ্বোধনের পথের বাধা দূর করার অভিযানও মানবতাবাদী অভিযান। তার সাফল্যের আশা সুদূর পরাহত যদি হয় তবু সেই সুদূরের অভিমুখেই মানুষের জয়যাত্রা। সেই সুদূরেই তবে মৌলিক ক্রিয়াশীল মানবতাবাদের সার্থকতার সম্ভাবনা—মহতী সম্ভাবনা॥

মানবতাবাদী দৃষ্টিতে

মৃত্যু ও জীবন

"হায় দেহ !—নাই তুমি ছাড়া কেহ
জানি তাহা প্রাণে প্রাণে,
মুরতি-পাগল মনের মমতা
তাই ধায় তোমাপানে।
তোমারি সীমায় চেতনার শেষ,
তুমি আছ তাই আছে কাল-দেশ,
দুঃখ-সুখের মত্ত পরিবেশ !
দেহলীলা-অবসানে
যা থাকে তাহার বৃথা ভাগাভাগি
দর্শনে-বিজ্ঞানে !"

(মৃত্যু-শোক—মোহিতলাল মজুমদার)

ভাগ ক'রে কিন্তু বিশেষ কিছু রইলোনা, ভাগ করবার মতো বেশী কিছু ছিলও না। আবহমান কাল ধ'রে মানুষ দেহ'নরপেক্ষ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে চেয়েচে : আত্মারই ভরসায় অমরত্বের ভরসা করেচে। কিন্তু দেহছাড়া কোনো সত্তা বাস্তবিকই কি আছে ? যদি না থাকে, তবে মৃত্যুর পর মানুষের চেতনা থাক্‌তে পারে না। মানবতাবাদীর পক্ষে এ বিষয়টি ভালো ক'রে জানা ও বোঝা দরকার : কারণ, যদি মৃত্যুর পর মানুষের কোনো অস্তিত্ব না থাকে তবে সে ইহলোককেই একান্ত ব'লে ভাব্‌তে শিখ্‌বে, ইহলৌকিক সত্তাকে পুরো মূল্য দেবে। বস্তুত মানুষ যে অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপারে বিশ্বাস করে তার কারণ, সে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে তো বটেই :—কিন্তু তার চেয়েও বেশী ভরসা তার মৃত্যুর পরবর্তী অমৃত লোকের—কারণ, তাতে সে নিজের অমরত্বের আশা পাচ্চে। মৃত্যুর পরের প্রার্থিত জীবনকে ঘিরেই তার ভাবনাচিন্তাধ্যানদর্শন গ'ড়ে উঠেচে : ভগবানকেও সে অনেকটা সে জীবনেরই আধার ও আশ্রয় ব'লে মনে করে। কিন্তু সত্যই কি দেহ ও আত্মা আলাদা : অধিকাংশ ধর্মে তো বল্‌চে মৃত্যুতে আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়—সে আত্মা অমর। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষিত সত্যে তো এ' কথার প্রমাণ মেলে না। বায়োলজী

বা জীববিদ্যা থেকে আমরা জানতে পারি যে ক্রমবিবর্তনের ফলে মানুষের উদ্ভব হয়েছে, তাকে সহসা একদিন কেউ সৃষ্টি ক'রে পাঠায়নি। মানুষের দেহের ক্রিয়া অত্যন্ত জটিল, তার মধ্যে মনের ক্রিয়া আরও জটিল এবং কোনোটাই একদিনে গ'ড়ে ওঠেনা—জন্ম থেকে শুরু ক'রে ধীরে ধীরে বিকশিত হ'তে থাকে। শৈশবে মানুষের চিন্তাশক্তি অপরিণত অবস্থায় থাকে, আবার বৃদ্ধবয়সে স্মৃতিশক্তিহ্রাস ইত্যাদি আকারে সে শক্তি কমতে থাকে, এবং তাতেই প্রমাণিত হয় যে দেহের সঙ্গে মনের অঙ্গাঙ্গিগত সম্বন্ধ রয়েছে। যৌনশক্তির বিকাশ ও হ্রাস, পূর্বপুরুষের দৈহিক ও মানসিক প্রভাব, পুরুষ ও নারীর দেহের গঠনে প্রভেদ—এ সব কিছুতেই প্রমাণিত হয় মানুষের সত্তা সবদিক দিয়েই তার দেহের উপর নির্ভরশীল। দেহ যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিকল না হয় ততক্ষণ জীবের মৃত্যুও হয় না। বস্তুত দেহের সুস্থতা অসুস্থতা, স্বচ্ছতা বা বৈকল্যপ্রাপ্তি, সম্পূর্ণরূপে তার নিজস্ব নিয়মানুযায়ী গতির উপর নির্ভর করে: সে গতির সহায়তা বা বিরোধিতার ব্যবস্থা করা মানুষের পক্ষেই সম্ভব: তাতে অতিপ্রাকৃতিক কোনো শক্তির কোনোরূপ হস্তক্ষেপের চিহ্ন নেই। মনোবিজ্ঞান ও সে জাতীয় অন্যান্য বিজ্ঞানে দেহ ও ব্যক্তিসত্তার অদ্বৈততার তর্কাতীত প্রমাণ পাওয়া গেছে। চেতনার মাধ্যমে আমরা যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করি তাদেরও উৎপত্তি হয় নার্ভ বা স্নায়ুর ক্রিয়াতে: মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড, পঞ্চেন্দ্রিয়—বস্তুত সর্বাঙ্গে সে ক্রিয়া চল্‌চে। মানুষের চিন্তার প্রক্রিয়া, তার স্মৃতিশক্তির ক্রিয়া, সবই বিভিন্ন ও বিচিত্র অণুকোষে নিহিত রয়েছে, মৃত্যুতে তাদের বিলয় ঘটে: কাজেই তখন আর মানুষের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। যখন মানুষের মস্তিষ্কবিকৃতি বা অন্য কোনো বিকার ঘটে, তখনও দেখা যায় তার দেহকোষের ক্রিয়ায় কোনো বৈকল্য ঘটেচে। দেহে কোনো আঘাত বা অসুখের ফলে মানসিক শক্তির বিকার তো অহরহই ঘটচে। মদ খেলে পর মানুষের মগজের ক্রিয়ায় গোলমাল হয়, গভীর ক্লান্তি বা নিদ্রাতেও মস্তিষ্ক হতচেতন হ'য়ে পড়ে। অবশ্য এমনও হয় যে নিদারুণ অসুখেও মানুষের মগজ কার্যকর্মী থাকে: তার কারণ এই যে, তা' এমন ধরণের অসুখ যে তাতে মস্তিষ্কের দেহকোষের কোনো ক্ষতি হয়না। রাগ বা গভীর দুঃখবোধ হ'লে পর বা মনে যখন খুব আশা জাগে এবং খুশীর উদয় হয়, তখন যে মানুষের শরীরেও প্রতিক্রিয়া জাগে তা' সকলেরই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় যে শরীর খারাপ হয়, মানুষ যখন হঠাৎ একটা বিপদের মুখে পড়ে বা মনে কোনো আঘাত পায়,

তখন তার দেহেও প্রতিক্রিয়া জাগে তা'ও সহজ সত্য। মনোবিশ্লেষণ ক'রে জানা গেছে যে দেহের উপর মানুষের অবচেতন মনের গভীর প্রভাব রয়েচে—যথা, যৌনানুভূতি যদি সহজ প্রকাশ না পায় বা কোনো ব্যাপকতর অনুভূতিতে মিশিয়ে দেওয়া না যায়, তবে তা' চেপে রাখার ফলে দেহে মনে নানা বিকার দেখা দিতে পারে। মানুষের দেহের চলনে, মুখের ভাবে, তার ব্যক্তিসত্তা প্রকাশ পায় এবং ইচ্ছা ক'রে সে প্রকাশ নিয়ন্ত্রণও করা চলে। দেহ ও ব্যক্তিসত্তার নিকট সম্বন্ধের আরেক প্রমাণ এই যে, মানুষ যে পরিবেশে থাকে তা' দ্বারাই তার ব্যক্তিত্ব গ'ড়ে ওঠে: বস্তুত পরিবার, সমাজ, দেশ প্রভৃতি সব কিছুর উপর তার মনের বিকাশ নির্ভর করে। তার বাকশক্তির বিকাশও হয়েচে তখনই যখন সে অন্য মানুষের সংস্পর্শে এসেচে: সমাজে রয়েচে ব'লেই তাকে নানারকম নৈতিক মূল্যবান প্রতিষ্ঠা করতে হয়েচে তার সত্যমিথ্যা, ন্যায়ান্যায়, পাপপুণ্যবোধও এম্‌নি ক'রেই গ'ড়ে উঠেচে ও তার বিবেক গ'ড়ে তুলেচে: সে সব কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তি থেকে তার আত্মাতে ঢুকেচে, এমন মনে করার কোনো কারণই নেই—কারণ, তাদের উদ্ভব ও পরিণতি কেমন ক'রে হলো তা' নৃতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান থেকেই স্পষ্ট ক'রে জানা যায়। একদিকে দেহ এবং অন্যদিকে মন ও ব্যক্তিসত্তার মধ্যে অঙ্গাঙ্গিসম্পর্ক রয়েচে; তেমনি একদিকে দেহ, মন, ব্যক্তিসত্তা মিলে যে গোটা মানুষ, তার এবং তার পরিবেশের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান। বস্তুত মন ও ব্যক্তিসত্তাকে আমরা অযথা পরস্পর পৃথক ভাবসত্তা ব'লে ভেবে ও ব'লে আসচি। আসলে পরিপাক-ক্রিয়া ও শ্বাসগ্রহণ যেমন দেহগত ক্রিয়া, তেম্‌নি মন ও ব্যক্তিসত্তারও দেহনিরপেক্ষ কোনো অস্তিত্ব নেই এবং তার পিছনে স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করাও অবাস্তব। মনও অন্য সব ক্রিয়ার মতো মানবসত্তার এক ক্রিয়া মাত্র। আসলে দেহ ও ব্যক্তিসত্তাকে স্বতন্ত্র ব'লে কল্পনা করা হয় এ জন্য যে দৈহিক ক্রিয়া—যথা শ্বাসগ্রহণ, ও মনের ক্রিয়া—যথা ভাবনা, এক জাতীয় ক্রিয়া নয়: এমন কি, বৈজ্ঞানিক মতে মানুষের মস্তিষ্কের ভেতরই ভাগ রয়েচে। এক ভাগে আছে মানুষের সুসংবদ্ধ চিন্তা করবার শক্তি, আর নিম্ন ভাগে আছে তার ভাবাবেগ: এবং তা' থেকেই শ্বাসগ্রহণ ও রক্ত সঞ্চালনের শক্তি সঞ্চারিত হচ্চে। বৈজ্ঞানিক মতে জীববিবর্তনে আগে মস্তিষ্কের নিম্নভাগ রূপ নিয়েছিল। মানুষের অর্ধচেতন ও অবচেতন মনের সঙ্গে সচেতন মনের সংঘর্ষ চল্‌চে, এবং দেখা যাচ্চে, তার ফলেই নানারকম মনোবিকারের সৃষ্টি হচ্চে। এ' সবই ঘট্‌চে

দেহের অভ্যন্তরে, অথচ এর ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে আমরা দেহাতীত এক আত্মা কল্পনা করেচি। মানুষ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তা'ও আছে প্রকৃতিরই আওতায়—প্রকৃতিকে অতিক্রম ক'রে নয়।

বস্তুত দেখা যায়, বিভিন্ন ধর্মে যে অমরত্বের কল্পনা করা হয়েচে তা' দেহকে বাদ দিয়ে নয়—দেহ কোনো আকারে বজায় থাকবে এই ভিত্তিতেই মৃত্যুর পরের অস্তিত্বকে মনোরম রূপে কল্পনা করা হয়েচে। প্রাচীন গ্রীকরা মরণ-পারের অস্তিত্বকে বীভৎসরূপে কল্পনা করেছিলেন : সেকারণে প্লেটো বলেছিলেন, এ' কল্পনার পরিবর্তন দরকার, নইলে লোকে আর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে চাইবে না। প্রাচীন মিশরীয়েরা মমি বা শবদেহ রক্ষার ব্যবস্থা করতো—কারণ, তা' ছাড়া সত্যিকার অমরত্ব লাভ হবেনা ব'লেই তাদের বিশ্বাস ছিল। ওল্ড টেষ্টামেন্টে দেহহীন আত্মার অধিষ্ঠানকে ভয়াবহরূপে কল্পনা করা হয়েচে, কিন্তু নিউ টেষ্টামেণ্টে মৃত্যু থেকে মানুষের পুনরুজ্জীবনের যে কল্পনা রয়েচে, তা' দৈহিক পুনরুজ্জীবনই বটে। বস্তুত চিকিৎসাবিদ্যাতে যখন শবব্যবচ্ছেদ ও অস্ত্রোপচার প্রবর্তিত হলো তখন ধর্মযাজকেরা আপত্তি তুলেছিলেন এই ব'লে যে, তাতে দেহের অঙ্গহানি হবে এবং মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবনের ব্যাঘাত ঘটবে। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের প্রসারের ফলে দৈহিক পুনরুজ্জীবনের কল্পনা অটুট রাখা সম্ভব হয় নি; কিন্তু প্রোটেষ্টাণ্টরা যে অমরত্বের কল্পনা করেচে তার সঙ্গে এক আধ্যাত্মিক ও বায়বীয় গোছের অতিপ্রাকৃতিক দেহের কল্পনা সংযোজিত রয়েচে। আর থিওসফিষ্ট প্রভৃতি ধর্মমতাবলম্বীরা তো মৃত্যুর পরে আত্মার দৈহিক অস্তিত্ব থাকে ব'লেই দাবী ক'রে থাকেন। তা' হ'লে দেখা যায়, ধর্মমতানুসারেও মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব দেহবিবর্জিত নয়। বস্তুত দেহ ছাড়া আত্মার—তথা মানুষের ব্যক্তিসত্তার কোনো অস্তিত্ব নেই এবং যেহেতু এই দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হ'চ্চে, সেহেতু দেহের পরে আর অস্তিত্বের আশা করা অবাস্তর, এই হলো যুক্তিভিত্তিক বিজ্ঞাননির্ধারিত সত্য।

এই জন্যই দেখা যায়, জগৎ ও জীবনের রূপ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যতই অগ্রসর হচ্চে, ততই পারলৌকিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ধোঁয়াটে ও অস্পষ্ট হ'য়ে আসচে। শেষকালে কেউ কেউ এমনও বলেচেন যে, পৃথিবীতে চেতন ও অচেতন যা' কিছু আছে পরলোকে তারই বিকল্প অস্তিত্ব রয়েচে। অনেকে সঙ্গতভাবেই এ প্রশ্ন তুলেচেন যে, মানুষের যদি দেহাতীত অস্তিত্ব থাকে, তবে অন্যান্য জীব—যথা কুকুর বেড়াল সাপ ব্যাঙ্ ইত্যাদিরই বা কেন থাকবেনা

—এমন কি, গাছপালারও যখন প্রাণ আছে ব'লে জানা গেছে তখন তাদেরও তো পারলৌকিক অস্তিত্ব থাক্‌তে পারে। গৃহপালিত কুকুর প্রভৃতির সঙ্গে পরলোকে দেখা হবে এ' আশা অবশ্য কেউ কেউ প্রকাশ্যেই প্রকাশ ক'রে থাকেন।

এখন প্রশ্ন হলো, এ' রকম অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক আশা মানুষ কেন করে। কারু কারু মতে স্বর্গনরক কল্পনার উদ্ভব হয়েচে এই পার্থিব জীবনেরই প্রতিবিম্বরূপে: যা' কিছু সত্য, যা' কিছু সুন্দর, তারই অধিষ্ঠানরূপে আমরা স্বর্গকে কল্পনা করেচি—আর যা' কিছু কুশ্রী, অসুন্দর তাকে নরকে ঠেলে দিয়েচি। এ' জীবনের আমরা যে নৈতিক মানদণ্ড নির্দিষ্ট করেচি, তা'তে '' কিছু মহান, যা' কিছু উন্নত তার আশ্রয় ও আধার স্বর্গ এবং যা' কিছু নীচ ও অবনত তার আবাস নরক—এই ভাবেই আমরা এই জীবননিবীক্ষাকে রূপ দিয়েচি। দেহাতীত অস্তিত্বের কল্পনা এরই সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। যেহেতু আমরা মরতে চাইনা সেহেতু অমরত্ব কল্পনা করেচি: অকাল মৃত্যুর বেদনা সে কল্পনাকে আরও জোরদার করেচে, পরলোকে প্রিয়জনবিয়োগব্যথার আশ্রয় খুঁজেচে। তা' ছাড়া, মানুষের অপূর্ণ আশা, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাও পরলোকে আশ্রয় ও পূর্ণতার প্রত্যাশী। কোনো কোনো ধর্মমতে যে বলে, আত্মা অনাদিকাল থেকে বার বার জন্মগ্রহণ ক'রে আস্‌চে—তাতেও নিছক অমরত্বের আকাঙ্ক্ষাই পরিস্ফুট। তবু সে আকাঙ্ক্ষার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। বিজ্ঞানের নামে যাঁরা পরলোকবাদ প্রচার করেন—তাঁরাও তাঁদের মতকে পরীক্ষিত সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি।

মানবতাবাদী তাই বল্‌চেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রথার আমূল পরিবর্তন দ্বারা যদি এমন করা যায় যে, প্রত্যেক মানুষ মোটামুটি সার্থক তৃপ্ত জীবনযাপন করতে পারে; যদি সমাজে প্রকৃত সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার ফলে মানুষকে আর আত্মসর্বস্ব ও ইহলোকাতীত জীবনের আকাঙ্ক্ষী না হ'তে হয়; যদি চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে মানুষ দীর্ঘজীবন লাভ ক'রে,—তবে আর সে অলীক অমরত্বের আশা ক'রে মরবেনা। কারণ, সাধারণত দেখা যায় পূর্ণ ও পরিণত জীবনের অবসানে মানুষের কোনো আফশোষ থাকেনা। মৃত্যু অমঙ্গল নয়: একদিক দিয়ে মৃত্যুই জীবনের ধারক ও বাহক। মৃত্যুতেই জীবনের পুনরাবর্তন। মৃত্যু আছে ব'লেই জীবনে এত উদ্দীপনা, এত চাঞ্চল্য। জীবকোষ থেকে মানুষের

জন্ম—তারপর থেকে সে দুনিয়ার খেলা—বিশ্বের প্রাণপ্রবাহের সে অঙ্গ। এমন কল্পনা অবশ্য করা চলে যে, বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে পারবে। কিন্তু তা' যদি না-ও পারে তবু যতদিন বেঁচে আছি তার মধ্যেও যদি আমরা জীবনের কদর বুঝি এবং বাঁচার মতো বাঁচতে পারি, তবে জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি যে মৃত্যু, তাকেও স্বীকার করতে পারবো। মৃত্যুতে ভয়ের কারণ নেই: ভয় করি ব'লেই মৃত্যুকে ভয়াবহ মনে হয়। মৃত্যুর পর যদি অস্তিত্ব না থাকে—তবে স্বর্গ নেই, নরক নেই: পুরস্কার বা শাস্তি কোনো কিছুরই প্রশ্ন নেই। মোদ্দা কথা এই যে, যে মৃত সে মৃত: সে যে মৃত এমন কোনো চেতনাও তার নেই: ভালোমন্দ, সুখদুঃখ কিছুই তাকে স্পর্শ করছেনা। অতএব যে মুহূর্তে মানুষ মৃত সে মুহূর্তেই সে মৃত্যুকে জয় করলো: বেঁচে থাকতে মৃত্যুকে সে যে বিভীষিকা রূপে দেখতো তাকে অতিক্রম ক'রে গেলো। এই যদি মানুষ উপলব্ধি করে তবে আর অমরত্বের পিছনে ছুটবেনা—এই জীবনকেই একমাত্র সত্য জেনে একে পূর্ণ ও সার্থক ক'রে তুলবে। যদি কেউ বলেন যে অমরত্বের আশা না থাকলে মানুষ এ' জীবনকে সত্য ব'লে গ্রহণ করবেনা, তবে বলতে হবে, সে মানুষ যে কোনো কারণে হোক্ একান্তরূপে আত্মনিবদ্ধ,—নিজের দেশ, নিজের কাজ, নিজের সন্তানসন্ততির জন্যে বেঁচে থাকার মূল্য উপলব্ধি করতে অসমর্থ। কোনো কোনো সময়ে প্রিয়জনবিয়োগে মানুষ এ' জীবন অযথার্থ জ্ঞান করে; কিন্তু মানবতাবাদীর মত এই যে, তখন যদি সে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত ক'রে নিখিল সংসারের সঙ্গে নিজের মনকে গেঁথে নিতে পারে, তবে আর তার জীবন অযথার্থ থাকবেনা। পূর্বগামীদের অবদান সম্বল করে পৃথিবীর জীবনপ্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক মানব-ধর্ম। অমরত্বের প্রতিশ্রুতি না পেলে পর মানুষ জীবনকে যথার্থ জ্ঞান করবেনা—এ' কথা বললে মানুষের মানবসত্তার অপমান করা হয়। পরবর্তীদের জীবনে নিজ অবদান রেখে যাওয়া, অনন্ত জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে ভেসে যাওয়াই যথার্থ অমরত্ব।

এই পৃথিবীতে মানুষের নিজের ভাগ্য নিজে গ'ড়ে তোলার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে। প্রকৃতির দিক থেকে তার পথে কোনো বাধা আসছে না, নিয়তির বাঁধনেও সে বাঁধা নয়। যা কিছু বাধা আছে তা' তার নিজেরই হাতে গড়া। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, অনধিক ছয় হাজার বছরের মধ্যেই সে অসাধ্যসাধন করেছে, প্রকৃতিকে জয় করবার পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে।

বর্তমান যুগে সে কৃত্রিম গ্রহ সৃষ্টি ক'রে সৌরমণ্ডল পরিক্রমা করতে পাঠাচ্ছে, চন্দ্রলোকের নাগাল পেয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। যুদ্ধবিগ্রহ, রোগ, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা সত্ত্বেও তার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। রোগ জয় ক'রে সে আয়ু পূর্বাপেক্ষা দীর্ঘায়িত করেছে, স্বাস্থ্যোন্নতি ও শিক্ষাবিস্তার দ্বারা জীবনকে বহুরূপে উন্নত করার শক্তি এখন তার অধিগত রয়েছে। এই মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মানসিক শক্তির অধিকারী মানুষের উদ্ভবও বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার অন্তর্ভুক্ত। যারা বলেন এই বিশ্বপ্রকৃতি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে তাঁরা ভুলে যান, সে ধ্বংসের সম্ভাবনা নিবারিত করার মতো শক্তি অর্জন করাও মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয়; চারশত বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে সে যা' সম্ভব করেছে তা ভাবলে—চার হাজার, চার লক্ষ, চার কোটি বৎসরে সে কী করতে পারবে তা' অনুমান করাও অসম্ভব। তা' ছাড়া বিশ্ব ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে, এ'মত এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়। অন্যান্য গ্রহে মানুষের মতো বা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব আছে বা না আছে তা'ও এখনও জানা যায়নি। থাকলেও তাদের সঙ্গে যোগপ্রতিষ্ঠার আশাও এখন আর কল্পনামাত্র নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, মানুষের জয়যাত্রার সীমা নেই: মহত্তর জীবন গ'ড়ে তোলার জন্য ব্যক্তিমানুষেরও আত্মবিস্তারের অবাধ অবকাশ রয়েছে; তার জন্য মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকল্পনার অপেক্ষা রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। এই পৃথিবীর প্রাচুর্যের ও সৌন্দর্যের সে অংশীদার; সভ্যতাকে এগিয়ে দেওয়াতে, সকল মানুষের জীবন সমৃদ্ধ ও আনন্দময় ক'রে তোলাতে আছে তার নিশ্চিত ভূমিকা। মহত্তর. উন্নততর মানুষের আবির্ভাবের সে অগ্রদূত।

তবু সে বিশ্বের মধ্যমণি নয়।—একদা এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, পৃথিবী ঘিরেই সূর্য ঘুরছে, মানুষই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব এবং তার উপর রয়েছেন তার ভাগ্য-বিধাতা ভগবান। তারপর জানা গেলো, পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে, তেমনি ঘুরছে অসংখ্য গ্রহউপগ্রহ: প্রকৃতি আপন নিয়মে বাধা—সে নিয়মে আবর্তিত, বিবর্তিত: মানুষের কল্পনা যতই বিস্তৃত করা যাক্, এই বিশ্বপ্রকৃতির লীলাকে তা' দিয়ে আয়ত্ত করা যাবে না: ভগবান যদিবা থাকেন তবে তিনিও প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা: মানুষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ কর্‌বার কমিশন 'নিয়ে তাঁর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়: বস্তুত বিধিবিধানে বাঁধা এই বিশাল বিশ্বে তার কোনো স্থানই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। "ঈশ্বরেচ্ছায় হবে" "ভগবানের ইচ্ছা, তাই এমন হয়েছে"-মানুষ সাধারণত এ'রকম ভেবে ও ব'লে থাকে; কিন্তু এ'তে বিশ্বের

প্রতিটি প্রাণসত্তার, প্রতিটি খুঁটিনাটির নিয়ন্তারূপে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা প্রকাশ পায়, তা' এতই অসম্ভব, এমনই ধারণাতীত যে, তা' থেকেই পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাচ্চে যে, এই বিশ্বের নিয়ামক কে, কোন্ শক্তি—তা' জানবার আগ্রহ ও অক্ষমতা থেকেই ঈশ্বরকে কল্পনা করা হয়েছিল: সৃষ্টিরহস্যের বিরাট এক্স (X) রূপেই তার আবির্ভাব ঘটেছিল। তারপর ধীরে ধীরে সেই শক্তি বিশ্বপ্রকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেচে, প্রাকৃতিক বিধিবিধানে প্রকাশ পেয়েচে এবং আপনি তাতে বাঁধা ব'লে জানান্ দিয়েচে। "আপনি প্রভু সৃষ্টিবাধন প'রে বাঁধা সবার কাছে": "এক্স" আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েচে। কাজেই এ সৃষ্টির অভ্যন্তরে মন বা কোনো নিগূঢ় অভিপ্রায়ের অস্তিত্ব নিহিত আছে ব'লে মনে করার কারণ নেই। বাস্তবিক বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের মঙ্গলামঙ্গল, মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে নিতান্তই নিরপেক্ষ, নির্বিকার। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মানবজাতির এমন কিছু গুরুত্ব নেই যার দরুণ মানুষের জন্যে অমরত্বের ব্যবস্থা করা দরকার হতে পারে। এমন কি, ভগবান ব'লে যদি কেউ থাকেনও তবে তিনি মানুষেব চেয়ে উন্নততর একটা জাতি তৈয়েরও করতে পারেন—বিশেষ ক'রে প্রতিটি মানুষের আত্মা বাঁচিয়ে রাখার, তার খবরদারী করার কোনো প্রয়োজন তাঁর থাকতে পারেনা। ধর্মে ভগবানকে একেবারে স্বয়ম্ভুরূপে কল্পনা করা হয়েচে; কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছর ধ'রে এই বিশ্বপ্রকৃতির এবং তাতে জীবের যে বিবর্তন ও মনের বিকাশ ঘটেচে সে সম্বন্ধে জানা গেছে যে, সৃষ্টির মূলে ও আদিতে শুধু বস্তুই ছিল এবং তারই ভিত্তি থেকে মনের উদ্ভব ঘটেচে। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা যেরূপে কল্পনা করি তাতে তাঁর বস্তুবাদী ভিত্তি কোনো ভাবেই খুঁজে পাওয়া যায়না। অচেতন বস্তু থেকে প্রাণের উৎপত্তি ঠিক কিভাবে হয়েচে তার সম্পূর্ণ সূত্র অবশ্য এখনও জানা যায়নি এবং কেউ কেউ আর কিছু না পেয়ে এতেই ভগবানের অস্তিত্ব দেখতে পান্। কিন্তু সে সূত্রেরও সঠিক আভাস পাওয়া গেছে এবং তার প্রকৃতরূপ উদ্‌ঘাটিত হ'তে বিলম্ব নেই। বস্তুত বিশ্বপ্রকৃতি এবং প্রাণ ও মনের বিবর্তন সম্বন্ধে যা' জানা গেছে তাতে ভগবানকে কল্পনা করতে হ'লে বিবর্তনের পরিণতিরূপেই কল্পনা করা উচিত: বিবর্তনের উদ্গাতা ও নিয়ন্ত্রাতারূপে কল্পনা করার কোনো অবকাশ নেই।

আধুনিক বিজ্ঞানে আমরা দেখতে পাই, বস্তুর কণাটুকুর মধ্যে পর্যন্ত রয়েচে দুর্দম সদা-সক্রিয় শক্তি—ইংরেজীতে যাকে বলে এনার্জী। যাকে বলে মলিকিউল

(যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ ও মৌলিক পদার্থের একাধিক পরমাণু সমষ্টি) তাই বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছে: তাইতেই সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব ও জীবন নির্ধারিত হচ্ছে। মলিকিউল বিশেষ ধরণের অণুরই সমষ্টি এবং অণু প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত—তার মধ্যে ইলেকট্রনের পরিক্রমা চলছে। আণবিক বোমার আবিষ্কার যখন হলো তখন মানুষ জানতে পারলো অণুর মধ্যে কী অভাবনীয় প্রচণ্ড শক্তি নিহিত ছিল। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের রহস্য চকিতে তার চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হলো। আইনষ্টাইন যখন আবিষ্কার করেছিলেন যে স্থায়ী স্থান বা কাল ব'লে কিছু নেই—বাস্তব ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণেই স্থান-কালের অস্তিত্ব ও সার্থকতা: কাল ঘটনার পৌর্বাপর্য ছাড়া কিছু নয়—অর্থাৎ তা' শুধু পরিবর্তনের দ্যোতক: বিশ্বে কালের বিবর্তন হচ্ছে; কালে বিশ্বের বিবর্তন নয়—তখনই আমরা জানি যে এই বিশ্ব মূলত চালিত হচ্ছে বস্তু থেকে উৎসারিত শক্তিদ্বারা। এহেন বস্তু থেকে প্রাণ ও তা' থেকে মানুষের উদ্ভব হওয়া কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। বস্তু—তথা শক্তির আকার—ইংরেজীতে যাকে ব'লে ফর্‌ম্‌, তার পরিবর্তন হ'তে পারে এবং সর্বদাই হচ্ছে; কিন্তু তার লয় নেই।

তাই যদি হয় তবে সৃষ্টিকর্তারূপে ভগবান কল্পনা ক'রে নেওয়ারও অর্থ নেই। সৃষ্টিকর্তা ব'লে কেউ আছেন বললে পর এ প্রশ্ন উত্থাপন করা অন্যায় হবেনা—তাঁকে কে সৃষ্টি করেছিল। উত্তরে হয়তো বলা হবে তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি—তিনি অনাদি অনন্তকাল ধ'রে বিরাজমান। কিন্তু বস্তুবাদী যে বলছে বস্তুও অনাদি-অনন্তকাল ধ'রে আছে ও বিবর্তিত হচ্ছে, তাতে ভুল কোথায়? এ' কথার জবাব কেউ দিতে পারে না—শুধু বলে, "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।" যাঁরা বলেন যে ভগবান সৃষ্টিকর্তা নন, কিন্তু সৃষ্টি কী রূপ নেবে তা' তিনি নির্দেশ করেছেন, অথবা বলেন যে ভগবান প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের কর্তা, তাঁরাও বলতে পারেননি স্বয়ংক্রিয় বস্তুর মধ্যে বাহ্য একটা শক্তি কল্পনা ক'রে নেবার কী প্রয়োজন। জগৎ ও জীবনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মধ্যে যেখানে ফাঁক ছিল বা এখনও আছে, সেখানেই ভগবানের অবস্থান আরোপ করা হয়েছে বা এখনও হচ্ছে; কিন্তু সে ফাঁকও অচিরেই বুঁজে যাচ্ছে। এই জন্যই বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ আইনষ্টাইন বলেছিলেন,—"মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা যখন অপরিণত ছিল তখন সে নিজ কল্পনাদ্বারা বহু দেবদেবী সৃষ্টি করেছিল: ভেবেছিল এই দেবদেবীরাই বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করছে। কালক্রমে সেই দেবদেবীরাই ভগবানবিশেষে রূপ নিয়েছে; কিন্তু মানুষ ক্রমেই বুঝছে

যে, ঘটনাচক্র যে নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হচ্চে তাতে তার স্বতন্ত্র কোনো কার্যকারণ কল্পনার অবকাশ নেই।" মানুষের সাধারণ চিন্তাধারায়ও যে বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রভাব পড়েচে তার প্রমাণ এই যে—এখন বলা হয় যে, যে লোক নিজের উপর নির্ভর করে, ঈশ্বর তার সহায়—অর্থাৎ ঈশ্বরকে এখন আর সর্বনিয়ন্তা বলা হচ্চে না। ঈশ্বর মানুষেরই অধ্যাত্ম উন্নতি ও অধ্যাত্ম মূল্যমানের প্রতীক। মানুষই তাঁকে সৃষ্টি করেচে, নির্মম দণ্ডদাতা থেকে দয়ালু ভগবানের বিবর্তনও মানুষের চিন্তাতেই ঘটেচে। এরকম চিন্তা মানুষকে উন্নত করে, কিন্তু মানুষের মনেই এর উদ্ভব: তার বাইরে এর কোনো সত্যতা নেই। এ যদি বৈজ্ঞানিক সত্যের স্থান অধিকার করতে চায়, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি কল্পনা ক'রে মানুষকে তার অধীন রাখতে চায়, মানবতাবাদী তবে তাকে অগ্রাহ্য করবে। দর্শনের ক্ষেত্রে এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আমরা পূর্বে আলোচনা করেচি।

ভগবান নেই কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি আছে: আছে এই পৃথিবী, আছে এই জীবন,—আমাদের পরেও যে পার্থিব জীবনপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে—সেই নিশ্চিত জ্ঞান ও উপলব্ধি। এই প্রকৃতি আমাদের সম্পর্কে নিরপেক্ষ, নির্বিকার: কিন্তু এর শক্তি আমাদের কাজে লাগচে—এমন কি, এর যে প্রচণ্ড, নির্মম রূপ মাঝে মাঝে দেখা দেয়, তা'ও আমরা কতকটা জয় করতে পেরেচি। মানুষের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা যদি ও যখন শিথিল হয়, তখনই আমরা বিশ্বপ্রকৃতিতে আশ্রয় চাই, ও পাই ব'লে অনুভব করি। তবে পৃথিবীতে যে এত অমঙ্গল রয়েচে, প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা তার কী প্রতিকার পাই? প্রতিকার মানুষেরই হাতে: অমঙ্গলের কারণ দূর করার প্রেরণাতে। ধর্মে অমঙ্গলকে পূর্বজন্মের পাপের ফল বা ইহজন্মের পাপের শাস্তি ব'লে বলা হয়—এমন কি, কোনো কোনো ধর্মে বলা হয়েচে, মানুষ আদিতেই পাপ করেছিল এবং সে পাপের ভার সে চিরদিন ব'য়ে চলেচে। মানবতাবাদী সিদ্ধান্তে মানুষ সে পাপের ভার থেকে মুক্তি পেলো—এমন কি কোনো কোনো অধ্যাত্মবাদী যে ব'লে থাকেন অমঙ্গলের মাধ্যমে ভগবান মানুষকে পরীক্ষা ক'রে নেন্—সে পরীক্ষা দেবার দায় থেকেও মানুষের অব্যাহতি ঘটলো। অমঙ্গল মানুষের বাঁচার পরিপন্থী: মানুষকে তা' জয় করতে হবে। দৈহিক ব্যথা বেদনাও তার স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রতিকূল; তা' থেকে সে নিজের স্বাস্থ্যসম্পর্কে সতর্ক হবে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। সেই সঙ্গে মানুষের মন তার মস্তিষ্কের মাধ্যমে ক্রিয়াশীল হবে এবং সে নিজের

চিন্তাশক্তির উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করতে পারবে। কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক বলেন যে, চিন্তা থেকে উদ্ভূত আইডিয়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে—এমন কি, বৈদ্যুতিক প্রবাহও রয়েচে। সে কথা ছেড়ে দিলেও এ' সত্য যে, আইডিয়ারই মাধ্যমে মানুষ অপরের সঙ্গে আদানপ্রদান করে—এমন কি বিশ্বপ্রকৃতিকে বুঝতে ও প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। বুদ্ধিউৎসারিত যুক্তি-ভিত্তিক চিন্তার স্থান স্বতোই এত উঁচু যে অধ্যাত্মবাদীরাও তাকে অস্বীকার করতে পারেননি ঃ তাঁরা এক বিশ্বব্যাপী মন বা বুদ্ধিসত্তা কল্পনা ক'রে নিয়েচেন—বল্চেন যে, সে রকম সত্তা রয়েচে জানলে পর, আমরা এই বিশ্বের সূক্ষ্ম গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো। ভগবান বা তার বদলে নেহাৎ এক সার্বভৌম বুদ্ধিসত্তা তাঁরা যে কল্পনা করেচেন, তার কারণ এই যে, তাঁরা চান এমন একটা কিছু যাকে তাঁরা শাশ্বত ব'লে মেনে নিয়ে, তার উপর নির্ভর করতে পারেন। কিন্তু কল্পনা করলেই তো তা' সত্য হবেনা। জীবনের ধর্মই পরিবর্তন—পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিবর্তন ; এ' কথা শুধু আজকের বস্তুবাদী বলচেন এমন নয় ঃ প্রাচীন কালের গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস থেকে শুরু ক'রে অনেকেই ব'লে গেছেন। অধ্যাত্মবাদীরা এ' বিশ্বকে এক ও অবিভাজ্য ব'লে মনে করে এবং ভগবান বা তেমনি কোনো এক সার্বভৌম সত্তা একে নিয়ন্ত্রণ করচে—এ' কথা ব'লে, যা' কিছু ঘটচে সে সবই ঘটনা পরম্পরায় পূর্বনির্দিষ্ট রয়েচে ব'লে বল্‌তে চায়। কিন্তু বিজ্ঞান-ভিত্তিক মানবতাবাদের সিদ্ধান্ত এই যে, বিশ্বপ্রকৃতির অভ্যন্তরে যদিও অসংখ্য জটিল সম্বন্ধাদি বর্তমান, তবুও অনেক ব্যাপারে সংযোগবিয়োগে ঘটনা নিজস্ব গতি নিতে পারে এবং তা'তে মানুষ চলার স্বাধীনতা লাভ করে। বিশেষ ক'রে নিজ চিন্তাদ্বারাই সে নিজের কার্যক্রম স্থির করতে পারে। তা' যে করতে পারে তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই ; কিন্তু অধ্যাত্মবাদীরা বলেন যে, মানুষের স্বাধীনতা নিজের ইচ্ছা ও স্বভাবানুযায়ী কাজ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ, এবং সে ইচ্ছা ও স্বভাবও বাইরের কার্যকারণে নিয়ন্ত্রিত। মানবতা-বাদী বল্‌চেন, কোনো কিছুই শুধু পূর্বকারণ দ্বারা নির্ধারিত হচ্চেনা—তা' নিজে কিভাবে ক্রিয়াশীল তা' দ্বারাই তার সত্তা নিরূপিত হচ্চে। কার্যকারণ বা পৌর্বাপর্য দ্বারাই যে কিছু নিরূপিত হচ্চেনা তার একটা কারণ এই যে, শুধু অতীত থেকেই বর্তমানের উদ্ভব হয়না—বর্তমানেরও নিজস্ব ক্রিয়া রয়েচে। বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছুর যেমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েচে, তেমনি মানুষেরও

কর্মের ও চিন্তার স্বাধীনতা আছে। এই বিশ্বের মাঝে সে একা দাঁড়ায়ে, বিশ্বপ্রকৃতি তার অপেক্ষায় বসে' নেইঃ তবু সে প্রকৃতিকে জয় ক'রে নিজ ভবিষ্যৎ রচনার প্রয়াসী।

সেই প্রকৃতিতে তার আশ্রয়, তার আনন্দ। মানবতাবাদী চাইচে সেই আনন্দকে একান্ত ক'রে পেতে, সে আশ্রয়কে সত্য ও সম্পূর্ণ ব'লে উপলব্ধি করতে—এম্‌নি উপলব্ধি যে, প্রকৃতির ভয়াল রূপের সঙ্গে পরিচয়ও তাকে শিথিল তো করবেই না, বরং এই মাটির পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগের অনুভূতিকে আরও সত্য ক'রে তুল্‌বে। কবি, সাহিত্যিক, সাধুসন্তগণ প্রকৃতির এই রূপেরই বন্দনা করেচেন। তবু এ' অনুভূতি মানুষের সম্পূর্ণ সহজাত, এ' কথা বল্‌লে ভুল বলা হবে। ধর্মে আমরা প্রকৃতির যে চিত্র পাই তাতে ভগবানেরই একাধারে দয়াল ও ভয়াল প্রকাশ ঘটচে এবং সে প্রকাশেই প্রকৃতির একমাত্র সার্থকতা। তবে কোনো কোনো ধর্মে প্রকৃতি নিজ গুণেই স্বর্গীয় সৌন্দর্যের অধিকারী ব'লে বর্ণিত হয়েচে—শুধু ভগবানের প্রকাশ হিসেবে নয়। প্রাচ্যদেশে লোকেরা ধর্মতত্ত্বের সন্ধানে গিরিঅরণ্যে যায়; কিন্তু প্রতীচ্যে গিরিঅরণ্য অপদেবতার আবাসস্থল ব'লে কল্পিত হয়েচে। বিশেষ ক'রে খৃষ্টধর্মে এই কল্পনাই মুখ্য যে, প্রকৃতি প্রথমে সুন্দর ও মঙ্গলের আধার ছিল, পরে মানুষের পাপের দরুণ খারাপ হয়ে গিয়েচে। ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি অমঙ্গলজনক দুর্ঘটনার ব্যাখ্যা জানা ছিল না এবং সে সকলের যথাসাধ্য প্রতিকারের বৈজ্ঞানিক উপায় তখনও আবিষ্কৃত হয়নি ব'লেই বোধ হয় প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে বাধা ঘটতোঃ বনজঙ্গল কেটে বাসস্থান তৈয়ের, বন্য জন্তু হ'তে আত্মরক্ষা করতে হ'তো ব'লেও প্রকৃতির নিগূঢ় সৌন্দর্য মানুষের চোখে পড়তো না। ভ্রমণের কষ্টও প্রকৃতির পরিচয় লাভে বাধাস্বরূপ ছিল। এখন সে সব বাধা অনেক স্থলে দূর হয়েচেঃ কিন্তু সেই সঙ্গে যন্ত্রশিল্পের প্রসার ইত্যাদির দরুণ আমরা অনেকে শহরবাসী হয়েচি, জীবনে তাড়াহুড়ো বেড়েচে এবং প্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখবার দৃষ্টিও যেন হারিয়ে ফেলেচি। বহু পল্লীবাসীর রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গিও শহরবাসীর মতো হ'য়ে গেছে। কল্পনার মাধ্যমে বিশ্বজগৎ ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের যে ধারণা ছিল, তাও এখন বদলে গেছেঃ ধারণা এখন অনেকটা বাস্তবানুসারী হয়েচে। তার ফলে কাল-ক্রমে তার মনোপ্রকৃতিতে কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটবে কি না তা' স্বতন্ত্র প্রশ্ন। এই বিশ্বের দিকে চেয়ে সে আগে যেমন অবাক বিস্ময় অনুভব করতো,

এখন আর তা' ক'রে না : তবু এর অনাবিষ্কৃত রহস্য ক্রমেই তাকে আকর্ষণ ক'রে চলেচে। বিজ্ঞান আমাদের চোখের সামনে যে মহাজাগতিক রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেচে তাতে আমরা এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করতে পারচি। এই আত্মীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে জীবনের উপলব্ধি সমগ্র ক'রে তোলাই মানবতাবাদীর অভিপ্রায়। অতিপ্রাকৃতিক কোন সত্তাকে সে স্বীকার করে না : কিন্তু যে মহাপ্রাকৃতিক মহাজগৎ তার সামনে প্রকাশ পেয়েচে ও ক্রমেই তার অধিগম্য হচ্চে, তাতে আত্মবিস্তার ক'রে নিজেরও মহাজাগতিক অস্তিত্ব অনুভব করে। কিন্তু তাতেও সে মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না, কবিসুলভ স্বাধীনতা নিয়ে বল্গাহা'র' পামাস্তের সৃষ্টি করে না। তবু তার চেয়ে সত্য ও ও মহান কিছু আছে ব'লে স্বীকার করতে সে অপারগ। জীবজগতের সঙ্গে সে আত্মীয়তা অনুভব করে : কারণ, জীব থেকে বিবর্তনের ইতিহাস সে জানে। ধূলির ধরণী তার আত্মীয়, আবার মহাপ্রাকৃতিক জগতে তার অধিষ্ঠান।

এ' থেকেই বোঝা যাবে, বুদ্ধিঅনুসারী জ্ঞানই মানবতাবাদের প্রাণ : মুক্ত-বুদ্ধিই তার একমাত্র অবলম্বন। যে দিব্যজ্ঞানকে আশ্রয় ক'রে বহু ধর্মের বনিয়াদ রচিত হয়েচে, ধর্মীয় বা অন্যবিধ অনুশাসনের উপর যে জ্ঞান নির্ভর ক'রে আছে, মানুষের ধ্যানধারণা ও স্বতোস্ফূর্ত উপলব্ধি (অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে ইনটুইশন) যে জ্ঞানের উৎস, বা কতগুলো ধারণা কল্পনা আগে থেকে সত্য ব'লে ধ'রে নিয়ে বিচার ও সিদ্ধান্ত দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়—মানবতাবাদী এ সব কিছুই নির্বিচারে গ্রহণ করতে পারে না ; বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা দ্বারা লব্ধ সত্যই তার একমাত্র সম্বল। এ' কথা অবশ্য সত্য যে, যে সকল ধর্মবাণী ভগবানকথিত ব'লে দাবী করা হয়, সে সবও ঋষিমনীষিদের ধ্যানধারণায়ই ধরা দিয়েছিল এবং সাধুসন্তদের সাধনালব্ধ জ্ঞানই সব সময়ে জনসমাজে প্রচারিত হয়েচে। বহুক্ষেত্রে তার মধ্যে সত্যের পরিচয় শাশ্বত হ'য়ে রয়েচে। কিন্তু তার মধ্যে যা কিছু বিজ্ঞানের অর্থাৎ বাস্তব ব'লে বিদিত জ্ঞানের বিরোধী, মানবতাবাদী তা' গ্রহণ করতে অপারগ। প্রামাণ্য ব'লে পরিচিত যে জ্ঞান তা' যে শুধু ধর্মীয় হ'বে এমন কোনো কথা নেই : রাজনৈতিক বা সামাজিক কর্তৃত্বের উপরও তা' নির্ভরশীল হ'তে পারে—এমন কি, যে সময়ে যে বৈজ্ঞানিক সত্য জানা যায় তাকেই তখন প্রামাণ্য জ্ঞান ক'রে চল্‌তে হয়, কিন্তু পরে পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে তা' অসত্য বা আংশিক সত্য ব'লে জানা গেলে তাকে সে অনুসারে বর্জন করা ছাড়া উপায় থাকে না। স্বতোস্ফূর্ত উপলব্ধি

বা ইনটুইশনকে ভারতে জ্ঞানের প্রধান উৎস ব'লে মনে করা হ'তো—এখনও অনেকটা হয়ে থাকে, এবং এ' কথাও ঠিক যে, ইনটুইশন বলতে যদি আমরা বুঝি জ্ঞানের সুসমঞ্জস প্রভাবের সঙ্গে গভীরভাবে নিহিত চিন্তার সমন্বয়, তবে তার দ্বারা চকিতে সত্যোপলব্ধি অসম্ভব নয়; কিন্তু সে সত্যকেও বুদ্ধির কষ্টিপাথরে পরখ ক'রে না নেওয়া বিপজ্জনক। পূর্বলব্ধ জ্ঞান ভিত্তি ক'রে যে ধারণা কল্পনার উদ্ভব—তাকে সত্য ব'লে ধ'রে নিয়ে বিচার ও সিদ্ধান্ত করা দার্শনিক প্রথাসম্মত বটে এবং জগতের বহু দার্শনিক সত্যসন্ধানে এ' প্রথাকেই আশ্রয় করেছেন। তবু সে সত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয়সাধনের অপেক্ষা রাখে। এ' জন্যেই বলা যায় যে, দিব্য জ্ঞান, প্রামাণ্য জ্ঞান, স্বতস্ফূর্ত জ্ঞান ও পূর্বধারণা-ভিত্তিক বিচারোর্জিত জ্ঞান যদিও ফেলনা নয়, তবু এ' সবকে অতিক্রম ক'রে বৈজ্ঞানিক সন্ধানই মানবতাবাদীর একমাত্র লক্ষ্য। বৈজ্ঞানিক সন্ধানেরও সুনির্দিষ্ট, সুসমঞ্জস কার্যক্রম রয়েচে। হাতেকলমে পরীক্ষা দ্বারা সত্য নির্ধারণের অবকাশও তা'তে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালেই এসেচে। এক ধরণের ঘটনা থেকে একই রকম ফল হয় এবং তাকে বলে প্রাকৃতিক সমরূপতা—ইউনিফর্মিটি অফ নেচার। বৈজ্ঞানিক সত্যসন্ধান বহুলাংশে তারই উপর নির্ভরশীল। কার্যকারণ সম্বন্ধবিচার অবশ্য বিজ্ঞানে প্রধান স্থান অধিকার ক'রে রয়েচে। বৈজ্ঞানিক সত্য বহু পরীক্ষা—বহু বিচারসাপেক্ষ ব'লেই স্বতস্ফূর্ত জ্ঞানের মতো তাকে চট ক'রে পাওয়া যায়না। সত্য বিচারের আরেক মানদণ্ড এই যে, যাকে সত্য ব'লে ধারণা করি, তা'থেকে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় কিনা। পারস্পরিক ও আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য বিনা অবশ্য কোনো সত্যসমষ্টিই বিজ্ঞানসম্মত ব'লে পরিগণিত হবে না। বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি অবশ্য শুধু প্রাকৃত বিজ্ঞানেই আবদ্ধ নয়—সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, অন্তর্জাতীয় সম্বন্ধ, সব কিছুই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক এবং বলা বাহুল্য তা' সহজে সম্ভব নয়। এ' কথাও মনে রাখা দরকার যে, বিজ্ঞানলব্ধ সত্যের সঙ্গে পাপপুণ্য ভালোমন্দ বিচারের কোনো সম্পর্ক নেই: ভালো ও মন্দ সব উদ্দেশ্যেই তাকে ব্যবহার করা যায়, এবং তা যে যায় বর্তমান জগতে তাই এক বিষম সমস্যারূপে দেখা দিয়েচে। সে জন্যই বলা হয়েচে, বৈজ্ঞানিক সত্যকে মানবিকতা সহকারে প্রয়োগ করা চাই এবং সত্যিকার গণতন্ত্রই বৈজ্ঞানিকসত্য সন্ধান ও প্রয়োগের একমাত্র বুনিয়াদ। তার অভাবে বিজ্ঞানের ও বৈজ্ঞানিকের যে বিপদ ও লাঞ্ছনা ঘটে, জগতের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

কিন্তু মানবতাবাদে মানবিকতারও নিজস্ব সংজ্ঞা রয়েচে। ভালোমন্দ পাপপুণ্য সেখানে কোনো অতি প্রাকৃতিক শক্তির দোহাই দিয়ে নির্ধারিত হয়না : মানুষ যাতে প্রকৃত আনন্দ অনুভব করে, তাই তার পক্ষে ভালো ব'লে পরিগণিত হয়। দুঃখকে বিধিলিপি মনে করার, পূর্বজন্মের পাপের ফল ব'লে মেনে নেবার বা পরজন্মে তার সান্ত্বনা মিলবে ব'লে আশা করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। মানবতাবাদী জানে যে শুদ্ধ আনন্দের মধ্যে সংযমের প্রয়োজন আছে, ভালোমন্দ ফলাফল বিচার ক'রেই নীতিনির্ধারণ করতে হবে এবং তার মানও সমসাময়িক প্রয়োজন ও পরিবেশ অনুসারে যুগে যুগে বদলাচ্চে। কাজেই সামাজিক পটভূমিতেই সে বিচার করতে হবে। লক্ষ্য যদি সৎ ও স্থির থাকে, তবে তাতে পৌঁছুবার জন্যে যে কোনো উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে কি না এ' প্রশ্ন ধর্মীয় নীতিশাস্ত্রেও গুরুত্ব লাভ করেচে : কী অবস্থায় বলপ্রয়োগ করা যেতে পারে বা মিথ্যাচার বা মিথ্যা কথা বলা সমর্থনযোগ্য— সে প্রশ্নও তার সঙ্গে জড়িত আছে। মানবতাবাদী মনে করে যে, উপায়কে লক্ষ্য থেকে আলাদা ক'রে দেখা যেতে পারে না—কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যে কোন্ উপায় অবলম্বনীয় তা' বিচার ক'রে স্থির করতে হবে : কাজেই লক্ষ্য ও উপায়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার ক'রেই জগৎ ও জীবনের ক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠা কর্তব্য। উদ্দেশ্য দিয়ে কাজের বিচারও তার অন্তর্গত। এখানেই এসে পড়ে কী নিগূঢ় প্রবৃত্তি থেকে মানুষ কাজ করে, সে প্রশ্ন। প্রচলিত নীতিবাদে বল্‌চে যে, মানুষ মূলত স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত হ'য়েই কাজ ক'রে থাকে। কিন্তু বহুসময়েই দেখা যায়, মানুষ পরার্থে কাজ, এমন কি আত্মদান পর্যন্ত করতে পারে। মানবতাবাদী এ' সমস্যার সমাধান করেচে এই ব'লে যে, মানুষ যা' কিছু করে তা' নিজের সত্তার প্রসারকল্পেই ক'রে থাকে, এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আত্মপ্রসারের মান নিরূপণের শিক্ষা বালকবালিকাদেরে শুরু হ'তেই দেওয়া উচিত। সে শিক্ষা সামাজিক মঙ্গলে ব্যক্তির আনন্দসন্ধানের শিক্ষা এবং সমাজ বল্‌তে সমগ্র মানবজাতিকেই বুঝতে হবে। কিন্তু সামাজিক মঙ্গলে নিজের মঙ্গলসাধনার দুঃখও অনেক আছে, প্রাণত্যাগও করতে হতে পারে। কাজেই এ' শিক্ষা পরোপকারবিলাসের শিক্ষা নয়। এ' দুঃখ সইবার উপায় পূর্বেকার কোনো কোনো জীবনদর্শনেও নির্ধারিত হয়েচে— যথা, প্রাচীনকালের গ্রীসের ষ্টোইক নামে পরিচিত দার্শনিকেরা জীবনের যে কোনো অবস্থায় মনের সাহস বজায় রাখবার নির্দেশ রেখে গেছেন ;

এপিকিউরাসপন্থীরা বল্‌তেন যে মানুষের যা' সাধ্যায়ত্ত তার আকাঙ্ক্ষাও তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে পর অনেক দুঃখের হাত থেকে বাঁচা যেতে পারে।

মানবতাবাদী চাইচে জীবনবিকাশের সুযোগসুবিধা এমনি ক'রে প্রত্যেক মানুষের আয়ত্তে এনে দিতে, যা'তে বহু দুঃখ বেদনা থেকে সে নিজেই পরিত্রাণ পেতে পারে। এখানেই আবার গণতন্ত্রের কথা ওঠে: সার্বিক, সর্বতোমুখী গণতন্ত্র: অন্তর্জাতীয়, জাতীয়, সামাজিক, পারিবারিক সব ক্ষেত্রে পূর্ণ গণতন্ত্র। পূর্বেকার অধ্যায় সমূহে আমরা দেখেচি যে আজও মানবজাতি সেই গণতন্ত্রেরই অভিযাত্রী। যাত্রা তার সহজ নয়: মানবতাবাদী উপলব্ধি, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, মানবতাবাদী সঙ্কল্প সে যাত্রায় মানুষের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। সেই অনুসারেই আন্তর্জাতিক জীবন থেকে শুরু ক'রে ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত গ'ড়ে তুলতে হবে এবং তাতে সুসংবদ্ধ পরিকল্পনার প্রভূত প্রয়োজন রয়েচে। জীবনকে পরিকল্পনার অধীন করলে পর মানুষের স্বাধীনতা তথা গণতন্ত্র ব্যাহত হয়, এ কথা যাঁরা বলেন তাঁদেরেও সমবায় নীতিতে পরিকল্পনা রচনা ও তা' কার্যকরী করার দায়িত্ব নিতে হবে এবং তা' নেওয়াই মানবতাবাদী উদ্যমের উপর নির্ভর ক'রে। তা' হ'লে দেখা যাচ্চে, জীবন ও জগতের মানবতাবাদী নিয়ন্ত্রণ ঘটাতে হ'লে যথেষ্ট সংখ্যক লোককে মানবতাবাদী অর্থাৎ অতি প্রাকৃতিকত্বমুক্ত মনুষ্যকেন্দ্রিক জীবন ও জগতে বিশ্বাসী হওয়া দরকার। অতএব সেই বিশ্বাসে সমসাময়িক নরনারীদেরে উদ্বুদ্ধ করা আজকের মানবতাবাদীর একমাত্র লক্ষ্য ও কর্তব্য।

মানবতাবাদীর পথ ও পথের শেষ

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলেছিলেন, "বেশী প্রশ্ন কোরোনা, গার্গী!" বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে সে কাহিনী বর্ণিত আছে। গার্গী জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, এ' পৃথিবী তো জলে ওতপ্রোত আছে। এখন দয়া ক'রে বলুন, জল কোথায় ওতপ্রোত থাকে?" যাজ্ঞবল্ক্য জবাব দিলেন, "বায়ুর উপর, ওগো গার্গী!"

এখন দয়া ক'রে বলুন, বায়ু কোথায় ওতপ্রোত থাকে?"

"অন্তরীক্ষলোকে, গার্গী!

"অন্তরীক্ষলোক কোথায় ওতপ্রোত থাকে?"

"গন্ধর্বলোকে, গার্গী!"

"গন্ধর্বলোক কোথায় ওতপ্রোত থাকে?"

"আদিত্যলোকে, গার্গী:'

"আদিত্যলোক কোথায় ওতপ্রোত থাকে?"

"চন্দ্রলোকে, গার্গী!"

"চন্দলোক কোথায় ওতপ্রোত থাকে?"

"নক্ষত্রলোকে, গার্গী!"

"নক্ষত্রলোক কোথায় ওতপ্রোত থাকে?"

"দেবলোকে, গার্গী!"

"দেবলোক কোথায় ওতপ্রোত থাকে?"

"ইন্দ্রলোকে, গার্গী!

"ইন্দ্রলোক কোথায় ওতপ্রোত থাকে?"

"প্রজাপতিলোকে, গার্গী!"

"প্রজাপতিলোক কোথায় ওতপ্রোত থাকে?"

"ব্রহ্মলোকে, গার্গী!"

"ব্রহ্মলোক কোথায় ওতপ্রোত থাকে?"

এবার যাজ্ঞবল্ক্য বললেন: "গার্গী! অতো বেশী প্রশ্ন কোরোনা; তাতে তোমার মুণ্ড খসে প'ড়বার ভয় আছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, তুমি এক ঐশ্বরিক সত্তা সম্বন্ধে অতিরিক্ত প্রশ্ন করচো। কিন্তু তার সম্বন্ধে আর প্রশ্ন করা চলে না। মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্ন কোরোনা, গার্গী।"

অতঃপর গার্গী বাচক্নবী চুপ করলেন।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে অন্তহীন প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছিলেন: কারণ, তিনি জানতেন যে, সব কথা জানা যায় না, সব প্রশ্নের উত্তর মেলে না। যত কথা জানা ছিল, যত প্রশ্নের জবাব মিলেছিল, তাদের মধ্যে এমন কিছু ছিলনা যা' যাজ্ঞবল্ক্যের জ্ঞানভাণ্ডারে জমা হয়নি। সে ভাণ্ডার ঠেকলো এসে চরম সত্যে: ব্রহ্মেই জগতের অধিষ্ঠান। সে ভাণ্ডারের সীমার বাইরে মহাঅজ্ঞেয় ছিল বিরাজমান: তাই যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে আর প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছিলেন।

মহাকালের পরিক্রমায় সে সীমা অতিক্রান্ত হলো। মানুষ প্রশ্ন ক'রলো: কারণ, যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে যে জ্ঞান দান করলেন তাও মানুষ প্রশ্ন ক'রেই পেয়েছিল। তখন যা অজ্ঞেয় ছিল পরে আর তা অজ্ঞেয় রইলো না: যাজ্ঞবল্ক্য যখন গার্গীকে আর প্রশ্ন ক'রতে বারণ করেছিলেন তখন যা' অজ্ঞেয় ছিল পরে আর তা' অজ্ঞেয় থাকেনি। মানুষ শুধু জ্ঞান লাভই করেনি—পদে পদে নিজ মর্ত্যসীমা চূর্ণ করেচে: এমন ক'রে করেচে যে, এখন আর তার কোনো সীমা আছে ব'লেই মনে হয় না। এ যুগে স্পুটনিক সৃষ্টি, চাঁদে রকেট প্রেরণ, চাঁদে ও মঙ্গলে যাবার সংকল্প প্রকাশই তার প্রমাণ।

কিন্তু প্রশ্ন শুধু বাইরে নয়: মানুষের নিজের নিকটও প্রশ্ন রয়েচে, আত্ম-জিজ্ঞাসাও কম নয়। শোনা যায়, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন প্রশ্ন তুলেছিলেন, চাঁদে রকেট প্রেরণ ইত্যাদি দ্বারা লাভ হবে কী? উত্তরে কেউ কেউ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েচেন, মাইকেল ফ্যারাডে কর্তৃক বিদ্যুৎ আবিষ্কার সম্বন্ধে সমসাময়িক লোকেরা, এমন কি ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী এই প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং উচিত জবাব পেয়েছিলেন। আজ সে প্রশ্নটাই একান্ত অবাস্তব মনে হবে। প্রকৃতি-জয়ের অভিযানে মানুষ যে পর্যায়ে এসে পৌছেচে, তাতে সে নিশ্চিত অনুভব করচে, তার এ' জয়ের সীমা নেই: নব নব জ্ঞানের সাহায্যে তার পলে পলে আত্মসৃষ্টির কোনো বাধা নেই।

তবু কেন মানুষ শান্তি পাচ্চে না, তবু কেন সে নিরন্তর আশ্রয় খুঁজে মরচে? বেদনাদগ্ধ দুর্বল মানুষ শক্তির জন্যে, সান্ত্বনার জন্যে ভগবানের পায়ে মাথা কুটে মরচে কেন? এর উত্তর এই যে মানবজাতি এগিয়ে চলচে এবং পদে পদে বিশ্বের মোকাবিলা করচে বটে; কিন্তু ব্যক্তিমানুষ তার সঙ্গে সমতালে চলতে পারেনি, সমগ্র মানবসমাজের সঙ্গে চলবার অনুভূতি তার দেহমনে সঞ্চারিত হয়নি। এখানেই সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির সমন্বয়সাধনের প্রশ্ন এসে পড়ে—যে প্রশ্ন আমরা এই

বইয়ের প্রথম অধ্যায়েই উত্থাপিত হ'তে দেখেছি। যে ব্যষ্টিমানুষ নিজেকে সর্বথা ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেনি, হতাশা বঞ্চনায় যে ক্ষুব্ধ, পীড়িত—এমন কি, নিজের ও পরিবার পরিজনের স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের উপকরণও যার সংগৃহীত হয়নি, তার পক্ষে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজাতির জানপয়চানে উদ্দীপ্ত হওয়া ও তাতেই নিজেকে তৃপ্ত ও কৃতার্থ বোধ করা কখনও সম্ভব নয়। এখানেই মনে হয়, এমন সমাজগঠন যদি সম্ভব হয় যাতে মানুষ তার দেহমন পূর্ণবিকশিত ক'রে তুলতে পারে, তবেই সে মানবতাবাদী চেতনায় উত্তীর্ণ হবে—অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে নিজের স্বরাট সত্তা উপলব্ধি করবে। তবেই সে নিজেকে আর দুর্বল, অসহায় মনে করবে না: কল্পিত অতিপ্রাকৃতিক শক্তির নিকট আশ্রয়প্রার্থী হবে না। কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি তা' নয়: ব্যক্তির মানবতাবাদী পূর্ণতা সমাজের উপর নির্ভর করছে, এ' সত্য নয়। সমাজ ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র, এবং ব্যক্তিমানুষ মানবতা-বাদী সত্তাতে উত্তীর্ণ হ'তে পারলে পর আপনা থেকেই তদুপযোগী সমাজ গঠন করবে। তা' যতক্ষণ না হচ্চে ততক্ষণ মানুষ সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে যেরূপ রাষ্ট্রস্থাপন করেচে তা' যদি ও যতটা সত্য হয় (অর্থাৎ সে উদ্দেশ্য পালন করতে পারে) ততই ব্যক্তিমানুষের অসহায়তা ও অনির্দেশ আশ্রয়প্রার্থনার প্রয়োজন কমবে। সমাজতন্ত্রে—এমনকি পুঁজিবাদী আওতায় বর্তমানে যে কল্যাণ রাষ্ট্রের অবতারণা হয়েচে, তাতে যদি মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুখীসম্পন্ন জীবন যাপনের ব্যবস্থা হয়, রোগশোক জয়ের যথাসম্ভব ব্যবস্থা যদি তাতে কার্যকরী থাকে, তবে আর মানুষ মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকবে না: তবে সে সজ্ঞানে মানবজাতির বিশ্বপরিচয়ের অংশীদার হ'তে পারবে। এ আলোচনা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে কিছুটা করেচি। কিন্তু এখানে সেই মহাজনকথিত সংশয় রয়েচে: বর্তমান সমাজ যে কায়েমী স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত তারাই মানুষের পূর্ণতালাভে বাধা দেবে, তারাই অতিপ্রাকৃতিক শক্তির প্রভুত্বকল্পনাকে জাইয়ে রাখ্‌বে, ধর্মকে অহিফেনরূপে ব্যবহার ক'রে মানুষের মনকে ঝিমিয়ে রাখবে। এমনধারা মত যাঁরা প্রকাশ করেচেন তাঁরা সবাই নাস্তিক বা কম্যুনিষ্ট বা সোশিয়ালিষ্টও নন্। ১৯৩০ সালে যখন বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা দেয় এবং ধনিকশ্রেষ্ঠ আমেরিকার লোকও ঘোর অর্থনৈতিক সংকটাপন্ন হয়, তখন সেখানকার অন্যতম প্রধান ধর্মযাজক সাধারণ মানুষের নিকট এই মর্মে বাণী প্রচার করেছিলেন যে, তারা যেন সব দুঃখকষ্ট এই জেনে সহ্য করে যে, ভগবানের নিকট একদিন সম্পূর্ণ সান্ত্বনা মিলবে। উপদেশটা এমনি বেখাপ্পা সময়ে এসেছিল যে, সাধারণ

ধর্মবিশ্বাসী বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ও এতে খানিকটা হকচকিয়ে গিছলেন। কায়েমী রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থের প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক তথা মানবতাবাদী সত্যকেও যে চেপে রাখার চেষ্টা হয় তার দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেচি। মানুষ যতোই সে সত্যের সাহায্যে এগিয়ে যেতে চেয়েচে ততোই সে সত্য চেপে রাখার চেষ্টা হয়েচে। সভ্যতার অগ্রগতিতে সে সত্যের আলোক এখন যদিও অনেকটা ছড়িয়ে পড়েচে, তবু নিছক বিশ্বাস ও সংস্কারের খুঁটিতে মানুষকে বেঁধে রাখার চেষ্টার আজও শেষ হয়নি। সে চেষ্টার পরাজয় শুধু মানুষের রাজনৈতিক—অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার জন্যে প্রয়োজন নয়, তার ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ স্ফুরণের জন্যে মানবতাবাদী কর্তব্যও বটে।

এখানে এ' প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে: মানবতাবাদী মানুষ, স্বরাট স্বপ্রবুদ্ধ মানুষ কী সমাজ রচনা করবে? মামুলিভাবে মনে হয় যে সমবায় ও সহযোগিতাই, হবে সে সমাজের ভিত্তি। কিন্তু যে মানুষ সম্পূর্ণরূপে নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী, কোনো দেবতাতেই যে বিশ্বাস বা নির্ভর করেনা, তার মনস্তত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মপ্রত্যয় দুর্মদ হবে। এবং অত্যধিকাংশ মানুষ সেরূপ মানসিকতার স্তরে উত্তীর্ণ হ'লে পর, অন্তর বাইরের সমগ্র পরিবেশই এম্‌নি বদ্‌লে যাবে যে, তখন তারা কেমনতরো রাষ্ট্র ও সমাজ রচনা করবে আজকের দৈবনির্ভরশীল ও পরমুখাপেক্ষী মনস্তত্ব দিয়ে তা' কল্পনা করাও সহজ নয়। মনে হয়, মার্ক্স যে রাষ্ট্র ক্ষ'য়ে যাবার কথা বলেছিলেন তা' হয়তোবা তখনই সম্ভব হবে। বাস্তবিক তখন মানুষ যে স্তরে উত্তীর্ণ হবে, তা' থেকে আজ সে যে স্তরে রয়েচে তার এমনই আকাশ-পাতাল তফাৎ যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও সিদ্ধান্ত থেকে মনকে দূরে রেখে নিজেকে শক্তিহীন প্রত্যয়হীন ক'রে রাখার যৌক্তিকতা কিছুই বোঝা যায়না। অথচ মানুষ দুর্জ্ঞেয় অদৃশ্য অমোঘ এক নিয়ন্তাতে যুক্তিহীন শুধু মাত্র বিশ্বাসের বশে নিজেকে তাই ক'রে রেখেচে। সে বিশ্বাসের খুঁটি ভেঙ্গে যেদিন সে বিশ্বের সমান সমান মুখোমুখী দাঁড়াবে, সেদিন সে নিজের সমাজ গঠন কীভাবে করবে তা' আজ কল্পনা করাও কঠিন। সমবায়িক ভিত্তিতে সে সমস্ত সমষ্টিগত কাজ পরিচালনা করবে, এ' অনুমান সহজেই করা যেতে পারে। কিন্তু সেদিনও কি পারস্পরিক অবিশ্বাস, ঈর্ষা ইত্যাদি কার্যকরী থাকবে? অথবা আত্মোদ্বুদ্ধ মানুষের অন্তর থেকে সে সব চকিতে ধুয়ে মুছে যাবে? মানুষের উপর ধর্মের, সমাজের নানারূপ

চাপ থেকেই সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস জাগে এ' বিষয়ে সন্দেহ নেই: কিন্তু সে চাপ যদি ও যখন থাকবেনা তখন কি আপনা থেকেই তার মন মুক্ত ও সমুন্নত হবে? কিন্তু মানুষ যেদিন মানবতাবাদে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে সেদিনও তার সমাজ থাকবে: তবে এ' আশা করা যায় যে, সে সমাজ হবে সম্পূর্ণ মুক্ত, মানুষের উপর তার বন্ধন হবে শুধু মুক্তির বন্ধন: কারণ, এ' টুকুও যদি না হয়' তবে মানবতাবাদের কোনো বৈপ্লবিক তাৎপর্য আছে ব'লে মনে করা যাবেনা। সম্পূর্ণ, সমগ্র সমবায়ই হবে তবে সে সমাজের ভিত্তি।

এ' কথা অবশ্য বহুদিন বহুজন বলেচেন যে, একমাত্র সমবায়েই মানুষের প্রকৃষ্ট সমাজগঠন ও ব্যক্তিসমন্বয় হ'তে পারে। কিন্তু সত্যিকার সমবায় কোথাও গ'ড়ে ওঠেনি—একান্ত সীমাবদ্ধ দু' একটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ছাড়া। কারণ বোধ হয় এই যে, অর্থনৈতিক কার্যকারণে সমবায়ের আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য নষ্ট হ'য়ে গেছে। মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ মানুষ আত্মপ্রত্যয়ের নৈতিক শক্তির সাহায্যে সমবায় সমাজ গ'ড়ে তুলতে পারবে, এ' আশা করা চলে: কারণ, অর্থনৈতিক কার্যকারণ তখন থাকলেও ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের পক্ষে তারই সুযোগ নিয়ে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার অবকাশ থাকবেনা। কিন্তু যতক্ষণ না মানবজাতি মোটামুটি সেই স্তরে উত্তীর্ণ হচ্চে ততক্ষণ তারই পথনির্দেশে মানবতাবাদীর কি বলার আছে তা'ও চিন্তা ক'রে দেখা দরকার। প্রথমেই মনে হয়, মানুষের মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভের পক্ষে সমাজতন্ত্রই একমাত্র সহায়ক: কারণ তাতেই তার পূর্ণ অধিকারলাভের প্রতিশ্রুতি রয়েচে। কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার যে, সমাজতন্ত্রেরও বহু সংজ্ঞা রয়েচে এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ দেশের উৎপাদন শক্তির উপর যৌথ মালিকানা এবং রাষ্ট্র ও সমাজের যৌথ পরিচালনা, যদি ও যখন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও উদ্যমের পরিপন্থী ব'লে বিবেচিত হয় তখন তা' আর মানবাধিকারের সহায়ক থাকে না—তখন তা' মানবতার উপর জুলুম ব'লেই গণ্য হয়। অবশ্য পরের অধিকারে হস্তক্ষেপের স্বাধীনতা ও প্রবৃত্তি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও উদ্যমের অন্তর্ভুক্ত নয়। কম্যুনিজমও নিজেকে সমাজতন্ত্র—সমাজতন্ত্র শুধু নয়, সমাজতন্ত্রের পূর্ণতা ব'লে দাবী করে। অন্যপক্ষে এখন এ' দাবী উঠেচে যে, যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কল্যাণরাষ্ট্র রূপে চালিত হয় এবং গণতান্ত্রিকপদ্ধতিতে মানুষের সর্বোত্তম কল্যাণের অর্থাৎ তার অন্তরবাইরের স্ফুরণের ব্যবস্থা করে,—সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত সমষ্টিশাসনের বিপদ থেকে সে মুক্ত এবং সেকারণে তা' সমাজতন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশী সমর্থনযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্র,

যুক্তরাজ্য, জার্মানী প্রভৃতি দেশের জনমত এখন এ' মতেরই পোষক ব'লে দাবী করা হয়ে থাকে। এমন কি, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ' দাবীও করা হয়ে থাকে যে সমাজতন্ত্রে শিল্পের যে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েচে, তার চাইতে ব্যক্তিগত বা বেসরকারী মালিকানায় পরিচালনা অনেক বেশী সুশৃঙ্খল ও কম ব্যয়সাধ্য এবং পরিণামে জনসাধারণের বেশী হিতকর। সরকারী পরিচালনার দায়িত্ব বহুজনে বিস্তৃত থাকাতে পরিচালনা শ্লথ ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে, ত্রুটি বিচ্যুতির দায়িত্ব কোনো বিশেষ পর্যায়ে বা ব্যক্তিতে ন্যস্ত করা কঠিন হয়; ফলে জনসাধারণের লাভ হওয়া দূরে থাকুক, ক্ষতিই হয়ে থাকে। অবশ্য বেসরকারী পরিচালনাও সরকারের ও জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিসংস্থার অধীনেই হ'তে হবে। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের গুণগত পার্থক্য সম্বন্ধে তর্ক এখন এ' স্তরেই রয়েচে। তবে মনে রাখা দরকার, সমাজতন্ত্রের মূলনীতি অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানাকে শোষণের উপায়ে পরিণত হ'তে না দেবার নীতি এখন গণতন্ত্রেও গৃহীত হয়েচে। বস্তুত গঠনে প্রকৃতিতে একেবারেই সমাজতন্ত্রী নয়—এমন অনেক সমাজ ব্যবস্থার পক্ষেও দাবী করা হয়ে থাকে যে তারাই প্রকৃত সমাজতন্ত্রী। আমাদের প্রাচীনকালের বর্ণাশ্রমপ্রথা সম্পর্কেও এ দাবী উত্থাপিত হয়ে থাকে, হিটলারের নাৎসী মতবাদেরও সরকারী নাম ছিল ন্যাশন্যাল সোশিয়ালিজম। ব্যক্তিগত মালিকানার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশের পুঁজিবাদী গণতন্ত্রেও বিশেষভাবেই হয়েচে: বিশেষত মালিক শ্রমিক সম্পর্কের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। এখানেই ধনতন্ত্র ও ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উপর সোশিয়ালিজমের ডায়লেকটিকাল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু ডায়লেকটিকাল প্রভাবই যথেষ্ট নয়: শ্রেণীবৈষম্যভিত্তিক ধনতান্ত্রিক সমাজে পূর্ণ মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা শুধু গোঁজামিল দ্বারা সম্ভব নয়। থিয়োরী অব ট্রাষ্টীশিপ অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজে মালিকদেরে শ্রমিকদের অছিরূপে দায়িত্ব পালন করতে হবে, এই যে থিয়োরী—এতে পূর্ণ মানবসত্তার স্বীকৃতি নেই, অবমাননা আছে। তথাকথিত শ্রেণীসহযোগিতা দ্বারা শ্রেণী বৈষম্যের নিরাকরণ সম্ভব হয়নি। ধনিক রাষ্ট্রে প্রবল শ্রমিক বিক্ষোভই তার প্রমাণ। ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক সত্তা সেখানে পূর্ণ স্ফুরণের অবকাশ পায়নি, আজও পাচ্চেনা। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান যুগে দ্রুত পতনোন্মুখ: তবু আজও তার যা অবশিষ্ট আছে, তা উপনিবেশ রাখবার আশা ও প্রবৃত্তি

ত্যাগ করতে পারেনি : রাজনৈতিক ঔপনিবেশিকতাবাদ এখন অর্থনৈতিক প্রভাবের আকারে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইচে। মুক্ত দুনিয়ারূপে পরিচয় দিতে চাইচে যে কমুনিষ্ট প্রভাবের বাইরের জগৎ—তাতে আজও বর্ণ-বৈষম্যের অবসান ঘটেনি, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আজও অব্যাহত নয়, বিশিষ্ট গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ক্ষণে ক্ষণে রাষ্ট্রের রোষকষায়িত দৃষ্টির অধীন হয়ে থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "নিউ-ডীল" নামক ব্যবস্থা দ্বারা আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্থৈর্য আনবার চেষ্টা হয়েছিল, শ্রমিক ও কৃষক অনেকটা সুযোগ সুবিধাও লাভ করেছিলেন : তবু তাতে সেখানকার ধনতান্ত্রিক সমাজের গুণগত কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সেখানে জগদ্বিখ্যাত গায়ক পল রোবসন, বৈজ্ঞানিক ওপেনহাইমার ও অন্যান্য অনেককে নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েচে। অন্যান্য দেশেও এমনটা ঘটেচে : ফ্রান্সে এই সেদিনও এ্যালজেরিয়ায় ঔপনিবেশিক যুদ্ধে ফরাসী সেনাদের বাধ্যতামূলক যোগদানের প্রতিবাদ ক'রে জাঁ পল সাঁর্তরে এবং অন্যান্য লেখক ও শিল্পীগণ বিপন্ন হয়েচেন—তাঁদের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার স্বীকৃত হয়নি। কাজেই বলতে হয়, ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রে আগে যেমন মানুষের আশ্রয় ছিল না আজও তা নেই। সমাজতন্ত্রের ডায়লেকটিকাল প্রভাব কতদূর কার্যকরী হ'লে পর গণতন্ত্রের গুণগত রূপান্তর হ'তে পারবে তাই হচ্চে প্রশ্ন। যাই হোক না কেন, মামুলি গণতন্ত্রে আর মানুষের সন্তুষ্টি নেই, সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞাও নির্দিষ্ট নয় : বলতে হয়, মানুষের পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা হয় যে গণতন্ত্রে—যে গণতন্ত্রে মানুষ নিজের রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাই সমাজতন্ত্র। সংক্ষেপে একে বলা হয়, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র—অর্থাৎ তা' মামুলি গণতন্ত্র নয়, আবার এমন সমাজতন্ত্রও নয় যাতে সমষ্টির মধ্যে মানুষের ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে গেছে। সোজা কথায় এ হ'লো সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয়।

মানুষ কি তবে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে—"সব মানুষকে সমান সুযোগ" দেবার ভিত্তিতে সার্বজনীন গণতন্ত্র বা প্রগতিমূলক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করবে? অন্য দিকে কম্যুনিষ্ট নীতি হচ্চে এই : "প্রত্যেককে তার সর্বোত্তম সামর্থ্য রাষ্ট্রের নিকট সমর্পণ করতে হবে, প্রত্যেকে রাষ্ট্রের নিকট থেকে পাবে তার প্রয়োজন মতো।" এই নীতি অবলম্বন ক'রে কম্যুনিজম ব্যক্তির উপর সর্বাত্মক আধিপত্য বিস্তার করলো : তাই দেখে

কি মানুষ তা' থেকে বিরত হবে? মানবতাবাদী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা সাপেক্ষে এ' যুগে এই কি বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদের নির্দেশ? কম্যুনিজম অবশ্য তা' স্বীকার করবেনা; নিখিল মানবজাতিকে নিজের প্রভাবাধীন করার আগে তার জয়যাত্রার শেষ নেই, এই তার দাবী। কিন্তু কমুনিষ্ট শিবিরেও যে এ' প্রশ্ন নিয়ে মতভেদ ও অন্তর্দ্বন্দ রয়েচে তা বোঝা যায় কম্যুনিষ্ট ও অকম্যুনিষ্ট দেশ সমূহের সহাবস্থানে এক পক্ষের বিশ্বাসে ও অন্য পক্ষের বিরোধিতায়। সম্প্রতি এই দুই মতের সামঞ্জস্য করার চেষ্টা হয়েচে এই ব'লে যে বিশ্বশান্তিরক্ষার প্রয়োজনে সহাবস্থান স্বীকার করা হবে; কিন্তু অকম্যুনিষ্ট দেশে বিপ্লবা সংগঠন প্রচেষ্টা একই সঙ্গে চলবে। এ' কথা ঠিক যে, প্রত্যেক দেশকেই সমাজবিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হয় ও হচ্চে : ইতিহাসের নির্দেশিত বিপ্লব যতো দেরীতে ঘটে ততোই প্রমাদ ডেকে আনে। মধ্যপ্রাচ্যে দেশের পর দেশে সামন্ত প্রথা অবসানের রক্তাক্ত দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের উপরই রয়েচে। অন্য দিকে অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত থেকে যুগের শিক্ষা গ্রহণ ক'রে রক্তাক্ত বিপ্লব এড়িয়ে যাবার দৃষ্টান্ত যে নেই তা নয়। আমাদের দেশে সামন্ত প্রথার অবসান যে ভাবে হ'লো তা'ও সে জাতীয় দৃষ্টান্ত। তবে এখানেও বলবার আছে এই যে, সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটেনি তা নয়: বহু রাজ্যে রক্তপাতও ঘটেচে এবং দেশ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করবার পর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের একাধারে আশ্রিত ও সমর্থক সামন্ত নৃপতিদের তিরোভাবের পশ্চাদভূমি সে বিদ্রোহেই রচিত হয়েছিল। তা' ছাড়া হিংস্রবিপ্লব ব্যতীত সামন্ত প্রথার অবসান যদিবা হয়ে থাকে, ভূমিতে কৃষকের সার্বিক অধিকার তাতে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সে অবশ্য সকল নাগরিকের মতো মৌলিক অধিকার লাভ করেচে; কিন্তু এরই মধ্যে তার নিকট সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষিপরিচালনার রাষ্ট্রীয় আহ্বান এলো। তাকেও যুগের আহ্বান বললে ভুল বলা হবেনা: সে উদ্যোগ সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রী দেশের যৌথ খামারেরই সমগোত্রীয়। কিন্তু তারও বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উঠেচে ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থকদের পক্ষ হতে: এমন কি, এ' উপলক্ষে তাদের রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্যোগ বৃদ্ধি পেলো। ব্যক্তিগত মালিকানাকে ব্যক্তিগত বা বেসরকারী উদ্যোগ নামে অভিহিত ক'রে তারা তা' ব্যক্তিস্বাধীনতারই অন্তর্গত ব'লে দাবী ক'রলো: সমবায় খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে কৃষকের কাজে ও জীবনে অযথা

হস্তক্ষেপ ব'লে রব তুললো। সে অজুহাতেই পুঁজিবাদী উদ্যোগ ও কার্যপদ্ধতির উপর রাষ্ট্রের তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রবল হচ্ছে। এমন আশঙ্কা করার কারণ আছে যে, এ' প্রতিবাদ সুযোগমতো প্রবলতর হবে এবং জনগণের বিক্ষোভকেও প্রবলতর ক'রে শান্তিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক রূপায়ণের যে আশা ও সম্ভাবনা এখনও আছে তাকে ব্যর্থ ক'রে দেবে। তবু এ সম্ভাবনাও আছে যে, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশ যদি ও যেখানে অব্যাহত থাকে তা'হলে এবং সেখানে জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তি কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতাকে জয় ক'রে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠা করতে পারবে ও তাতে কায়েমী স্বার্থের বিলোপ ঘটাবে। এমন কি, আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট সংস্থাসমূহও ইদানিং একযোগে এই মত লিপিবদ্ধ করেছে যে, শ্রমিক ও অন্যান্য বিপ্লবী শ্রেণীদের সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন ক'রে, অন্যান্য প্রগতিশীল পার্টি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সংখ্যাধিক্য লাভদ্বারা, বিনা গৃহযুদ্ধেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা সম্ভব; এবং সেভাবেই উৎপাদনের মূল যন্ত্র ও উপাদানসমূহ জনগণের নিকট হস্তান্তরকরণেব নিশ্চয়তা বিধান করা যেতে পারে। বর্তমান যুগে যখন আন্তর্জাতিকতা আর ভাবসত্তামাত্র নয়: যাতায়াতের সুযোগে ও অন্যান্য নানাভাবে যোগাযোগে যখন দেশ সমূহের পারস্পরিক বোঝাপড়া নিবিড় হয়েছে, তখন এক দেশেব বিবর্তনের উপর অন্য দেশের শিক্ষার প্রভাব প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক এবং এখানেই কম্যুনিজম বা সোশিয়ালিজমের ডায়লেকটিকাল প্রভাব একদিকে গণতন্ত্রের বিকাশ বা সমাজতান্ত্রিক রূপায়নে, অন্যদিকে একচ্ছত্রতারূপ বিপদ পরিহারে কার্যকরী হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে। এ' কারণেই এরূপ দাবী করা হয় যে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র আর কম্যুনিজমের আয়ত্তাধীনে যাবার সম্ভাবনা নেই। এ' দাবীতে অন্তর্নিহিত আছে এই যুক্তি যে, আইডিয়া আত্মবিবর্তন দ্বারাই কার্যকরী হ'তে পারে: এক দেশের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে তার যে বিবর্তন ঘটে অন্যত্র তা' আপনা থেকেই কার্যকরী হয়: সেখানে আর সে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাবার দরকার করে না। আইডিয়ার স্ববিবর্তনের সম্ভাব্যতা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

এই সিদ্ধান্তে তবে আমরা এলুম: ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা তো সম্ভব হলোই না; সাম্যবাদী সমাজে তার আত্মোদ্ধারের আশাও ব্যর্থ হ'লো। অতঃপর রয়েছে গণতন্ত্রের সমাজতান্ত্রিক রূপায়নের অপেক্ষা এবং তাতে মানুষের অভীষ্টলাভের ভরসা। তা'ও আজ ভরসামাত্র—সে ভরসা সুদূরপরাহত। তাই

আজ আবার জেগেছে সভ্যতার সংকট। আত্মশক্তির উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠাদ্বারা মানুষ বার বার এমন সংকট অতিক্রম করেচে, এবারও করবে—মানবতাবাদীর রয়েচে এই আশা ও বিশ্বাস। কিন্তু সভ্যতা আজ যে স্তরে উত্তীর্ণ হয়েচে তাতে মানবতাবাদী জীবনদর্শনের দায়িত্ব অতি কঠোর, মানবতাবাদী কার্য্যক্রম উদ্ভাবনের প্রয়োজন একান্ত। আজ আর শুধু মানবতাবাদের অভিমুখে যাত্রা নয়, মানবতাবাদে মানুষের আত্মস্বীকৃতির সময় এসেচে।

এহেন সময়েই বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ নিয়ে এলো মানুষের পূর্ণ আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের নির্দেশ: সে নির্দেশ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে শুরু ক'বে সামবায়িক গণতন্ত্রে উত্তীর্ণ হবার নিশানা বহন করচে। সমাজতন্ত্র একদিকে দেশের অত্যাবশ্যকীয় শিল্পসংস্থাকে ব্যক্তিগত মালিকানার কুফল থেকে মুক্ত রাখাব দাবী রাখে এবং রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে—অন্য দিকে তাতে ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের অত্যধিক আধিপত্য বিস্তারের বিপদও রয়েচে। আর, শুধু গণতন্ত্র বলতে বর্তমানে যা বুঝায় তাতে শিল্পের ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সংস্থার ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে শ্রমিকেরও সমগ্রভাবে জনসাধারণের স্বার্থ সমন্বয়ের প্রশ্ন তো আছেই: শুধু ভোটাধিকারের মাধ্যমে যেখানে জনগণের রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা, তাতে সে রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে কতটা জনগণের আয়ত্তে আছে—বিশেষ ক'রে ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রে—তা' নিয়েও প্রশ্ন উঠেচে। বিশেষত, ভোট সাধারণত দিতে হয় পার্টির পক্ষে এবং এমন অবস্থা দাঁড়িয়েচে যে, পার্টির স্বার্থ দেশের বা জনগণের মঙ্গলের চেয়ে বড় ব'লে বিবেচিত হয়: সে স্বার্থে নিপীড়িত জনগণের দুঃখবেদনাও ছোটো ক'রে দেখানো যেতে পারে এবং জাতির কোনো এক বিশেষ অংশের অভাব ও প্রয়োজনই বড়ো ক'রে দেখানো হয়, দেশের ও জাতির পক্ষে নির্মম যে সত্য তাকেও চাপা দিতে বা তার গুরুত্ব কমাতে দ্বিধা দেখা যায়না। তাই নিছক ভোটাধিকার মানুষকে নিজের রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে কতটা দিচ্চে, সে বিষয়ে এখন অনেকেরই মনে সংশয় জেগেচে। তা' ছাড়া এ' সত্য এখন প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে, ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রে ভোট চাইবার ও পাবার ক্ষমতা কার্যত তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে—যাদের নির্বাচনপ্রতিযোগিতায় যোগ দেবার ও নির্বাচন-সংগ্রাম চালাবার মতো প্রয়োজনীয় অর্থসম্বল রয়েচে—তা' সে সম্বল তাদের নিজ থেকে, পার্টির নিকট থেকে বা অন্য যে কারু কাছ থেকেই সংগৃহীত হোক না কেন। মানবতাবাদের দায় ও দায়িত্ব এমন এক রাষ্ট্র ও সমাজ-

গঠনের পথনির্ধারণ—যাতে সমাজ ও ব্যক্তির, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটে. এবং রাষ্ট্রও তদনুসারে সমাজে রূপলাভ করে—বস্তুত সুসমন্বিত সমাজশক্তিই রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

একথা বলাই বাহুল্য যে, মানবতাবাদী যে কোনো;রাষ্ট্রকে বিচার করবে তার মধ্যে ব্যক্তিমানুষের স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের ও ব্যক্তিসত্তার স্ফুরণের কতটা সুযোগ রয়েচে তার পরিমাপ ক'রে। অবশ্য সে সুযোগও ব্যক্তির সাধনার উপর নির্ভর করবে, নইলে তার ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠার অবসরই পাবেনা। কল্যাণ-রাষ্ট্র বল্‌তে যে উপর থেকে মানুষের কল্যাণ করার কথা বুঝায় তা'তে মানুষের সমান সার্বভৌম সত্তা স্বীকৃত নয়ঃ সেহেতু মানবতাবাদী তা' নির্বিচারে গ্রহণ করতে পারে না। অন্যদিকে সোশিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে যে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রসত্তার সঙ্গে মিশিয়ে দেবার সূচনা রয়েচে—কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে তো তাই মানুষের মুক্তি ও পরিণতি ব'লে বিবেচিত হয়,—মানবতাবাদী দেখবে তাতে ব্যক্তির স্ফুরণ ঘটচে অথবা রাষ্ট্র ব্যক্তিকে অভিভূত ক'রে ফেলচে। এখানেই লক্ষ্য ও উপায়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রশ্ন এসে পড়ে এবং এ'দেশে আমরা যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ব'লে থাকি তার সম্ভাবিত তাৎপর্য বিবেচনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। মোটামুটি শান্তিপূর্ণ উপায়েই আমরা স্বাধীনতা লাভ করেচি এবং সে কারণেই স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত সহজে সংহত হ'তে পেরেচে। সহিংস উপায়ে স্বাধীনতা অর্জিত হ'লে পর সে হিংসার মাতন হয়তো স্বাধীনতার পর নিজেদের মধ্যে বোঝাবুঝিতে ছড়িয়ে পড়তো, এ' মত এখন প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য বলা যায়। তেমনি আমরা আশা করচি যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে অর্থাৎ দেশের জনসমষ্টির মধ্যে আভ্যন্তরীণ সমঝোতা দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারলে পর, সে সমাজতন্ত্র সার্বিক সমষ্টিশাসনসুলভ একনায়কত্বপ্রবণতা থেকে মুক্ত হবে এবং তার সুষ্ঠু বিকাশের সম্ভাবনাও নিরাপদ থাকবে। জওহরলাল নেহেরু একেই বর্তমান ভারতের জাতীয় জীবনদর্শনরূপে উপস্থাপিত করেচেন। ইতিহাসের সে এক মহাপরীক্ষা : একদিকে কায়েমী স্বার্থের তীব্র প্রতিরোধ, অন্যদিকে জনগণের অধীর উত্তেজনা মিলে সে দর্শন ব্যর্থ ক'রে দেবে কিনা সেই পরীক্ষা। জওহরলাল একেই নব ভারতের মহান দায়িত্ব ব'লে বর্ণনা করেচেন। তিনিও এই মানবতাবাদী নীতিতে আস্থা ঘোষণা করেচেন যে, ভালো কাজের ফল ভালো এবং মন্দ কাজের ফল মন্দ হয়ে থাকে। প্রকৃতির কোন্ অমোঘ বিধানকে আশ্রয় ক'রে এই নীতি নির্ধারিত হ'য়েচে, তা' কে বলবে?

"দিল্লী হনৌজ দুর অস্ত !" মানবতার মঞ্জীল আজও বহু দুরে, তার মিনারে অরুণ সূর্যের রশ্মি এসে পড়েচে মাত্র। মানুষ কি আজও সেদিক পানে চেয়ে দেখতে পায়? আজও কি সে সম্বিৎহারা, আশ্রয়হারা নয়? রোগ শোক বেদনায় দারিদ্র্যে দুঃখে আজও সে অবশ: আজও যেন তার একমাত্র সম্বল অদৃশ্য, অজানা ভগবানের বাণী: "মামেকং শরণং ব্রজ"। সেই ভগবানকে জানালো মানুষ পরম আহ্বান: "আবিরাবির্ম এধি।" তাঁরই নিকট তার আকুল, অনন্ত প্রার্থনা: "অসতো মা সৎগময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতম গময়।" সেই ভগবান অসহায়ের ভগবান, অতএব যারা মানুষকে অসহায় ক'রে রাখতে চায় সেই ভগবানে তাদেরও বড়ো প্রয়োজন। তাই ব'লে এই মনে করা যায়না যে তারাই ভগবানকে সৃষ্টি করেচে বা বাঁচিয়ে রেখেচে:

"সেই আদিযুগে যবে অসহায় নর
নেত্র মেলি ভবে,
চাহিয়া আকাশপানে কারে ডেকেছিল—
দেবে না মানবে?
কাতর আহ্বান সেই মেঘে মেঘে উঠি
লুটি গ্রহে গ্রহে
ফিরিয়া কি আসে না না পেয়ে উত্তর
ধরায় আগ্রহে?"

সে ডাক ফিরে এলো। বলচেন কবি অক্ষয় কুমার বড়াল

"সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে মরুৎ গর্জনে
কার অন্বেষণ?
সে নহে বন্দনাগীতি, ভয়ার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত
খুঁজিছে স্বজন!"

তখন

"আরক্ত প্রভাত-সূর্য উদিল যখন
ভেদিয়া তিমিরে,
ধরিত্রী অরণ্যে ভরা, কর্দমে পিচ্ছিল
সলিলে শিশিরে।
শাখায় ঝাপটি পাখা গরুড় চীৎকারে,
কাণ্ডে সর্পকুল
সম্মুখে শ্বাপদসঙ্ঘ বদন ব্যাদানি'
আছাড়ে লাঙ্গুল,
দংশিছে দংশক গাত্রে, পদে সরীসৃপ,
শূন্যে শ্যেন উড়ে,
কে তাহারে উদ্ধারিল? দেব না মানব—
প্রস্তরে লগুড়ে?"

মানুষই মানুষেরে উদ্ধার করেছিলো : দেবতা নয়। শুরু হ'লো তার বাঁচার সংগ্রাম : তাতে মানুষই মানুষের সাথী, আর কেউ নয় :

"শীর্ণ অবসন্ন দেহ, গতিশক্তি-হীন,
ক্ষুধায় অস্থির,
কে দিল তুলিয়া মুখে স্বাদু পক্ক ফল,
পত্র পুটে নীর?
কে দিল মুছায়ে অশ্রু? কে বুলাল কর
সর্বাঙ্গে আদরে?
কে নব পল্লবে দিল রচিয়া শয়ন
আপন গহ্বরে?
দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা
অতিথি সৎকার
নিশীথে বিচিত্র সুরে বিচিত্র ভাষায়
স্বপন সম্ভার।"

এলো সভ্যতার শৈশব : প্রকৃতিতে দেবদেবীর আবির্ভাব :

"শৈশবে কাহার সাথে জলে স্থলে ভ্রমি
শিকার-সন্ধান ?
কে শিখাল ধনুর্বেদ, বহিত্র চালনা,
চর্ম-পরিধান ?
অর্ধ-দগ্ধ মৃগমাংস কার সাথে বসি'
করিনু ভক্ষণ ?
কাষ্ঠে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালি' কার হস্ত ধরি'
কুর্দন নর্তন ?
কে শিখাল শিলাস্তূপে, অশ্বত্থের মূলে
করিতে প্রণাম ?
কে শিখাল ঋগ্বেদ, চন্দ্র-সূর্য মেঘে
দেব-দেবী নাম ?"

প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন :

"কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা কর্ষণে
হইনু বাহির ?
মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি অন্ন ঢালি
দধি দুগ্ধ ক্ষীর ?
সায়াহ্নে কুটীরচ্ছায়ে কার কণ্ঠ সাথে
নিবিদ উচ্চারি'
কার আশীর্বাদ ল'য়ে অগ্নি সাক্ষী করি'
হইনু সংসারী ?
কে দিল ঔষধ রোগে, ক্ষতে প্রলেপন
স্নেহে অনুরাগে ?
কার ছন্দে—সোম গন্ধে—ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু
নিল যজ্ঞ ভাগে ?"

সভ্যতার জয়যাত্রা : নূতন পৃথিবী রচনা :

"যৌবনে সাহায্যে কার নগর পত্তন,
প্রাসাদ নির্মাণ ?
কার ঋক-সাম-যজুঃ, চরক-সুশ্রুত
সংহিতা পুরাণ ?
কে গঠিল দুর্গ, সেতু, পরিখা, প্রণালী
পথ মাঠ-ঘাট ?
কে আজ পৃথিবী-রাজ : জলে স্থলে ব্যোমে
কার রাজ্যপাট ?
পঞ্চভূত বশীভূত, প্রকৃতি উন্নীত
কার জ্ঞান বলে ?
ভুঞ্জিতে কাহার রাজ্য জন্মিলেন হরি
মথুরা কোশলে ?"

অতঃপর বিবর্ত-বুদ্ধির আবির্ভাব : ইভলিউশণ আবিষ্কার :

"প্রবীণ সমাজপতি পদে আজি প্রৌঢ় আমি
জুড়ি দুই কর
নমি, হে বিবর্ত-বুদ্ধি ! বিদ্যুৎ-মোহন
বজ্র মুষ্টিধর !
চরণে ঝটিকাগতি—ছুটছ উধাও
দলি' নীহারিকা।
উদ্দীপ্ত তেজসনেত্র—হেরিছ নিভয়ে
সপ্ত সূর্য শিখা !
গ্রহে গ্রহে আবর্তন—গভীর নিনাদ
শুনিছ শ্রবণে !
দোলে মহাকাল কোলে অণু-পরমাণু
বুঝিছ স্পর্শনে !'

সেই বিবর্তনের পথে কোথা থেকে কোথায় এলো মানুষ :

"নমি, হে সার্থককাম ! স্বরূপ তোমার
নিত্য অভিনব !
মরদেহে নহ মর, অমর-অধিক
স্থৈর্য, ধৈর্য তব।
লয়ে সলাঙ্গুল দেহ, স্থূলবুদ্ধি তুমি
জন্মিলে জগতে',—
শুষিলে সাগর শেষে, রসাইলে মরু,
উড়ালে পর্বতে !
গঠিলে আপন মূর্তি—দেবতা-লাঞ্ছন,
কালের পৃষ্ঠায়
গড়িছ—ভাঙ্গিছ তর্কে, দর্শনে বিজ্ঞানে
আপন স্রষ্টায় !"

মানুষ নিজেকে খুঁজতে গিয়ে ভগবানকে লাভ করলো : ভাঙ্গলো, গড়লো :—

"নমি, হে বিশ্বগ-[illegible]ণ ! আজন্ম-চঞ্চল,
বিচিত্র বিপুল !
হেলিছ দুলিছ সদা, পড়িছ আছাড়ি
ভাঙ্গি' সীমা-কূল !
কি ঘর্ষণ, কি ধর্ষণ—লম্ফন, গর্জন—
দ্বন্দ্ব—মহামার !
কে ডুবিল—কে উঠিল—নাহি [illegible]সামায়া
নাহিক নিস্তার !
নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, নাহি ভ্রান্তি, ভয়,
কোথায়—কোথায় ?
চিরদিন এক লক্ষ্য—জীবন বিকাশ
পরিপূর্ণতায় !"

সেই সঙ্গে মানুষ দর্শনে সাহিত্যে ধ্যান ধারণায় সাধনভজনে উপাসনায় এক ধারণাতীত বিরাট অধ্যাত্মজগৎ গ'ড়ে তুলেচে। সে জগৎকে সে সত্য ব'লে জেনেচে। সে শুনেচে অমৃতের পুত্র ব'লে সম্বোধন: শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, সেই পরমপুরুষকে আমি জেনেচি। শ্রীকৃষ্ণ তাকে বলেচেন: ভয় নেই, যুগে যুগে আমি এসেচি। যীশু তাকে বলেচেন: যদি খোঁজো তবে পাবে; দরজায় আঘাত কোরো, দরজা তোমার জন্য খুলে' যাবে। এমনি অনৃতবাণী তাকে শুনিয়েচেন অন্যান্য ধর্মনায়কগণ। শুধু তাঁরাই তাকে নিশ্চিতভাবে বল্‌তে পেরেচেন, তাকে কাছে ডেকেচেন। মানবতাবাদী কি তাকে তেম্‌নি ক'রে ডাক্‌তে পেরেচে? পারেনি। একে তো আজও সে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে জান্‌তে চিন্‌তে পারেনি: কাজেই অন্যকে ডাকবে কি ক'রে? তা' ছাড়া সে মানুষকে মানুষের নিজের কাছেই ফিরে ডাকবে: অন্য কারু কাছে নয়। কিন্তু আজকের মানুষ আজও আশ্রয়কামী, আজও সে বিশ্বসত্তার পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে। তাই যে তাকে অমৃতের পুত্র বলে' ডেকেচে, যে তাকে আশ্রয় দিতে চাইচে, যে তাকে অনুসরণ কর্‌তে বলেচে তাকেই তার প্রয়োজন। তারই সন্ধানে, তারই সাধনায় সে অধ্যাত্মজগৎকে লাভ করেচে।

তবু এ' জগৎ তারই সৃষ্টি: আত্মানুসন্ধানের চেষ্টায় সে যে কখনও বসে' নেই তার প্রমাণ। কিন্তু একি শুধু তার আত্মসন্ধান, সৃষ্টিরহস্যের কোনো দুর্জ্ঞেয় সূত্র কি এর মধ্যে নিহিত নেই? ভগবান সৃষ্টিকর্তা নন্, সৃষ্টির নিয়ন্তা নন্: তিনি কি তবে কিছুই নন্? কোনো কিছুতেই, কোনো ভাবেই কি তাঁর কোনো অস্তিত্ব নেই? সহস্র সহস্র বৎসর ধ'রে মানুষের বিশ্বাসে এই যে বিরাট প্রাসাদ গ'ড়ে উঠেচে—এ' কি সম্পূর্ণ ভুয়ো? অধ্যাত্মশক্তির ক্রিয়ার যুগযুগ ধারাবাহী কিম্বদন্তী কি শুধু মানুষের বিশ্বাসবিভ্রমেরই ফল?

তা' যদি না-ও হয় তবু সে ফল আর ভগবানে ন্যস্ত করা যাবেনা: মানুষেরই তা'তে সম্পূর্ণ অধিকার রয়েচে। হয়তো একান্ত আত্মনিবেদনে তার স্বতোৎসারিত ইচ্ছাশক্তিই কার্যকরী হচ্চে। সে ইচ্ছাশক্তি দার্শনিক—প্রাকৃতিক শক্তি: কাণ্ট এবং তাঁর আগে ও পরে বহুজন একে সার্বভৌম স্থান দিয়েচেন—স্বয়ং প্রকৃতির উপর জয় লাভের উপায় হিসেবে এর কার্যকারিতা কবুল করেচেন। বিচিত্র ইচ্ছাশক্তি পরস্পর দ্বন্দ্ব সংঘাত, বোঝাপড়ায়

ভেতর দিয়ে মানবপ্রকৃতি সমেত বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকরী হচ্চে—এককথায় যাকে বিশ্বজনীন ইচ্ছাশক্তি বলা যেতে পারে। এমন কি হ'তে পারে যে, ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তির একান্ত প্রয়োগে তাকে প্রভাবিত করা যায়? সাধনা প্রার্থনার মাধ্যমেই হয়তো সজ্ঞানে বা অর্ধজ্ঞানে সে প্রয়োগ সত্য হ'য়ে থাকে। বললুম, এমন কি হ'তে পারে? বলতে পারতুম, এমন কি হ'তে পারেনা? টেলিপ্যাথী বা নিছক চিন্তার মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যাপারটাকে এখন তো আর সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া হয়না। যেমন উড়িয়ে দেওয়া হয়না স্বপ্নের মধ্যে মানুষের মনের নিগূঢ় ক্রিয়ার কথা। এই ক্রিয়াকে ঘিরে বিরাট বৈজ্ঞানিক দার্শনিক গবেষণা গ'ড়ে উঠেচে এবং সে গবেষণায় ধরা পড়েচে স্বপ্নে মানুষের অবচেতন মনের বিচিত্র প্রকাশ। তাতেই জগৎ লাভ করেচে সিগমাণ্ড ফ্রয়েডের বিরাট অবদান: সে অবদান অবলম্বন ক'রে, কখনো বা তার আংশিক প্রতিবাদ ক'রে এ্যাডলার, ইয়ুং ও আরও অনেকে মানবমনের স্ফুরণ ও প্রকাশের রহস্যসন্ধান করেচেন। সে সন্ধান এখনও বহু তর্কাধীন: বহুবিষয়ে তা নিশ্চিত সত্য প্রকাশ করেচে এবং যে সব বিষয়ে এখনও তা' করেনি সেখানেও সত্যেরই দিশা বহন ক'রে চলেচে। অতিপ্রাকৃতিকত্বের কোনো স্থান তাতে নেই: ধর্মকে ফ্রয়েড সম্পূর্ণরূপেই অগ্রাহ্য করেছিলেন। মানুষের মনকে তিনি অসীম সৃষ্টিশক্তির অধিকারী বলেছিলেন। স্বপ্নলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে সব ধারণা ও দাবী করা হ'য়ে থাকে তাদেরে সম্পূর্ণ 'মিথ্যা' ব'লে অগ্রাহ্য করা অবৈজ্ঞানিক হবে এ' কারণে যে, অতীত ও বর্তমানের ঘটনা ও উপলব্ধির কার্যকারণ অবলম্বন ক'রেই মনের সেই সূক্ষ্মক্রিয়া ঘটে, এবং দেহের নিদ্রামগ্ন অবস্থায় সে ক্রিয়ার কী বিস্তৃতি ও সম্ভাবনা ঘটে তা' সন্ধানের এখনও প্রচুর অবকাশ রয়েচে। ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাষ—তথা অমঙ্গলের আভাষ মানুষের উপলব্ধিতে চকিতে দেখা দেয় এবং যথাসময়ে কোনো না কোনো আকারে সত্য হয় ব'লে যে শোনা যায়, মনোবিজ্ঞানে তারও রহস্য উদ্ঘাটনের অপেক্ষা রয়েচে। বিজ্ঞানের কোন্ নিগূঢ় রহস্য মানুষের মনের মাঝে গুপ্ত রয়েচে কে তা' সহসা বলতে পারে? বস্তুর জগতে বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা এখন সব বাধাবন্ধহারা হলো: বস্তুগঠিত মনের রাজ্যে বিজ্ঞানের অভিযানের অবকাশ কি আজও অফুরন্ত নয়? কী মানুষের মন? কী তার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া? রবীন্দ্রনাথ যাকে ইউনিভারস্যাল মাইণ্ড বা বিশ্বমন বলেচেন, কী

—১৩

সে? আমার মনে তার কী ক্রিয়া, তাতে আমার মনেরই বা কী প্রতিক্রিয়া? অধ্যাত্মজগতের অপরিমেয় রহস্যের সমাধান কি এরই মাঝে লুকিয়ে রয়েচে? এম্‌নি ক'রে কি বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, আর মানুষ অজ্ঞাত ভগবানের উদ্দেশে মাথা কুটে মরে? তবে কি সে শুধু মাথা কুটে না ম'রে বিশ্বপ্রকৃতিকেও তার ইচ্ছার ও প্রয়োজনের খবর নিতে বাধ্য করতে পারে এবং এখনও নিজের অজানিতে তাই করচে? শুধু অজানিতেও তো নয়। মানুষ তো দাবী করে ভগবানের নিকট থেকেই সে শক্তি আহরণ করচে: সাধনা দ্বারা সে শক্তি অধিগত ক'রে প্রকাশ করেচে—করেচেন কর্মবীর, চিন্তাবীর, ধর্মনায়কগণ। তা' হ'লে দেখা যাচ্চে, ভগবান নাগালের বাইরে নন্, তাঁর শক্তিও মানুষের আয়ত্তের বাইরে নয়। কাজেই সে শক্তির উপর মানুষের হাত রয়েচে; সে শক্তিকে আয়ত্ত করবার বাস্তব প্রক্রিয়াও নিশ্চয়ই আছে। মানুষ সে শক্তিকে জয় করে,—যে জয় করতে পারেনা, সে তার উদ্দেশে মাথা কুটে মরে।

কিন্তু মাথা কুটে মরচে কোথায়? নরনারীর প্রার্থনা কার উদ্দেশে উচ্চারিত হচ্চে? মানুষ যে মানুষকে আশীর্বাদ করে বা অভিশাপ দেয়, তারই বা কার্যকারিতা কোথায়? তার কার্যকারিতাও তো ভগবানাশ্রিত নীতিধর্মকেই অবলম্বন ক'রে রয়েচে। বন্ধু বা প্রিয়জনের প্রতি আমার শুভেচ্ছা কীভাবে কার্যকরী হবে? মনের ক্রিয়ার অলক্ষ্য, অজানা বিস্তৃতিতে এ' প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েচে। কিন্তু মনের কি দেহনিরপেক্ষ ক্রিয়া আছে? দেহনিরপেক্ষ অস্তিত্ব যদি না থাকে তবে দেহনিরপেক্ষ ক্রিয়া কি ক'রে থাকবে? কিন্তু দেহ-নিরপেক্ষই বা বলি কেন? দেহকে আশ্রয় ক'রেই মনের ক্রিয়া: তবে তা' স্বাধীন, স্বতন্ত্র ক্রিয়া: ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে সে কি বিশ্বমনকে, মানুষের মনকে প্রভাবিত করচে?

যদি মানুষের ইচ্ছাশক্তি কার্যকরী হয়, যদি সে প্রচণ্ড আগ্রহে সে শক্তিকে বিশ্বশক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে পারে, তবে সে স্বরাট,—অমোঘ নিয়তির সামনে অসহায় নয়। অমোঘ নিয়তি যাকে বলি, তা' প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অমোঘ গতি ভিন্ন কিছু নয়। দুরারোগ্য রোগে দেহের ক্ষয় অমোঘ নিয়তি, দেহের ক্ষয়ের ফলে মৃত্যুও তেমনি নিয়তি। এমন অনেক রোগ আছে যা' কিছুদিন পূর্বেও দুরারোগ্য ব'লে বিবেচিত হ'তো: কিন্তু সে সব রোগে মৃত্যু এখন আর অনিবার্য নয়—অমোঘনিয়তিপদবাচ্য নয়: প্রকৃতির উপর ক্রমজয়ী সেইযে মানুষ

আজ তাকে স্বয়ম্ভু, স্বনিয়ন্তা ব'লে স্বীকার করবার সময় এসেচে। বিংশ শতাব্দীর মানুষকে চতুর্দশ শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞানের স্তরে রেখে দেওয়া কখনও সম্ভব নয়—পঞ্চম শতাব্দীর চিন্তার স্তরে তো নয়ই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পূর্বেও মানুষ নিজেকে স্বরাট ব'লে কল্পনা করেছিল।

তারপর নিজেকে সে হারিয়ে ফেললে। হারিয়ে ফেললে তখন, যখন সে মানুষের সমাজের অন্তর্ভুক্ত হ'লো : অর্থনৈতিক বাধাবাঁধন তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলে। ওদিকে তার আত্মজিজ্ঞাসা গ'ড়ে তুললো বিরাট গভীর এক অধ্যাত্মজগৎ : তার সত্তা সেখানেও বিকিয়ে যাবার মতো হ'লো। দুঃখদারিদ্র্যতাপদগ্ধ মানুষ স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে সে জগতে নিজেকে ধরা দিলে। কিন্তু অন্তহীন মহিমা তার এই যে, তার আত্মজিজ্ঞাসা সেখানে স্তব্ধ হ'য়ে যায়নি। আত্মজিজ্ঞাসার ফলে তার আত্মাবিষ্কারের ধারা অক্ষুণ্ণ রইলো। কোপার্নিকাস সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বজগৎ আবিষ্কার করলেন : আজ মানুষ — আমাদেরই মতো দু'হাত পা-ওয়ালা মানুষ—চন্দ্রলোকে অভিযান করতে প্রস্তুত হচ্চে। কাজেই যে মানুষ ধর্মাশ্রয়ী, ভগবানে যে আশ্রয় বাঞ্ছা ক'রে আত্মসমর্পণ করেচে, তাকে যেমন গভীর বেদনা ও সহানুভূতির সঙ্গে দেখবো—তার নিজস্ব পথে আত্মসন্ধানও যেমন অশ্রদ্ধার সঙ্গে দেখবো না, তেমনি আজকের বিশ্বজয়ী, প্রকৃতিজয়ী মানুষকেও ভুলতে পারিনে : মানবজাতি যে সে মানুষেরই পথাভিসারী, দিবালোকের মতো প্রত্যক্ষ এ সত্যকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। সর্বস্রষ্টা, সর্বনিয়ন্তা ভগবানে যারা বিশ্বাসী তাঁরাও নিশ্চয় ভগবানকে এমন রূপে কল্পনা করবেন না যে, সে ভগবান মানুষের স্বরাটত্ব লাভের পরিপন্থী হবেন—মানুষ আজ নিজ ভাগ্যরচনার যে শক্তিলাভ করেচে তা' অপছন্দ করবেন। পছন্দ অপছন্দের অপেক্ষা তো আর থাকচে না : মানুষ তো আপনা থেকেই এগিয়ে চলেচে : কেউ যদি বলেন—তা' মানুষ যতই এগোক না কেন, যা-ই হোক না কেন, ভগবান ক্রমেই তাকে অতিক্রম ক'রে রয়েচেন—তবে আর তাঁর সঙ্গে তর্ক নেই : কারণ, তাহ'লে তো বোঝা যাবে মানুষ একাধারে মানুষ ও ভগবান : নিজের ভগবদসত্তাকে লাভ করবার জন্যে সে ক্রমেই ছুটে চলেচে। মানুষনিরপেক্ষ ভগবান, মানুষ-থেকে-স্বতন্ত্র-সত্তা-বিশিষ্ট ভগবান এ' বিশ্বের পরিচালনা করচে, এমন কোনো প্রমাণই নেই। সে প্রমাণ মিলতো যদি দেখা যেতো দুঃখীর দুঃখ দূর হচ্চে, অন্যায় ক'রে কেউ পার পাচ্চে না—ভালোমন্দ, পাপপুণ্য দ্বন্দ্বের বুদ্ধিগ্রাহ্য মীমাংসা মিলচে : কেন যে দৃশ্যত অনেক সময়েই সত্যের জয় হচ্চে না, মানুষ শান্তি

পাচ্ছে না, সমষ্টিগত মানুষ এখনও হা হা ক'রে পথ খুঁজে মরচে আর অধিকাংশ ব্যক্তিমানুষ পথহারা, দিশেহারা হ'য়ে রয়েচে—অন্তত যদি সে প্রশ্নের জবাব মিলতো। পূর্বজন্মের কর্মফল, অদৃষ্টবাদ ইত্যাদি যে বৃথাই মানুষের নিজেকে ভোলাবার, স্তোক দেবার জন্যে কল্পিত, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আজ সে বিষয়ে তো সন্দেহ থাকবার উপায় নেই : তবু যাঁরা তাতেই বিশ্বাস করেন তাঁদের সঙ্গে আর বোঝাপড়ার কোনো অবকাশ নেই।

বোঝাপড়ার অবকাশ নেই : তবু তাদের মনকে বুঝবার প্রয়োজন আছে। যতক্ষণ না মানবতাবাদী উপলব্ধিতে তারা সম্পূর্ণ আশ্রয় পাচ্চে ততক্ষণ ধ্বসে-পড়া অধ্যাত্মলোকে আশ্রয় না খুঁজে তাদের উপায় নেই। ধ্বসে-পড়া বলচি এ'জন্যে যে, সামাজিক ও ব্যক্তিগত আচরণে সে অধ্যাত্ম নীতির প্রভাব ক্রমশই ক্ষীয়মান হ'য়ে আসচে। যে ন্যায়ান্যায় পাপপুণ্য জ্ঞান, যে বিবেকের নির্দেশ ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস থেকে আহৃত, ব্যাপক দুর্নীতিতে, রেষারেষিতে ও পরিণামচিন্তার অভাবে তার ক্রমবর্ধমান অবাস্তবতা পরিস্ফুট হচ্চে, এবং সবসাধারণের স্বীকৃত ও চিন্তার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েচে। পারচেনা সে অধ্যাত্মনীতি বর্তমান জগতের ক্রমজটিল বাস্তবতাকে আয়ত্তে রাখতে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির আনুষঙ্গিক ও অন্তর্নিহিত যুক্তির প্রভাব মানুষের কতকটা অগোচরে তার অধ্যাত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরিয়েচে : যে প্রণালীতে অধ্যাত্মজগতের ভিত্তি ধ্বসে ফেলেচে তাতেও ডায়লেকটিকসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবু অধ্যাত্মবিশ্বাস ছাড়া আজও মানুষের অবলম্বন নেই ; বহুযুগলালিত সংস্কারকে আশ্রয় ক'রে তা' দাঁড়িয়ে আছে। এই সংস্কার যে নিরেট ফাঁকা, পদার্থহীন তা'ও নয় : সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদে সে সমৃদ্ধ : বাংলায় শারদীয়া পূজার সামাজিক আনন্দ, সরস্বতী পূজার সাংস্কৃতিক পরিবেশ সে পূজার ধর্মীয় প্রভাবের যারা বাইরে তাদেরও আকর্ষণ ক'রে থাকে। সংস্কারের সেই হচ্চে স্থায়ী অবদান : তাতেই মানুষের গভীর আশ্রয়, এবং অধ্যাত্মবিশ্বাস সে আশ্রয়কে অবলম্বন ক'রেই বেঁচে আছে। ধর্মবিশ্বাসীরা অবশ্য বলবেন, বিশ্বাস তাদের শুধুই সংস্কার নয় : গভীর প্রত্যয়ই তার প্রাণ। ব্যক্তিসত্তার একান্ত আশ্রয় যে প্রত্যয়ে, ধর্মবিশ্বাসের মূল সেখানেই নিহিত সন্দেহ নেই ; কিন্তু যে প্রত্যয় যুক্তিকে পরিহার ক'রে আসচে, সংস্কারকে আশ্রয় ক'রেই সে বেঁচে আছে, এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কারের মধ্যেই তার পরিচয়। সে সংস্কার অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায় গ'ড়ে উঠেচে : তাদের পারস্পরিক

রেষারেষি ও হানাহানি বহন করেনা কোনো সত্যের পরিচয় বা সত্য-সন্ধানের ইংগিত। গভীরতম অমঙ্গলই সে বহন ক'রে আনে—যেমন এনেচে ভারতীয় উপমহাদেশে। একদিকে এই ঃ অন্যদিকে পুরোহিততন্ত্র এবং তার উপর নির্ভর করচে ও তাকে বাঁচিয়ে রেখেচে যে কায়েমীস্বার্থ,—তা' ধর্মসংস্কারের অচলায়তন রচনা করেচে। তবু সে সংস্কারের উৎপত্তি হয়েছিল মানুষের বিশ্বাসেই, এ' কথা স্বীকার করতে বাধা নেই। বস্তুত টি, এস, ইলিয়ট প্রমুখ অনেকের মতে ধর্মকে আশ্রয় ক'রেই সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠেচে ঃ ইলিয়ট তো ধর্মভেদে সংস্কৃতিরও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন। কিন্তু আমরা বলতে চাই যে ধর্মকে আশ্রয় ক'রে যে সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠেচে, তা'ও ধর্মকে অতিক্রম ক'রে মানুষকে সার্বজনীন মূল্যবোধে উত্তীর্ণ করেচে এবং সে মূল্যবোধই সহজ মানবীয় সংস্কৃতির প্রাণ। বৈজ্ঞানিক আত্মোপলব্ধির আশ্রয়ে ও অবলম্বনে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করাই আজ মানবতাবাদীর দায়।

কাজেই মানুষই নিজের ভালোমন্দ পাপপুণ্যের নির্ধারক, এ' ভরসা ও দায়িত্ব নিয়েই তাকে চল্‌তে হবে। ভরসা বলচি এ'জন্যে যে তাকে আর অদৃষ্ট, নিয়তি বা বিধাতার উপর নির্ভর করতে হচ্চেনা ঃ চারদিককার শক্তিকে প্রভাবিত ক'রে সে নিজেই নিজের ভাগ্য রচনা করবে। অবশ্য তার অর্থ এ' নয় যে, সে যা ইচ্ছে করে তাই করতে পারবে। মানুষের ইচ্ছা, ও ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে যে ইচ্ছা তা'র পারিপার্শ্বিকে পরিস্ফুট হয়, তা' পরস্পর ক্রিয়াশীল ঃ তাতে ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে তা' করাই সত্য ও বাস্তবানুগ হবে। এখানেই দায়িত্বও এসে পড়ে ঃ সে দা' য়িত্ব এই যে—মানুষকে নিজের ইচ্ছা এ'ভাবে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেন তাতে অপরের ন্যায্য ইচ্ছার ব্যাঘাত না ঘটে ঃ কারণ যা' ন্যায়, যা' ভালো তাকে জয়যুক্ত করার দায়িত্ব তারই উপর এসে পড়েচে ঃ সে দায়িত্ব এখন আর কোনো অদৃশ্য, অজ্ঞেয় বিধাতাতে ন্যস্ত নেই।

তা' নেই ব'লেই সে দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে মানুষেতেই ন্যস্ত ; তা' এড়াবার বা তা'তে কোনোরূপ ফাঁকী দেবার অবকাশ নেই। মানুষ জানবে যে সে দায়িত্ব একান্ত-রূপে তার নিজের ঃ তার পাপ পুণ্যের ভার নেবার জন্যে কেউ নেই ঃ স্বর্গ নেই, নরক নেই ঃ প্রায়শ্চিত্তের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাতে কোনো সত্য নেই—যদিও তার মনের অনুতাপে বা অনুশোচনাতে সত্য আছে। তখন সে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করবে নিজের বুদ্ধির উপর, নিজের মন থেকে উৎসারিত যুক্তির উপর। তাই

ক'বে সে নিজে সত্যিকাব মানুষ, পূর্ণ মানুষ হবাব চেষ্টা করবে এবং তার কর্মোদ্যমও সে উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হবে। সে তবে সমাজকেও সেভাবে প্রণোদিত কবতে পাববে। সমাজকে একান্তভাবে ব্যক্তিব ও সমষ্টির দায়িত্ব নিতে হবে: যে সমাজ বাইরেব শক্তিব দোহাই পেড়ে ব্যক্তিকে পঙ্গু ক'রে রাখে ও নিজে ভ্রষ্ট হয়—সে সমাজই আব থাকবে না: মানুষেব মধ্যে পাবস্পবিক ন্যায়ের ভিত্তিতে নতুন সমাজ দাঁড়া নেবে। এখানেই আ'বাব এসে পড়ে প্রকৃতিব প্রধানেব কথা: নেহরু যে বলেচেন, ভালো কাজেব ফল ভালো হয় এবং মন্দ কাজেব ফল মন্দ হয়, সেই কথা। কিন্তু যে হয় তাব প্রমাণ কোথায়? প্রমাণ মানুষেব নিজেব বিবেকে, তাব মুক্তবাণী মনে। মানুষেব প্রত্যেক পারস্পবিক সম্বন্ধেব নিজস্ব যুক্তি, গতি ও সীমা রয়েচে: সে সীমা অতিক্রম ক'বে অন্য সম্বন্ধে আঘাত করলে পর অর্থাৎ তার হানি ঘটালে প্রত্যাঘাত অনিবার্য। নর নারীর প্রেম যদি সামাজিক, পারিবারিক কর্তব্য লঙ্ঘন করে তবে তা' আপনাকে আপনি অপমান করবে, নাশ করবে। তেমনি সমাজ বা পরিবার যদি সত্যিকার প্রেমকে অস্বীকার করতে চায় তবে সে পরাস্ত হবে, তাতে ভাঙন ধরবে। এমনি ভারসাম্য প্রকৃতির অন্তরে বর্তমান রয়েচে তাই মানুষের পরম ভরসা, তাইতে তাব চরম দায়িত্ব।

এবার মানুষ স্বর্গচ্যুত হলো: স্বাধীন হলো কি তাব মুক্তি মিল্‌বেন? যতক্ষণ সে বিভিন্ন ধর্মে, বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত, ততক্ষণ সেতো পূরো মানুষ নয়: ততক্ষণ সে পঙ্গু মানুষ, বিকৃত মানুষ। এমনি পঙ্গু বিকৃত মানুষকে আমবা এ উপমহাদেশে ভালো ক'বেই দেখেচি: সে মানুষ মানুষই আব ছিলনা: ছিল শুধু হিন্দু আব মুসলমান: তাইতে দেশ বিভক্ত হলো। যে মানুষ স্বরাট, সার্বভৌম, তাব দেশ নেই জাত নেই, ধর্ম নেই, সম্প্রদায় নেই: সে মানুষ সকল পৃথিবীব, সমস্ত বিশ্বেব। যতক্ষণ না মানুষ স্বরাট বা সার্বভৌম হয় ততক্ষণ কি ভেদ মিটবে, হিংসাদ্বেষ দূব হবে, বিশ্বজনীন সমাজ ও বাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হ'তে পাববে? "ফাদারহুড অব গড্ এ্যাণ্ড ব্রাদারহুড অব ম্যান"-য়ের আশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'লো: কাবণ, গড্‌কে মানুষ নানাভাবে পেতে চাইলো এবং তাই নিয়ে ভেদবিসম্বাদ সৃষ্টি করলো। যে স্বরাট, সার্বভৌম মানুষ শুধুই মানুষ, ভেদবিভেদখিন্ন মানুষ নয়—সে যখন স্বাধীনভাবে মিল্‌বে তখনও কি ব্রাদারহুড অব ম্যান প্রতিষ্ঠিত হবেনা? যদি হয় তবে দুঃখী মানুষ, বঞ্চিত মানুষ শান্তি পাবে, সান্ত্বনা পাবে—ভেদবিভেদমুক্ত

জগতে সত্যসুন্দরের সঠিক উপলব্ধিতে সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলবে। এখনও তো ধর্মভিত্তিক তথাকথিত সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের দরুণ সংস্কৃতির সার্বজনীনতা বিঘ্নিত হচ্চেঃ মানুষের মনে তা' পূর্ণ, সত্য হ'তে পারচেনা। সংস্কৃতির জন্ম বিশেষ পরিবেশেঃ কিন্তু সার্বজনীনতাই তার প্রাণ, তাতে তার স্থায়িত্বের দাবী। তার উৎস মানুষের আনন্দ, মানুষের বেদনা, মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষাঃ সে আনন্দ, সে বেদনা, সে আশা সে আকাঙ্ক্ষা মানুষেরই প্রতি উন্মুখ। মানবীয় সম্বন্ধেই তাদের ভিত্তিঃ সে সম্বন্ধেরই মাধ্যমে মানুষ নিজেকে পূর্ণতর করতে চায়। তাই মানুষ যখন যান্ত্রিক জগতের খবর জানতে পেলো তখনও সে যন্ত্রে পরিণত হলো নাঃ তার হৃদয়ে মানুষের সাড়া, প্রকৃতির আবেদন অটুট রইলো। অতঃপর সে প্রকৃতির ভেতরে, মানুষের ভেতরে, প্রকৃতির ও মানুষের পরস্পরে বিচিত্র আন্দোলনে প্রবুদ্ধ হয়েচেঃ তাইতে শক্তিসঞ্চয় করচে। তারই আলোড়নে মানুষের হৃদয়বৃত্তি দিন দিন সংস্কৃতিকে নিখিল মানবে প্রসারিত ক'রে চলেচে। যে পথ বেয়ে করে মানুষ অনাগতের প্রতীক্ষা- সে পথ কোনো বিশেষ ধর্মের পথ নয়ঃ সে পথ বেয়ে আসেন কবি, আসেন শিল্পী, আসেন স্থপতিভাস্করঃ আসেন সাধক, আসেন প্রেমিকঃ আসে লায়লা-মজনু, ইউসুফ-জুলেখা—আসে রোমিও-জুলিয়েটঃ

কৃষ্ণ আসেন রাধার নিকট বৃন্দাবনেঃ পূর্ব পাকিস্তানী অহিন্দু যুবকেরও গান গাইতে বাধেনাঃ

কাননে বাজায় বাঁশী পরাণ চিরিয়া
সখি, বারণ কোরো, বারণ কোরো গিয়া!

সব ধর্ম রেখে গেলো সাংস্কৃতিক অবদান, সব সংস্কৃতি জানাবে মানুষের মনে আবেদনঃ তাতে মানুষ পূর্ণ হবে, সত্য হবে, সুন্দর হবে —এই তো মানবতাবাদীর আশা। মানুষের হৃদয়ই সে আশার আশ্রয় স্থলঃ তাইতো নজরুল গেয়েচেনঃ

মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই।

সেই আশায় পথ চেয়ে আছে আজকের মানুষ, ব্যক্তিমানুষঃ বহুর মাঝারে, সমষ্টির মধ্যে যে মানুষ ডুবে গেলো, হারিয়ে গেলো, সেই মানুষ। একেকটা দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্দৈব-বা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক আলোড়ন—

এম্‌নি ঐতিহাসিক ঘটনাতে কতো শত, কতো সহস্র, কতো লক্ষ, কতো কোটী ব্যক্তিমানুষ হারিয়ে যায়, তার কোনো হিসেবও থাকেনা। আমাদের দেশবিভাগে কতো লক্ষ মানুষ, কতো লক্ষ পরিবার গৃহহারা, সর্বস্বহারা হ'লো তার হিসেবই বা কে রেখেচে? চীন-ভারত সীমানার নিকটে লাদাকের অভ্যন্তরে বারো জন ভারতীয় পুলিশ নিহত হ'লো। এ' নির্মম হত্যাকাণ্ডকে বিতর্কের বিষয়ীভূত করতেও রাজনৈতিক মহলে প্রবৃত্তি বা গরজের অভাব হ'লোনা। কিন্তু সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঁসিয়ে খ্রুশ্চভ বল্‌লেন: "আমি ভাবচি যারা নিহত হয়েচে তাদের পরিজনদের কথা।" সে উক্তিতে চকিতে ঘটনাটি মানবিকতা—তথা মানবতার আলোকে দেদীপ্যমান হ'লো। এমনি ক'রে মানবিকতার মাধ্যমে মানবতা—তথা ব্যক্তিমানবসত্তা স্বীকৃতি লাভ করে। আমরা যাদেরে সাধারণ মানুষ ব'লে থাকি—সমাজ ব্যবস্থায় যাদের দেহমনের পূর্ণ স্ফুরণের ব্যবস্থা আজও হয়নি—অশিক্ষায় পঙ্গু, কুশিক্ষায় মনোবিকৃত যারা, সমাজে যোগ্য স্থান তারা সে দিনই লাভ করবে যেদিন তাদের ব্যক্তিসত্তার অন্তর্নিহিত মূল্য সমান ব'লে স্বীকৃতি পাবে। সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ তাদেরে সে স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল: কিন্তু মানুষ ব'লে পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ না করা পর্যন্ত সে প্রতিশ্রুতি সত্য হ'তে পারেনা। তেমনি এ'ও বোধ হয় সত্য যে লোভক্রোধকামমদমাৎসর্যে বিকৃত মানুষ যারা, তারাও নিজেদের মনুষ্যত্বের মহিমা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারলে পর অপেক্ষাকৃত সহজে আত্মজয় করতে পারবে। এম্‌নি মানুষের আলেখ্য এঁকেচেন বাংলাদেশে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: সঙ্গে সঙ্গে তিনি মনুষ্যত্বের মহিমাকেও কথাশিল্পের মাধ্যমে ফুটিয়েচেন: নারীর পূর্ণ মনুষ্যত্ব সম্বন্ধেও তিনি সমাজকে সচেতন করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন: বলেছিলেন, "সতীত্ব বড়ো; কিন্তু মনুষ্যত্ব তার চেয়েও বড়ো।" "নারীর মূল্য" বইয়ে তিনি সূচনা ক'রেছিলেন ধর্মের মূল্য, সমাজের মূল্য ইত্যাদি দ্বাদশ মূল্য বিচারের। এম্‌নি মূল্যবিচারে মানুষের পূর্ণ মূল্যের স্বীকৃতির প্রচেষ্টার আভাষ পাওয়া যায়। গানের, কবিতার, কথাশিল্পের, নাটকের, চিত্রশিল্পের, ভাস্কর্যের মাধ্যমেও বর্তমানে একাধারে মানুষের বেদনার প্রকাশ ও তার মনুষ্যত্বের পূর্ণ স্বীকৃতির প্রয়াস চলচে। অবশ্য ব্যক্তিমানুষও নিঃশেষে ব্যক্তিমানুষ নয়: সে যখন আর সমষ্টিতে অভিভূত থাক্‌বেনা তখনও সমষ্টির অন্তর্গত থাক্‌বে: ইতিহাসের বিধিবিধানে তখনও সে নিয়ন্ত্রিত হ'বে। কিন্তু

তখন আর সে অন্ধভাবে পরিচালিত হবেনা: রাষ্ট্র ও সমাজ সে সজ্ঞানে গঠন কর্‌বে এবং মানবতাবাদী পরিপ্রেক্ষিতে তাদের রূপান্তর ঘটাবে: সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রপথে ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এখনও সে-ই ইতিহাসের রথের দড়ি টানে: রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে বলেচেন শূদ্র এসে যতক্ষণ না রথের দড়ি স্পর্শ কর্‌লো ততক্ষণ রথ চললোনা: স্বামী বিবেকানন্দও বলেছিলেন, এবার শূদ্রের পালা আস্‌চে। কিন্তু কে শূদ্র, কে শূদ্র নয়? স্বরাট সার্বভৌম যে মানুষ, সে মানুষ শূদ্র নয়: সে সম্পূর্ণ মানুষ। তারই বন্দনায় কবি অক্ষয় কুমার বড়ালের পূর্বোধৃত কবিতা সমাপ্ত হয়েচে:

"নমি তোমা, নরদেব! কি গর্বে গৌরবে,
দাঁড়ায়েছ তুমি!
সর্বাঙ্গে প্রভাত-রশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ,
পদে শস্প ভূমি।
পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, সুবর্ণ কলস
ঝলসে কিরণে,
বালকণ্ঠ—সমুত্থিত নবীন উদগীথ
গগনে পবনে।
হৃদয়স্পন্দন ̣. া ঘুরিছে জগৎ,
চলিছে সময়;
ভ্রূভঙ্গে ফিরিছে সঙ্গে-ক্রম, ব্যতিক্রম
উদয় বিলয়!

"নমি আমি প্রতিজনে আদ্বিজ চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস!
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু,
সমগ্রে প্রকাশ!
নমি কৃষি-তন্তু-জীবি, স্থপতি তক্ষণ
কর্ম—চর্মকার!
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি-অগোচরে
বহ অদ্রি-ভার!

কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয়।
একত্বে বরেণ্য তুমি শরণ্য এককে,
আত্মার আত্মীয়।”

সে মানুষ ইতিহাসের যাত্রী, যুগ-যুগ-বাহিত যাত্রী। বর্বরতা হ’তে সভ্যতার যাত্রাপথে সেই প্রথম দেশ হতে দেশান্তরে মেষ চরিয়ে ফিরেছিল, হল-কর্ষণের রহস্য আবিষ্কার করেছিল। তারপর সে করলো সমাজ গঠন, ক্রমে রাজ্যেরও পত্তন। জগতের আদিকারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিল সেই, উত্তরের অবিরত সন্ধানও সে-ই করেছে। গড়ে তুলেছে নগরনগরী, গড়েছে সভ্যতা সংস্কৃতির অভ্রংলিহ প্রাসাদ: প্রতিদিন সে প্রাসাদে সে নব নব প্রস্তর সংযোজন করছে, জীর্ণ প্রস্তর ফেলে দিয়ে নূতনে শূন্য স্থান ভ’রে তুলেছে। সেই মানুষ একাধারে হোমার, শেক্সপীয়ার, ব্যাস, বাল্মিকী, কালিদাস, নেপোলিয়ন সীজার, হানিবল, আলেকজাণ্ডার অশোক, আকবর, সক্রেটিস, প্লেটো, পেরিক্লিস, লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি, কাণ্ট, হেগেল, স্পিনোজা, ডেকার্ট, মার্ক্স, যীশু, বুদ্ধ, মোহাম্মদ, লেনিন, গান্ধী। সেই মানুষই দেবতা, সেই মানুষই শয়তান। সেই মানুষই ভেঙেছে, গড়েছে—যুদ্ধে দুনিয়াকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে গেছে আবার শান্তির পতাকা উড়িয়েছে। মানুষই প্রকৃতি, দোঁহে নেই কোনো ভেদ—মানুষ সবার, বিশ্বভুবনে সম্রাট। তাইতো লালন শাহ ফকীর গেয়েছেন:

“মানুষরূপে সেই দয়াময়
তাইতে মানুষ ভজিতে হয়
মানুষ তত্ত্ব ভুলিয়া হায়
লালন ফকীর মরে ঘুরে।”

সেই মানুষের পথে জাগবে নূতন সমাজ, নূতন সভ্যতা, নূতন সংস্কৃতি। সকল মানুষকে সে পথে আহ্বান করতে হবে, নইলে সে সম্ভাবনা ব্যাহত, বিলম্বিত থাকবে। সকল মানুষের রয়েছে তাতে যোগদানের অধিকার—জন্মগত অধিকার। কিন্তু আজ আর তার শুধু অধিকারের প্রশ্ন নয়। এ’ বইয়ের প্রস্তাবনাতে যে কথা বলেছিলুম, উপসংহারে ফের সেকথা বলা

দরকার হচ্চে: সেকথা এই যে, আধুনিক বিজ্ঞান আজ রাষ্ট্রের হাতে যে মারণাস্ত্র এনে দিয়েচে তা' থেকে বাঁচতে ও আত্মরক্ষা করতে হ'লে মানুষকে আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে ও মানুষের অধিকার প্রয়োগ করতে হবে। জনমনের অভিব্যক্তির মাধ্যমে সে অধিকার কার্যকরী হয়েচে ব'লেই রাষ্ট্র প্রধানগণ মারণাস্ত্র সম্বরণ ক'রে শান্তির পথসন্ধান করতে বাধ্য হয়েচেন। সমূহ সর্বনাশের মুখোমুখী হয়ে যেন মানবজাতি থমকে দাঁড়িয়েচে: লোক-মানস আজ গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে আত্মসন্ধানোন্মুখ হয়েচে। পৃথিবীর পথে আজ স্বরাট, সার্বভৌম মানুষের জয়পতাকা দেখা দিয়েচে। কী এ' ঘটনার পটভূমি—অনাদিঅনন্ত পশ্চাদভূমি? নয় কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তি: পুরুষ ও প্রকৃতির মহামিলনেই এ' লোকযাত্রা। পথ রচিত হ'চে। বিজ্ঞান আজ মানুষকে এমনি মহাসন্ধিক্ষণে মহাসংকটে নিয়ে এলো যে, সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ ব্যতীত তার আর নিজেকে বাঁচাবার উপায় নেই: অদৃষ্ট মেনে নিতে বলে যে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ, অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক নিয়তি মেনে নিতে বলে যে সমাজ, জীবনের সর্বসমর্পণ করতে বলে যে রাষ্ট্র,—তাদের কারুরই জন্য অপেক্ষা করবার অবকাশ আজ মানুষের নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেচেন:—

বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি
উঠে অট্টহাসি;
ধুলা বালি
দিয়ে করতালি
নিত্য নিত্য
করে নৃত্য
দিকে দিকে দলে দলে;
আকাশে শিশুর মতো অবিরত কোলাহলে

মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা,
অসংখ্য কামনা,

রূপে মত্ত বস্তুর আহ্বানে উঠে মাতি
তাদের খেলায় হ'তে সাথী।
স্বপ্ন যত অব্যক্ত আকুল
খুঁজে মরে কূল;
অস্পষ্টের অতল প্রবাহে পড়ি
চায় এরা প্রাণপণে ধরণীরে ধরিতে আঁকড়ি
কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-সুদৃঢ় মুষ্টিতে,
ক্ষণকাল মাটিতে তিষ্ঠিতে।
চিত্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে
স্তূপে স্তূপে
উঠিতেছে ভরি,—
সেই তো নগরী।
এ' তো শুধু নহে ঘর,
নহে শুধু ইষ্টক প্রস্তর।

এই সভ্যতা, এই সংস্কৃতি, এই মহাকাললীলা, এই ইতিহাস।

পরিশেষ

মানবতাবাদীর পথ: মানবতাবাদের জয়ে সে পথের শেষ: তবু সে পথ অন্তহীন—মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির সমকালীন। শেষেরই রেশ ধ'রে জাগলো যে পথ তার পরিশেষও নেই। তবে পথে পথে নিতে হয় সে পথের পরিচয়: সেখানেই সে পথের পরিশেষ। সে পরিশেষ বর্তমানের: তবু তা' প্রতি মুহূর্তেই ভবিষ্যতের অভিমুখে উন্মুখ।

মানুষ যেখানে একাকী সেখানে তার সুখদুঃখ, সমস্যা-সংকটও তার নিজস্ব; কিন্তু সেখানেও সে পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত: পরিবারের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, সমসাময়িক জগতের সঙ্গে সম্বন্ধে তার জীবনে প্রতিক্ষণে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ঘটচে। সে সম্বন্ধের সুসমন্বয়ের অভাবে সে পীড়িত। সম্বন্ধ তখন বন্ধন হ'য়ে দাঁড়ায়: বন্ধনের পীড়া তার দেহেমনে। কেন যে সে সম্বন্ধে সমন্বয়ের অভাব ঘটচে তা' যদি সে মানবীয় বিচারে বুঝতে না পারে তবে সে অতিপ্রাকৃতিক নিয়তির কবলে নিজেকে ছেড়ে দেয়। যে সমষ্টিশক্তি তার সমষ্টিজীবনে প্রভুত্ব স্থাপন করেচে, নিয়তির আড়ালে সে-ই তাকে অধীন ক'রে রাখে। সে সমষ্টিশক্তি কখনো রাজাতে, কখনো ধর্মযাজকে, কখনো শ্রেণীতে, কখনো পার্টিতে রূপ ধরে এবং যাকে সে পীড়া দিচ্চে তার সঙ্গে সংঘাতে বিপ্লব সৃষ্টি করে। এমনিতরো সংঘাত এ' যুগে আমাদের দেশেও দেখা দিয়েচে: দেখা দিয়েচে ঘরে-বাইরে, মাঠেপ্রান্তরে, কলকারখানায়, পথে ঘাটে: কখনো সূক্ষ্মভাবে, কখনও প্রকাশ্যে: আজ যা' সূক্ষ্ম কাল তা' বৃহৎ, ব্যাপক হ'য়ে দাঁড়াচ্চে। সমন্বয়ের অভাব যেন প্রতিপদে প্রকট হলো। ট্রট্স্কী বলেছিলেন: বিপ্লব লোকের বাড়ীতে আসে পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে—তখন দেখা যায় যে বাড়ীর ভৃত্যেরা আর ততো আজ্ঞাবহ নয়। পথে ঘাটে মেলে এম্‌নি আগামী বিপ্লবের পরিচয়।

বৈজ্ঞানিক বাস্তব অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ' অসমন্বয়ের কারণ মানুষের মধ্যে—তার রাষ্ট্রে, তার সমাজে, তার জীবনে নিহিত। এমন কোনো অতিমানবীয় নিয়ম নেই যার দ্বারা এ' অসমন্বয়

ন্যায্য ব'লে চালানো যেতে পারে: এর মূলে মানুষের হাতের বাইরের কোনো কারণও নেই। এ' সিদ্ধান্ত যদি মনের গোচরে স্পষ্ট হয়, এ' উপলব্ধি যদি সত্য হয় তবে স্বরাট মানুষ পরস্পর সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা করবে—হয়তো সহজেই সামঞ্জস্য এসে যাবে; কারণ তবে আর পুরোনো ধারণা-কল্পনা, পুরোনো ঐতিহ্য, পুরোনো স্বার্থশক্তি বাধা হয়ে দাঁড়াবেনা। কিন্তু তার অর্থ এ' নয় যে ব্যক্তিমানুষ তবে অনায়াসে আপনা থেকে সমাজে খাপ খেয়ে যাবে। সে যেভাবে গ'ড়ে উঠেচে তাতে তার মনের গতি, ইচ্ছা অনিচ্ছা, সামর্থ্য অসামর্থ্য সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নেবার প্রয়োজন তখনও থাকবে এবং তাতেও ঘাত প্রতিঘাত ঘটবে। তবু সে সব পেরিয়ে সমাজে তার সুসমন্বিত স্থানলাভের সম্ভাবনা তখন একান্ত হবে। সেই হবে মানুষের সমাজজীবনে, সমষ্টিজীবনে মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা।

তারপরও কি ব্যক্তিমানুষ ভগবানের সন্ধান করবে? এই জীবনের যত স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা, মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা—সব কিছুর অর্থসন্ধান সে তখনও করবে: কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও উপলব্ধি তার যতো বাড়্‌বে ততোই তার জীবনের অর্থসন্ধান বাস্তবানুগ হবে: ধোঁয়াটে অধ্যাত্মলোকে আর তা' হারিয়ে যাবেনা। সুখদুঃখের বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়ে সে অর্থসন্ধান গুহায়াং ধর্মস্য তত্ত্বসন্ধানের চেয়ে কিছুতে কম বিচিত্র, কম রোমান্টিক নয়। সে তখন দেখবে জীবনের বহু দুঃখ, বহু ট্র্যাজেডীর মূল নিহিত মানবীয় কারণে, অথচ আমরা সে সব অতিমানবীয় কারণের—তথা নিজ ভাগ্যের ঘাড়ে ছেড়ে দিয়েচি। মানবমানবীর বহু প্রেম ব্যর্থ হয়েচে এবং তাদের জীবন অভিশপ্ত করেচে একান্ত সামাজিক কারণে—এমন কারণে যার মধ্যে যুক্তি, মানবিকতা, ন্যায় ইত্যাদি কোনো কিছুই বর্তমান নেই—আছে হয়তো শুধু অন্ধ সংস্কার। গ্রহবিচার, জাতিবিচার সব কিছুই সে কারণের অন্তর্ভুক্ত। সমাজে যদি সকলের শিক্ষার ও আত্মবিকাশের সমান সুযোগ থাকে তবে অগণিত জীবন ব্যর্থতা ও অপূর্ণতা থেকে রক্ষা পাবে। রোগমুক্তির যে সব ব্যবস্থা এখনে আবিষ্কৃত হয়েচে তাদের সুযোগ নিতে পারলে পর অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা অনেক কমে আসে, তার ফলে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সর্বনাশ নিবারিত হ'তে পারে। এ' প্রসঙ্গেও বিধিলিপির কথা তোলবার বা আয়ু পূর্বনির্দিষ্ট আছে বলবার কোনো অর্থ থাকবেনা।

কাজেই দেখা যাচ্চে, জীবনের বহু বিয়োগান্ত পরিণতির মূলে রয়েচে একান্ত মানবীয় ও পরিহার্য কারণ। তেমনি, প্রকৃতি ও মানবীয় জগৎ উভয়েতেই কার্যকারণ সম্বন্ধে বাঁধা বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াতেই যা' ঘট্বার ঘট্চে: সে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মানুষ নিজের ইচ্ছা ও কর্মদ্বারা প্রভাবিত করবার চেষ্টা করতে পারে; কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো রকম অভিযোগ বা আফশোষের কোনো অর্থ নেই: নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক নিয়মের কার্যকারণে প্রকৃতি ও জগৎ চলচে—এ' কথা মানুষ যদি ও যখন বুঝতে পারবে তখন সে আর কোনো কিছুর প্রত্যাশা না রেখে নিজের শক্তির পূর্ণ উদ্বোধনে ব্রতী হবে। তখন হয়তো সে দেখ্বে যে, যেখানে সে ব্যর্থ বা নিরাশ হয়েচে সেখানেও ব্যর্থতা বা নৈরাশ্যের কারণ স্পষ্ট বা সূক্ষ্মভাবে তার নিজেরই মধ্যে কোথাও লুকোনা রয়েচে—যদিও মোটামুটি দৃষ্টিতে তা' ধরা পড়চেনা। তখন সে নিজের ত্রুটি আবিষ্কার ক'রে তা' সংশোধনের দিকে মন দেবে। অবশ্য সমসাময়িক সমাজের সঙ্গে নিজের কোনোরূপ বেসুরো হ'লেও ব্যর্থতা বা নৈরাশ্য ঘটতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও যদি সে জানে যে তার নিজের শক্তির বিকাশ ও প্রয়োগ ব্যতীত কিছুই হবার নয়—তবে সে তাতে প্রাণপণ করবে, অথচ নিজের ভাগ্য বা অজানা ভাগ্য-নিয়ন্তার উপর যখন মানুষ নির্ভর করে তখন তার শক্তি অনেকটা অস্ফুট, অপরিণত থাকে। তাকে বুঝতে হবে যে, যে কোনো কাজের যথাযথ ফল আছে, বাস্তব সত্য যতই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা যাক্, এক সময়ে তা' সাম্‌নে এসে পড়বেই এবং সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে তার মোকাবিলা করতে হবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে তবে মানবতাবাদী বিচার এ' ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ কর্বে। সেই হবে সভ্যতার গতিপথের মোড় পরিবর্তন। একদা মানুষ এ' বিশ্বের আদিকারণ খুঁজতে গিয়ে অদৃশ্য অজানা নিয়ন্তার বশ্যতা স্বীকার করেছিল, এবার হবে স্বয়ংবিবর্তিত বিশ্বের সাথে তার স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত আত্মসত্তার মোকাবিলা—ইতিমধ্যে আহৃত জ্ঞান, জ্ঞানের শক্তিদ্বারা সে ক্রমেই বিশ্বশক্তির অংশীদার হচ্চে। সে যখন সম্পূর্ণরূপে তার এ' শক্তি, তার এ' সত্তা উপলব্ধি করবে তখন তার সম্পূর্ণ মানসিক পট পরিবর্তন ঘটবে: তখন সে ক্রমেই পূর্ণ হ'তে পূর্ণতর চেতনাতে উত্তীর্ণ হবে। তখন তার মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ আত্মনির্ভরতার অভাবের গ্লানিময় মানসিকতা থেকে তাকে উদ্ধার ক'রে তার দ্বিজত্ব ঘটাবে। এই বিশ্বের অফুরন্ত মহিমা, এই

পৃথিবীর অপার সৌন্দর্য, এই জীবনের অনন্ত রহস্য তখন হবে তার লীলাভূমি : কাল্পনিক স্বর্গনরকের আর প্রয়োজন থাকবেনা। অবশ্য এ'ও এখন কবি-কল্পনা ব'লেই বোধ হবে ; আর এ'ও ঠিক যে মানুষ যতক্ষণ সমাজের সঙ্গে, পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ সুসমঞ্জস করতে না পারচে ততক্ষণ তার মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। মানবতাবাদে সেরূপ সমাজগঠনের প্রতীক্ষা ও পথনির্দেশ রয়েচে। সেরূপ সমাজগঠন যদি ও যখন সম্ভব হবে তবে ও তখন মানুষের অন্তরবাইরে সে অবকাশ জাগবে যাতে সে এই দুনিয়াকে, এই জীবনকে প্রাণ ভ'রে গ্রহণ করতে পারে। এখন সে তা' করতে পারচেনা কারণ, সে জীবনসংগ্রামে ক্লিষ্ট, বিচিত্র অসামঞ্জস্য অসমন্বয়ে বিক্ষুব্ধ। জীবনের রসরূপ শিল্প সৌন্দর্য সবই তখন তার অধিগত হবে। মানবতাবাদী সমাজে তার দেহমনের তেমনি অবকাশের সুযোগ ঘটবে—যে অবকাশে সে চারদিকে হাত পা ছড়াতে, আকাশের দিকে বাহুবিস্তার করতে পারে। সেই অবারিত প্রশস্ততায় তার প্রাণমন তাকে মুক্ত বুদ্ধির ও প্রসারিত হৃদয়ের কোন্ সুরলোকে উত্তীর্ণ করে দেবে, তা' কে জানে ! এ' সম্ভাবনা আজকের পটভূমিতে কল্পনা মাত্র ব'লে বোধ হ'লেও মানবতাবাদ এরই অভিসারী, এরই নিশ্চিত পথগামী। তাই এ'তে সভ্যতার গতিপথের মোড় পরিবর্তন, বিশ্বমানবজীবনের পুনরাবর্তন, বহুযুগশেষে পুনরায় মানুষের আত্মোদ্বুদ্ধ, আত্মনির্ভরপরায়ণ সাধনার প্রবর্তন। ব্যক্তিমানুষ শুধু এমনতরো সাধনাতেই আত্মপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে—নিজের সঙ্গে, অপরের সঙ্গে যে সংগ্রাম তাকে অহরহ ক্ষতবিক্ষত করচে তাতে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়। মানুষের স্বরাটত্বে প্রতিষ্ঠা ব্যতীত এ' কিছুতেই হবার নয়।

এখানে প্রশ্ন উঠবে : মানুষ কি তবে একান্তভাবেই নিজের উপর নির্ভর করবে ? তাই করা সব দিক দিয়েই যুক্তিসংগত : তবে মানুষকে এখানে ব্যক্তিহিসেবে ধরলে চলবেনা, সামাজিক মানুষ ব'লেই ধরতে হবে। এ' কথা অবশ্য ঠিক যে অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাস ক'রে তার কাছে ব্যক্তির যে আত্মসমর্পণ সে শুধু ব্যক্তির আত্মসমর্পণ নয়—ব্যক্তিসমষ্টি সমাজও তেমনি আত্মসমর্পণ ক'রে ব'সে আছে। অতিপ্রাকৃতিক শক্তির উপর ব্যক্তির এ' নির্ভরতা বোঝা কঠিন নয় : অসহায় মানুষ, দুঃখবেদনায় জর্জরিত মানুষ, অজানার ভয়ে ভীত মানুষ সহজেই এ' নির্ভরতার পথ বেছে নেয়। কিন্তু সে যদি সত্যি ক'রে যুক্তির আশ্রয় নেয় তবে দেখবে

দুঃখ বিপদ বেদনা কিছুই অকারণে ঘটেনা, যে অজানাকে আমরা ভয় করি তা'ও যুক্তির পথ বেয়েই আত্মপ্রকাশ করে। আকস্মিক বিপদও ঘটে ঘটনারই সমবায়ে—যে বিভিন্ন, বিচিত্র শক্তি অহরহ বিশ্বে ক্রিয়াশীল রয়েচে, তারই ঘাতপ্রতিঘাতে। অবশ্য কোথা দিয়ে কী ঘটচে বা ঘটতে পারে তা' আমরা সব সময়ে জানতে পারিনে: কাজেই অজানাকে ভয় করি; নিজেকে অসহায় ভেবে, যে অজানা শক্তির সঙ্গে আমাদের সংঘাত ঘটচে তাকেই অতিপ্রাকৃতিক শক্তি ব'লে মেনে নিয়ে তারই নিকট আত্মসমর্পণ করি। বেদনাহত আমরা যদিও প্রকৃতিরই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তবু সে প্রকৃতিকে জানতে পাইনে ব'লে তাকেই প্রকৃতির অতীত ব'লে ধারণা ক'রে তার শরণাগত।

কার্যকারণের নির্মম প্রকাশে চলেচে প্রকৃতির ক্রিয়া, এবং যদি জানি যে, যে বীজ বপন করি সেরকম গাছই ফলবে, যা করি বা করিনে তার অনুযায়ী ফল নির্ণীত হবে।—তবে নিজের জীবন নিজে নিয়ন্ত্রিত করচি জানতে পেরে আশ্বস্তও হ'তে পারি। অলৌকিক উপায়ের জন্যে আমরা সময়ে সময়ে প্রার্থনা ক'র: অলৌকিক ঘটনা ক্বচিৎ কদাচ ঘটে বলে বিশ্বাসও করি। কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এই অলৌকিকত্বের সম্ভাবনাও যা নিতান্তই স্বাভাবিক, যা' নিতান্তই বাস্তব তার মধ্যে নিহিত ছিল। কার্যকারণ সম্বন্ধে এই তথাকথিত অলৌকিকও বুদ্ধিঅনুসারী—হয়তো বা সে সম্বন্ধ সবটা আজ জানা নেই, পরে জানা যেতে পারে। ইতিপূর্বেই বলেচি, মন বস্তুউৎসারিত বটে: কিন্তু সে মনের ক্রিয়ার সব খবর আমরা জানিনে: তা' নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা চলচে, কিন্তু সে চিন্তা ও গবেষণা এখনও প্রারম্ভিক পর্যায়েই রয়েচে। অলৌকিকত্ব অর্থাৎ অবোধ্য বা দুর্বোধ্যের অবকাশ সেইখানে। কিন্তু শুধু সেখানেও নয়। মানুষের সামাজিক সত্তার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার হদিশও সব সময়ে পাওয়া যায়না: অনেক সময়ে নিগূঢ় ও অচিন্তনীয় উপায়ে তার প্রকাশ ঘটে। অভাবিত ভাবে বিপন্মুক্তি—দয়ামায়ার প্রকাশ-জাতীয় যে সব কাহিনী শোনা যায়, তাদের মধ্যে রয়েচে মানুষের সত্য সত্তা বা সামাজিক সত্তার সূক্ষ্ম ক্রিয়া।

কাজেই বলা যায় বুদ্ধির, যুক্তির বাইরে কিছুই ঘটচেনা। এ' সত্য একদিক দিয়ে কঠোর: কারণ, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি যদি থাকতো এবং তার নিকট সাহায্য বা আশ্রয় চাওয়া সম্ভব হতো, তবে মানুষের প্রত্যক্ষ-

ভাবেই ভরসা থাকতো। এখন যা দাঁড়িয়েচে তা এই যে, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি আছে বা নেই না জেনে, আছে ব'লে শুধু কল্পনা ক'রে বা আছে ব'লে বিশ্বাস ক'রে মানুষ তার উপর পরম নির্ভরতায় লুটিয়ে পড়েচে। বুদ্ধিতে তার সে বিশ্বাস প্রতিহত: সে তথাপি শরণাগত।

না-জানা সেই বিশ্বশক্তিকে ঘিরে মানুষের এক বিরাট কল্পজগৎ গ'ড়ে উঠলো: মানুষ তাকে অধ্যাত্মজগৎ নাম দিল। সভ্যতার আইডিয়ালিষ্ট বা ভাববাদী পর্যায় সে জগৎকে ভিত্তি ক'রেই রূপ নিয়েচে। তারই রহস্য-ভেদের জন্যে যুগে যুগে কতো না মানুষ সংসার ছেড়ে বেরুলো: আর সকলে সংসারে থেকেও তার প্রতি উন্মুখ হ'য়ে রইলো। সে রহস্যলোকে প্রবেশের জন্যে রহস্যময় প্রণালীর উদ্ভাবনও কম হ'লোনা। তাকে ঘিরে সৃষ্টি হ'লো কাব্যসাহিত্য, শিল্প ভাস্কর্য স্থাপত্যের অপরিমেয় সম্পদ—সমগ্র মানবজাতি যার ঐশ্বর্যের ও মাধুর্যেব অংশীদার। তবু কি সে জগতের আটঘাট কিছু জানা গেলো, কেউ তার ঠিকঠিকানা পেলো? তা' পাওয়া দূরে থাকুক: সন্ধানের পথ ও মতের বিভিন্নতাতেই মানবজগৎ ক্লিষ্ট হ'য়ে পড়েচে: তাদের পারস্পরিক সংঘাতেব ক্লেশ ও গ্লানিতে মানবসমাজ উপক্রুত, পর্যুদস্ত, ক্লিন্ন। ব্যক্তিগতভাবে মানুষ হয়তো নিজেব সত্তাকে তারই অনুধ্যানে নিবদ্ধ করতে পারে এবং তাইতে বিশ্বসত্তার সঙ্গে যোগে শক্তি অনুভব করে—মহৎ আত্মিক উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়। যে কোনো রকম নিবিড়, নিবদ্ধ সৎ চিন্তায়ই সেরূপ উন্নতির সহায়তা হ'য়ে থাকে। মানুষ যে ভগবান বা দেবদেবীর নিকট কামনা প্রার্থনা জানায়, লোকান্তরে মৃত জনের আত্মাব অস্তিত্ব কল্পনা ক'বে তার ধ্যানে সান্ত্বনা পায়—সে তার মানসিক আত্মনিবেদনেরই ফল: ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা বা স্নেহে সংহত চিন্তাতেই সে আশ্রয় অনুভব করে। কিন্তু সেতো তা' করতে পারচে নিজের ইচ্ছাশক্তিকে সংহত ক'রে: অধ্যাত্ম চিন্তা ও কল্পনা তার সে আত্মসংহতিব উপলক্ষ্য মাত্র। মানুষরূপেই তার সে সাধনা—মানবসত্তারই সাহায্যে তার সে সাধনায় সিদ্ধি—তাতে অতিমানবীয় কিছু নেই। প্রকৃত আদর্শ বা উদ্দেশ্য সামনে নিয়েও মানুষ এ' ভাবে আত্মসংহত হ'তে পারে: বস্তুত দেহমনের সংহতিলাভের সেই হচ্চে উপায়। এত ক'রেও কি মানুষ অধ্যাত্মলোকের কোনো খবর পেলো? যা অজানা তা অজানাই রইলো: মানুষ যা' জেনেচে ব'লে মনে করলো তা' নিয়ে শুধু বাদবিসম্বাদ—মারামারি, কাটাকাটি,

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ধর্মীয় যুদ্ধ ইত্যাদিতে জড়িয়ে, মানুষ হিসেবে নীচেই নেমে গেলো। অবশেষে অজ্ঞাতকে অজ্ঞেয় ব'লেই ছেড়ে দেওয়া হ'লো: মানুষ তারই শরণাগত, তথাপি শরণাগত।

কিন্তু সেই অজ্ঞেয় কি মানুষের নিকট শুধু আশ্রয়রূপেই প্রতিভাত হয়েছে: এ' কথা কি সত্য নয় যে অজ্ঞেয় অজ্ঞাত ব'লেই—তার কোনো সংজ্ঞা, কোনো রূপ, কোনো সত্তা জানা যায়নি ব'লেই তার সম্বন্ধে বিচিত্র বিভিন্ন ধারণাকল্পনা মানুষকে বন্ধনরূপে ঘিরেছে: সে বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তিলাভ করা কঠিন হচ্ছে? সে ধারণাকল্পনা—তথা ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক মতের সংঘাতইতো ভারতীয় জাতিকে খণ্ডিত করার, ভারতভূমিকে বিভক্ত করার জন্যে দায়ী। সে সংঘাত ক্ষুদ্র নয়, গৌণ নয়: মার্কিন গণতন্ত্রের মতো অত্যাধুনিক সংস্থার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও তো দেখা যায় ধর্মীয় তথা একই ধর্মের উপবিভাগের মতপার্থক্য প্রভাববিস্তার ক'রে থাকে; রাষ্ট্রের উপর ধর্মীয় সংস্থার অবাঞ্ছনীয় প্রভাবের আশঙ্কা এখনও, এ' বিংশ শতাব্দীর প্রচণ্ড মধ্যাহ্নেও রয়েছে। বলা হবে, ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক মতের শক্তি তো তা' হলে এখনও খুব বেশী দেখা যাচ্ছে। তা' যে বেশী তা' অস্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই: মানুষে মানুষে অগণিত সম্বন্ধকে তা' ভেঙে চুরে ছারখার ক'রে দিয়েছে: সাম্প্রদায়িক বিভেদকে মানুষ সব ব্যক্তিগত সম্বন্ধ, সব মানবিক মূল্যবোধের উপর বড়ো স্থান দিলো। সাক্ষাৎ রেষারেষি, হানাহানির চেয়েও বিভেদের এহেন নিগূঢ়, নীরব ক্রিয়া বেশী গভীর, বেশী সাংঘাতিক। সাম্প্রদায়িক ধর্ম এখানে মানবিকতার উপর নিঃসাড়ে জয়ী হ'লো। কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয় যে, তাতে মানুষের মঙ্গল হচ্ছে? ধর্ম যখন সত্যসন্ধানের পর্যায়ে ছিল তখন তার নির্দেশ মানুষকে সত্যপথে রাখতে, আত্মস্থ রাখতে সাহায্য করতো, এখনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাকে আশ্রয় ও অবলম্বন ক'রে মানুষ আত্মগঠন করতে পারে। কিন্তু বিশ্বের কারণ, গতি ও প্রকার সম্বন্ধে ধর্মীয় ধারণাকে বিজ্ঞান যখন অবাস্তব ক'রে দিয়েছে তখন শুধু তার আনুষঙ্গিক আচারবিচার ও সাধনপদ্ধতি রইলো এবং তা মানুষকে আশ্রয় দিবার পরিবর্তে বিভেদেরই সৃষ্টি করলো। বিভেদে কি মানুষ কোনো শান্তি পায়—আশ্রয় পায়? আশ্রয় তো ঐক্যে: জীবনে জীবন যোগ করাতে।

"ঈশ্বর আল্লা তেরা নাম: যোহি আল্লা সোহি নাম"

ধর্ম যখন পরাস্ত হলো: ধর্মীয়—সাম্প্রদায়িক বিভেদ সর্বনাশ ঘটালে, ঋষিকণ্ঠে তখন মানবিকতা আহ্বান জানালো সর্বধর্ম সমন্বয়ের। শান্তিবহ, সান্ত্বনাবহ সে আহ্বান, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ' আহ্বানেব সার্থকতা সীমাবদ্ধ: কারণ মানবিকতার পরিধি মানবতার সমব্যাপক নয়। বিভেদ সত্ত্বেও—বিভেদ অতিক্রম ক'রে মিলনের যে বাণী আমরা ক্রমাগত শুনে আসচি, তার সফলতাও সীমাবদ্ধ: কারণ, এ' বিভেদে সত্য নেই: যা নিয়ে বিভেদ তার মূলেও সত্য এটুকু মাত্র আছে যে, তা বিশ্বসত্য সন্ধানের পর্যায়ভুক্ত। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় বা শ্রেণীব মধ্যে যে পারস্পবিক বিভেদ তার মধ্যে যদি সত্য থাকতো তবে হতো বিভিন্ন মতেব ও পথেব মধ্যে সমঝোতাব সম্ভাবনাও থাকতো। তাব অভাবে মিলনেব বাণী বিভেদে ক্লিষ্ট, পর্যুদস্ত—আমাদেব এ' উপমহাদেশেব অগণিত জনেব ন্যায় সর্বস্বান্ত লোকেব মনে তা শুধু শান্তির ছোঁয়া, সান্ত্বনাব পবশই এনে দিলো:

"সবকো সন্মতি দে ভগবান"

কিন্তু সমগ্র মানবসমাজ যে বৈজ্ঞানিক সত্যে আজ পৌছেচে—তা' নিজের মধ্যে অনুভব ক'বে মানুষ যদি স্বকীয, স্বরাট সত্তায় মাথা তুলে' দাঁড়াতে পারতো তবে সে আর মিথ্যা বিভেদ সৃষ্টি কবতোনা: তবে সে স্বকীয মহিমায় সকল মানুষেব সঙ্গে অনায়াসে মিলিত হ'তো। সে মানুষ সমগ্র মানুষ—ধর্মভেদে, সম্প্রদায়ভেদে খণ্ডিত মানুষ নয়। বিশ্বসাথে যোগে সে মানুষ ক্রমেই পূর্ণতার অভিমুখে অগ্রসব হচ্চে। কিন্তু মানুষ যেখানে স্ববাট সেখানেও সে সকল মানুষেব সঙ্গে বাধা: এবং সে বন্ধনেব সমন্বয় কবতে না পারা পর্যন্ত সে বাস্তবে স্ববাট হ'তে পাবচেনা। এখানেই তো পদে পদে সভ্যতার সংকট। ব্যক্তিব সমষ্টি যে সমাজ তা'ও স্ববাট মানুষের সমাজ নয়: কাবণ সে ব্যক্তি আজও স্বরাটত্বে প্রতিষ্ঠিত নয়। ব্যক্তিই সমাজকে অতিপ্রাকৃতিক শক্তিব মুখাপেক্ষী ক'বে বেখেচে: অতিপ্রাকৃতিকের উপাসনা উপলক্ষেই সমাজ উৎসবমুখব হয়েচে। সেখানেই আজও মানুষেব আশ্রয়: সেখান থেকে বিচ্যুত হ'যে তার কী সান্ত্বনা, কোথায় সান্ত্বনা? সান্ত্বনা তার স্বরাটত্বে, স্বাধীনতার উপলব্ধিতে—যে স্বরাটত্ব, যে স্বাধীনতাব সনদ বিজ্ঞান তার হাতে অর্পণ করেচে। ধর্ম যখন সত্যসন্ধানেব পর্যায়ভুক্ত ছিল তখন তাবই বিধান অনুসবণ ক'বে মানুষ ন্যায়ান্যায়, পাপপুণ্য, বিচাব অবিচার স্থির করতো, এবং তাতে নিবাপত্তা ও আশ্রয় পেতো। কোনো কোনো

একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ছাড়া ধর্মীয় বিধানের আর সে কার্যকারিতা নেই—সে সব ক্ষেত্রেও বিবেকের নির্দেশ মুক্ত ন্যায়বুদ্ধি থেকেই উদ্ভূত হয়ে থাকে। ধর্মীয় বিধান কার্যকরী না থাকার কারণ এই যে বিধাতাতে বিশ্বাসের ভিত্তিই এখন ধ্বংসে পড়েচে: তার উপর আর কোনো সামাজিক বা ব্যক্তিগত বিধি-বিধানকে দাঁড় করিয়ে রাখা যাচ্চে না। ধর্মীয় বিধান যদি আজও প্রবল থাকতো তা' হ'লে এত দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব হ'তোনা: কালোবাজার, ভেজাল ইত্যাদি অক্লেশে চলতে পারতোনা। দেখাতো যাচ্চে, এ' ধরণের কারবারে লোকের আর কোনো দ্বিধাই নেই: ভয় যা কিছু রাষ্ট্রের-তথা পুলিশ ও আদালতের—সে ভয়ও দুর্নীতির সাহায্যে অনেকটা ঠেকিয়ে রাখা যায়। এমন কি, দুর্নীতি এমন সর্বব্যাপক হয়েচে যে তা সমাজকেও বলহীন ক'রে ফেলেচে: মানুষ যদি ও যখন একাকী দুর্নীতি পরায়ণ হয় তবে ও তখনও সমাজ তাকে শাসন করতে পারেনা। শুধু যে সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিঅধিকার বোধ যথেষ্ট বিকশিত হয়েচে ও মোটামুটি অম্লান রয়েচে, সেখানেই তা বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে আত্মরক্ষা ক'রে ন্যায়ন্যায়বোধকে কার্যকরী রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু সে তো স্বাধীনতারই ফল: মানবীয় সত্তার বাইরের কোনো কিছু তার কারণ নয়। সোজা কথায় তা হলো মানবতাবাদী বিচার। এখানে মনে পড়ে গ্যয়টে-বর্ণিত ফাউষ্টের সেই মহা তাৎপর্যময় উক্তি:

The God that in my breast is owned
Can deeply stir the inner sources;
The God, above my powers enthroned,
He cannot change external forces.

যে ভগবানেরে মোরা বক্ষে ধারণ করি
পারেন তিনি গভীরভাবে নাড়া দিতে
শক্তির সব অন্তর্লীন উৎসকে:
যে ভগবান সিংহাসনে বিরাজিত
মোর নাগালের, মোর ক্ষমতার বহু উর্ধে—
পারেননা তবু তিনি
বহির্শক্তি সমূহেতে কোনো কিছু পরিবর্তন ঘটাতে।

তাইতো বলা হয়েচে : Religion is what man does with his own loneliness। একান্ত একাকিত্বে মানুষ বিশ্বসম্বন্ধে যে ধারনা কল্পনা, করে বিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্ককে যে রূপে মনে মনে গ'ড়ে তোলে তাকেই বলে ধর্ম।

সেই মানবতাবাদী বিচারে ন্যায়ান্যায় ভালোমন্দ বিবেচনা অন্তর্নিহিত রয়েচে : অতিমানবীয় কোনো কিছুর উপর নির্ভরতা তাকে ভারাক্রান্ত করচেনা, কোনো ধর্মীয় বা সামাজিক সংস্কার নির্দেশ তাতে বিভ্রম ঘটাতে পারচেনা। মানুষের মুক্তবুদ্ধি থেকে তা' স্বতোৎসারিত হচ্চে। মনে হয়, ধর্মভিত্তিক যে মূল্যবোধ আমরা হারিয়ে ফেলেচি ব'লে দিকে দিকে রব উঠেচে, মানবতাবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গীতে আমরা তা আবার ফিরে পেতে পারি : কারণ একান্ত বাস্তবসম্মত সে দৃষ্টিভঙ্গীতে কোনো কিছুরই দোহাই দিয়ে প্রত্যক্ষ উচিতানুচিত কর্তব্য অকর্তব্যকে এ'ড়িয়ে যাবার উপায় নেই। দিকে দিকে রব উঠেচে যে সাধারণ মানবিকতা পর্যন্ত আমরা হারিয়ে ফেলেচি : কারণ বোঝা যাচ্চে এই যে যার উপর তার ভিত্তি ছিল তা ধ্ব'সে গেছে। বাংলাদেশে আমরা ব'লে থাকি যে যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ ইত্যাদি মর্মচ্ছেদী অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিক বিচারে কিন্তু এ' সব কিছুরই কারণ সহজবোধ্য ; এবং মানবতাবাদী প্রাণ নিয়ে য'দ আমরা তাদের সম্মুখীন হ'তে পারতুম ত'বে তাদের দ্বারা বিধ্বস্ত হ'য়ে যেতুম না—আমাদের আয়ত্তাতীত কারণে দৈব ঘটনার মতো এরা আমাদের উপর এসে পড়েচে ব'লে মুষড়ে পড়তুম না। স্পষ্টইতো দেখতুম যে ইতিহাসের চলার আবর্তেই আমাদের এ'রকমটা ঘটেচে : বিভিন্ন মানবিক শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াতেই রচিত সে ইতিহাস : রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধার্মিক, সাংস্কৃতিক শক্তির যোগবিয়োগে সে ইতিহাসের প্রকাশ। কেনই বা আমরা দৈবকে খুঁজে মরি : চোখের উপর তো দেখচি, নিজে তার সঙ্গে জড়িত থেকে জানচি ও বুঝচি—মানুষেরই ইতিহাসের ক্রিয়াতে আমাদের জীবনের এ' ভাঙাগড়া ঘটলো। সেকথা যদি স্মরণ রাখতুম তবে বিপদ যতোই নিদারুণ হোক্, বেদনা যতোই গভীর হোক না কেন মুখোমুখী দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করতুম—একেবারে রসাতলে গেছি ব'লে হায়, আপশোষ করতে থাকতুম না। মনে হয়, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে মানুষের শক্তির যে বিকাশ ঘটেচে তার সম্পূর্ণ অর্থ, মনুষ্যকেন্দ্রিক জীবনদর্শনে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব—এককথায় তার মানবতাবাদী তাৎপর্য আমরা সম্পূর্ণ ধারণা করতে পারিনি ব'লেই দেহমনে পঙ্গু হয়ে পড়েচি। বিজ্ঞানের সঙ্গে অপরিচয়ের দরুণ মানুষ

অতিপ্রাকৃতিকত্বভিত্তিক ধর্মের খোলস নিয়েই প'ড়ে থাকে: তার নেতিবাচক দিকটা যথা অদৃষ্টবাদ ইত্যাদি তাকে অভিভূত ক'রে রাখে। মানবজাতি সমগ্রভাবে আত্মশক্তির উদ্বোধনে যে স্তরে এসে পৌঁছেচে আমাদের মন তার হিসেব রাখতে পারেনি এবং আমরা তার সমতালে চল্‌তে পারিনি ব'লেই দেহেমনে দুর্বল হ'য়ে আছি। মানবতাবাদের উদ্বোধনে বাংলার ও বাঙ্গালীর পূর্ণ জাগরণ হবে, মূল্যবোধ তার ফিরে আসবে এ' আশা আজ যদি বা সুদূরপরাহত হয়, বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এ' আশাকে সত্য করবে এবং একে অবলম্বন ক'রেই ভবিষ্যতের বিকাশপথ লাভ করবে এ' ভরসা অযৌক্তিক নয়। স্বাধীন ভাবতে বাংলার তরুণতরুণী নিখিল মানবিক উপলব্ধিতে নিজেদের জীবন গ'ড়ে তুলবে এবং যে দেশের জলমাটি, সমাজসংস্কৃতি তাদের দেহমন গ'ড়ে তুলেচে তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিগত যোগে নিজেদের জীবন সর্বথা বিকশিত ও প্রকাশিত করবে, এ' পরিপ্রেক্ষিত এখন তাদের সামনে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত ক'রে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। তার আগে আজ বাঙ্গালীর মানসসত্তা আত্মদ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ রয়েচে: সে ক্ষীয়মান ধর্মীয় ও সমাজসত্তাকে আশ্রয় ক'রে আছে—নয় তো ক্ষয়েরই মধ্যে—তারই ব্যথাবেদনাতে, সর্বহারা সম্বিৎহারা জীবনের মাঝখানে নূতন জীবনের বীজ সন্ধান করচে। ভাবচে, বিপ্লবেরই বহ্নিশিখায় জ্বল্‌বে যেন জীবনের হোমশিখা অন্য কোন কোন দেশে যেমন জ্বলেচে ব'লে যুগের দাবী উত্থাপিত হয়েচে। কিন্তু সে ব'হ্নিশিখায় যদি মূল্যবোধও পুড়ে ছাই হ'য়ে গি য় থাকে, নূতন মূল্যবোধ যদি মানবিকতাকে অতিক্রম ক'রে যায়--মানবিকতায় তার সূক্ষ্ম, তীব্র আঘাত দিন দিন অসহনীয় হ'য়ে ওঠে—তবে সেখানে নৈতি , সামাজিক ও ব্যক্তিগত ভারসাম্য ফিরিয়ে আন্‌তে পারে শুধু মানবিক মানবতাবাদ এবং বাংলাদেশে হয়তো আমরা ঘুরে ফিরে একদা তারই পথে পৌঁছুবো।

শুধু বাংলা দেশের কথাও নয়। পার্থিব জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতায় মানুষ যখন পদে পদে দ্বন্দ্বসংশয়ের সম্মুখীন হ'লো, নিজের বিকৃতিবিচ্যুতির সঙ্গেও যখন তার সংগ্রাম দেখা দিলো তখন সে আশ্রয় খুঁজলো এবং পেলো সেই বিশ্বসত্তায় যাকে সে ভগবান নাম দিয়েচে। সেই অতিমানবীয়, অতি প্রাকৃতিক সত্তার নিকট আত্মসমর্পণ ক'রে সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। আজ যখন তার নিজের প্রকৃতি, নিজের বুদ্ধির নিকটই তার নিজের স্থিতিলাভের প্রয়োজন দেখা দিলো তখন সে শুধু বিশ্বপ্রকৃতির সুসমন্বিত রূপ অনুধাবনে কিছুটা সাহায্য পেতে পারে: নয়তো তাকে একান্তরূপে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির

উপরই নির্ভর করতে হবে। পরিবেশের সঙ্গে সংঘাতে মানুষকে নিজের সঙ্গে যে সংগ্রাম করতে হয় তাই সব চেয়ে বড়ো সংগ্রাম। অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে আশ্রয় মেনে নিয়ে মানুষ সে সংগ্রামে আত্মরক্ষা করে: যেমন সে দুঃখবেদনায় সে আশ্রয় যাচ্ঞা করে, ক্ষোভ ও খেদে বিজীর্ণ বিশীর্ণ হবার কালেও সে আশ্রয় মেনে নেয়—তেমনি আবার তাতেই নিজের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি সন্ধান করে। ভগবদসত্তার কল্পনাতেই সে এত বড়ো অবলম্বন খুঁজে পেয়েচে। তার স্থলে তাকে যদি বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য সন্ধানে বিশ্বশক্তির সন্ধান করতে হয় এবং সেখানে অতিপ্রাকৃতিক কিছু না পেয়ে নিছক প্রকৃতিকেই অবলম্বন করতে হয়, তবে চকিতে তার দৃষ্টি এই মানবজীবনের, এই মানবজগতের দিকে ফিরবে এবং তাকেই আশ্রয় ক'রে তার সঙ্গে নিজের সুসমঞ্জস সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজনে তারও নিজের অন্তর বাইরে সমগ্র আসবে। তখন আর পরলোকের আশায় ইহলোককে মিথ্যা, এ সংসারকে অসার বোধ হবে না। মানুষ তার নিজের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত ব'লে অনুভব করবে,—ভগবানের ইচ্ছা, ভাগ্য, দৈব প্রভৃতির উপর নির্ভর ক'রে সে আর বসে থাকতে পারবে না। এ হেন মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে মানবীয় কাজে ও দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে এবং রাষ্ট্রিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত নানা উদ্যোগে সার্থক হয়। কারণ, মানুষ তখন মানুষকেই সত্য ব'লে জানে; অতিমানবীয় সত্তার সন্ধান করতে গিয়ে নিজের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে পড়ে না। তার আনন্দ উৎসবও তখন প্রকৃতি ও মানুষকে ঘিরে গ'ড়ে ওঠে; প্রকৃতির রূপরস ও মানুষের হৃদয়ের তরঙ্গভঙ্গই তখন তার আত্মোপলব্ধির উৎসবের প্রাণ। বর্তমান জগতে বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এ' দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ক'রেচেন এবং তার ফলে তাদের জীবন স্বতোপ্রণোদিত-ভাবে মানবসেবাতে সার্থক হয়েচে। কিন্তু সে সেবা পরোপকারজাতীয় মানবসেবা নয়—মানবিক সেবা নয়; সে একান্তই জীবনে জীবনের যোগসাধন—নিখিল মানবজীবনের সাথে নিজের জীবনের নিঃশেষ মিলন। ইংরেজীতে যাকে হিউম্যানিটেরিয়ানিজম বলে সেই মানবিক মানবসেবায় নিজের একটা শ্রেষ্ঠত্ববোধ থাকে: যেখানে তা সজ্ঞানে না-ও থাকে সেখানেও সেবাতে সেবিতের পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হয় না। অবশ্য সেবক মহত্ত্বের অধিকারী হয়: তাদের মধ্যে অনেকে মহামানবত্বে উত্তীর্ণ হ'তে পারেন ও হয়েচেন। কিন্তু বাহ্যিক সভ্যতার যদিও দ্রুত অগ্রগতি ঘটচে, অপরিমেয় শক্তি মানুষের হাতে এসে পড়চে, তবুও মানুষ মানুষ হিসেবে পূর্বাপেক্ষা উন্নত হচ্চে এমন মোটেও

বলা যায় না : ব্যক্তি হিসেবে নয়, সমষ্টি হিসেবে তো নয়ই। আজও জগৎ দ্বন্দ্ব ও হিংসায় ভরা, তাতে অত্যাচার অবিচারের লেখাজোখা নেই। সাম্রাজ্যবাদের পতন ইত্যাদি যে সব সুলক্ষণ দেখা যাচ্চে তা'ও ঘটেচে নিছক অর্থনৈতিক কারণে এবং তার সঙ্গে নিপীড়িত মানুষের জাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনার ফলে। ক্ষেত্র বিশেষে আবার অত্যাচারের রূপান্তর ঘটেচে কোনো বিশেষ মতবাদের প্রসার উপলক্ষ্য ক'রে। মোটের উপর মানুষ মানুষ হিসেবে উন্নত হ'তে পারেনি : মানবীয় গুণের উপাদানগুলো যেন তথাকথিত সভ্যতার জটে পাক খেয়ে নষ্ট হ'য়ে গেচে। তাই বলা হয়েচে, সভ্যতার পথ বেয়ে মানুষের মধ্যে শুধু পরিবর্তন হ'য়েচে—অন্তর বাইরের প্রকৃতির গুণগত কোনো উন্নতি হয়নি। হিউম্যানিটেরিয়ানিজম যথেষ্ট নয় : বৈজ্ঞানিক সত্যকে এড়িয়ে গিয়ে শুধু বৈজ্ঞানিক ক্ষমতাতে মানুষ আত্মোদ্ধার করতে পারবে না। বৈজ্ঞানিক সত্যকে কবুল ক'রে মানুষকে মানবতাবাদে প্রতিষ্ঠিত করার আজ বড়ই প্রয়োজন।

সেই বৈজ্ঞানিক সত্য ধীরে ধীরে মানুষের চেতনায় অনুপ্রবেশ করচে : সজ্ঞানে স্বীকার না করলেও তার অস্তিত্ব, তা'র অন্তর্নিহিত চ্যালেঞ্জ উড়িয়ে দিতে পারা যাচ্চে না। এ' জন্যেই দেখা যায়, ধর্মীয় সংস্থাসমূহও মানবতাবাদ তথা নাস্তিক্যবাদের প্রতি যেরূপ নির্মম, ক্ষমাহীন ছিল এখন আর তা' নেই। আগে যেমন নাস্তিক—তথা মানবতাবাদীর বাঁচার স্বাভাবিক অধিকারও অস্বীকৃত হ'তো এখন আর কেউ তা' অস্বীকার করতে পারচে না। বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ স্বীকার না করা হ'লেও ধর্মের সঙ্গে তার সহ-স্থান মেনে নেওয়া হয়েচে। ধর্ম আত্মরক্ষা করচে এই ব'লে যে, এমন সত্যও আছে যা বিজ্ঞানকে অতিক্রম ক'রে যায়—বিজ্ঞান কোনোদিনই যা'র নাগাল পাবে না। অবশ্য বিজ্ঞান যে ভাবে বিশ্বশক্তিকে মানুষের আয়ত্তে এনে দিচ্চে তাতে তাকে অস্বীকার করার কোনো প্রশ্নই আর উঠতে পারে না। সেই সঙ্গে মানবতাবাদীও নিগূঢ় স্বীকৃতি লাভ করচে : তার জীবনের স্বকীয় মূল্য আপনা থেকেই সমাজকে প্রভাবিত করচে। এমনও দেখা যাচ্চে যে মানবতাবাদীর মৃত্যুতে ধর্মীয় সংস্থাও তার প্রতি শ্রদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিচ্চে—এমন কি ধর্মীয় প্রার্থনার স্থলে মৃতের প্রিয় মানবতাবাদী সাহিত্য পাঠ ক'রে মৃতের মতবাদের মর্যাদা রক্ষা করচে। ইংলণ্ডের শ্রমিক নেতা মিঃ আনুরিন বিভানের মৃত্যুর পরও এমন ঘটেছিল। ধর্ম কর্তৃক বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদের এ' টুকু স্বীকৃতিতেও ডায়েলকটিকসের

প্রভাব লক্ষ্য করা যায় : বাস্তব জীবনে ধর্মের কার্যকারিতার অবনতির এ হচ্চে ভালো দিক।

তবু মানবতাবাদী আজও একান্তই নিঃসঙ্গ : কঠোরতম তার যাত্রাপথ। ধর্মসংস্কারের দেয়াল তার চারদিকে অভ্রভেদী উচু বাধা রচনা করেচে : সে চাইচে তাই ভেঙ্গে মানুষের মনের দুয়োরে পৌছুতে। সে প্রাণপণ বোঝাতে চাইচে এ' কথা যে অতিপ্রাকৃতিক শক্তি কল্পনা ক'রে তার নিকট আত্মসমর্পণ করার চাইতে জীবনকে বিশ্বপ্রকৃতি, বিশ্বমানবের সঙ্গে একত্ববোধে প্রবুদ্ধ ও উদ্যোগী করা অনেক বেশী বাস্তববুদ্ধিসম্মত ও পৃথিবীতে জীবনের আত্মোদ্ঘাটনের এবং শান্তি ও আনন্দলাভের সম্ভাবনাবহ। অনিশ্চিত দৈবের উপর নির্ভর করার চাইতে জীবনকে জয় করার—হাতের মুঠোয় আনার সংকল্প এবং তেমনই কর্মোদ্যোগ—পাওয়া না পাওয়ার, সাফল্য অসাফল্যের অভিযান কি অনেক বেশী বৈচিত্র্যময়, আনন্দপূর্ণ ও চাঞ্চল্যময় নয়? এই পৃথিবীর মানুষের সুখদুঃখ, আশাআকাঙ্ক্ষা, মনের বিচিত্র গতি, বিবিধ উপায়ে আত্ম-সন্ধান, প্রেম ভালবাসার আনন্দময় নিগূঢ় গোপনলীলা যুগের পর যুগ, বছরের পর বছর, মাসের পর মাস, দিনের পর দিন—প্রতি মুহূর্ত, প্রতি পল ধ'রে একাধারে বিপুল ও বিচিত্র নাট্য রচনা ক'রে চলেচে। সেই মহানাট্যে নিজের জীবন লীলায়িত করা, আবার নিজেকে দূরে রেখে তাকে অবলোকন করা—জীবন উপলব্ধি করার সর্বোত্তম উপায়। রবীন্দ্রনাথইতো বলেচেন : বিজ্ঞান যে বিশ্বনিয়ম আবিষ্কার করেচে সে নিয়ম ত্রুটিহীন : ব্যক্তিমানসের কল্পনাদ্বারা যেন আমরা তাকে লঙ্ঘন না করি। পৃথিবী যেমন অহোরাত্রি সূর্যকে প্রদক্ষিণ ক'রে চলেচে তেমনি আমাদের মানবসত্তা বিশ্বসত্তাকে অবিরত প্রদক্ষিণ করচে : তাইতে অগণিতভাবে আমাদের মানবসত্তার ভাঙ্গাগড়া চলচে। তাতেই জীবনের সুখদুঃখ, আশানিরাশা, দয়াদাক্ষিণ্য, ক্রূঢ়তা-কুটিলতা, প্রেমভালবাসার উদ্ভব—উত্থানপতনের খেলা। তারই সচেতন উপলব্ধি ও তদনুসারী আত্মনিয়ন্ত্রণকে বলে মানবতাবাদীজীবন যাপন। মানবতাবাদী তারই দিকে মানুষকে আহ্বান করচে; তাই করতে গিয়ে মানুষের নিকট আজ আর তার আশ্রয় নেই : কারণ, আদি কারণকে অস্বীকার ক'রে সে অতিপ্রাকৃততত্ত্বভিত্তিক ভাবসত্তা ও লোকসত্তা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়েচে : মানুষেরই নির্মিত অধ্যাত্মজগত দিয়ে তার কোন কাজ নেই। মানবতাবাদী হ'য়েও এবং হওয়ার ফলেই সে যেন আজ মানবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। সভ্যতার

বিজ্ঞানানুমোদিত গতিপথে আজ তার নিঃসঙ্গ যাত্রা। তবু এমনতরো নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বই মানুষের যাত্রাপথের নির্দেশ দেয়---যুগে যুগে মানবজাতির নূতন পথসংকেত রচনা করে। তা' করতে পারে—কারণ, সে নিঃসঙ্গ হ'লেও নিখিল মানবের সঙ্গে তার আত্মিক যোগই সব চেয়ে সত্য : কারণ, সে যোগ একান্তভাবে ও নিঃশেষে মানুষের সঙ্গে মানুষের জীবনসম্ভোগোপলব্ধিতে। সে যোগ সেই মানুষের সঙ্গে যে শুধু ভাসা ভাসা জীবন যাপন করে না—যাতে একান্ত নিসঙ্গ কলমে কাষ্ঠ-হ্যাণ্ড জীবন যাপন করে—যাকে জীবনের অমৃত খুঁজতে গিয়ে আকণ্ঠ বিষ পান করতে হচ্ছে, দুঃখ দহনে যার সমগ্র সত্তা নিরেট, নিথর হয়ে গেছে। বুঝি একান্ত নিঃসঙ্গ অনুভবেই তার নাগাল পাওয়া যায়—যায়না জনকোলাহলের মধ্যে। মর্মোদ্‌ঘাটনকারী সে যোগে অপ্রাসঙ্গিক কোনো কিছু নেই : মানুষের সুখদুঃখ ভাবনাচিন্তার সাথে সহানুভূতিতে সে নিবিড ; নিখিল মানবসত্তা যেন তাতে কেন্দ্রীভূত। এম্‌নি নিঃসঙ্গ ব্যক্তিই ইংরেজ কবির সাথে বলতে পারে :

The stars come nightly to the sky,
The tidal wave comes to the sea ,
Nor time, nor space, nor deep, nor high,
Can keep my own away from me

যেমন ক'রে তারকারাজি প্রতি রাত্রে আসে আকাশে,
জোয়ার ভাটার ঢেউ আসে সাগরে
আমার নিজের যা কিছু তা তেমনি আসবে মোর কাছে :
কাল বা স্থান, উচু বা গভীর কিছুই তা
আমা থেকে দূরে রাখতে নারে।

এম্‌নি যোগ থেকেই আসে ক্ষণে ক্ষণে মানুষের পথনির্দেশ।

যেনাহং নামৃতাস্যাম
কিমহং তেন কুর্যাম্?

"যাহাতে অমৃত নাই তাহাকে দিয়া আমি কী করিব?" যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট মৈত্রেয়ীর সেই প্রশ্ন আজ কি কল্পনাভিত্তিক অধ্যাত্মজগতের প্রতি প্রযোজ্য নয়? তার চেয়ে বৈজ্ঞানিকসত্যভিত্তিক ভাবজগতে অনেক বেশী আনন্দের ও সত্যোপলব্ধিজাত অমৃতের সন্ধান রয়েছে। মানুষের মন আজ ফিরবে সেই বিশ্বজগতের, ইহজগতের অমৃতলোকের দিকে। সভ্যতা সংস্কৃতির

গতিপথের মোড় ফিরবে এই প্রকৃতির, এই মানুষের অন্তহীন আত্মাবিষ্কারে।

সেই পথের দিশারী আজ শুধু আমরা নই: সমগ্র মানবজাতি। সমূহ ধ্বংসের সম্ভাবনার সম্মুখীন মানবজাতি নিজের ভাগ্য নিজের হাতে পাবার পথ সন্ধান করছে। দেশে দেশে জীবনসংগ্রামে বিহ্বল জনগণ চাইছে মুক্ত, সমুন্নত জীবনের পথ। ভারতে আমরা চাইছি বহুদিনের পরাধীনতামুক্ত দেশকে পুনরায় গ'ড়ে তুল্‌তে—কোটি কোটি মানুষের জীবন স্বাস্থ্যশিক্ষায়-সম্পদে সমুজ্জ্বল করতে। সর্বজাগতিক দুর্দৈবের সম্ভাবনায় আমাদের সে ভরসাও বিপন্ন। দারিদ্র্যেদুঃখে এবং তজ্জনিত শতবিধ সমস্যায়—শোকক্ষতি-ব্যথাবেদনায় যে সব জীবন, যে সব পরিবার পীড়িত, জর্জরিত, মানুষের মতো জীবনযাপনের সম্বল তাদের দুয়োরে এনে দিতে পারে শুধু মানবিকতায় পূর্ণ মানবতাবাদী জীবনদর্শন ও কার্যক্রম। তারপরও তার সত্যসন্ধান: বিশ্বজীবনের অপাররহস্যসন্ধান। সেই যে ইংরেজী কবিতায় রয়েছে: তীর্থযাত্রী আমরা, আমরা ক্রমেই এগিয়ে চলেছি। সহসা পর্বতের বাঁক আমাদের চোখের সাম্‌নে আস্‌ছে, আবার সূর্যকবোজ্জ্বল সমুদ্র আমাদের চোখে ঝলক দিচ্ছে: এম্‌নি ক'রে আমরা খুঁজে চলেছি সেই রহস্যের মর্ম: কেন মানুষের জন্ম হয়েছিল। বারবার আমাদের ভুল হচ্ছে, বারবার আমরা হোঁচট খাচ্ছি: তবু হয়তো স্বীকার করবে যে আমাদেরও সাহস আছে—আমরা যারা সমরকন্দের অভিমুখে শাশ্বত অভিযাত্রী।

সেই শাশ্বত পথ আজ মানবতাবাদের ধারাবাহী হয়েছে। আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারাও যদি এ' পথে বেরিয়ে পড়্‌তে পারি তবে হয়তো শুধু বিশ্বজয় নয়—তার চেয়েও যা কঠিন সে আত্মজয় করতে পারবো: মানুষের পূর্ণ মর্যাদাতে মানুষকে লাভ করবো: বিশ্বজীবনের তথা নিজের জীবনের মুখোমুখী দাঁড়াবো: তখন

> "হয়তো ঘুচিবে দুঃখনিশা,
> তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা॥"

নির্ঘণ্ট

প্রকাশক : বেণু সাহা . দীপায়ন—
২০, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা - ৯
মুদ্রক : শ্রীবলদেব রায় : দি নিউ কমলা
প্রেস, ৫৭-২, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা - ৯